।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক

প্রণীত।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

কলিকাতা।

২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

মজুমদার লাইব্রেরী হইতে

এস্ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩২০

মূল্য ১।০

উৎসর্গ-পত্র

ভাই রবি,

তুমি আত্মহৃদয়ের সৌন্দর্য্যে "বাঙ্গালার বসন্তোৎসব" দেখিয়াছিলে। কিন্তু সেই উৎসাহে তোমার মুখ চাহিয়া, প্রবাসে বসিয়া আজ্ আমি অসম্পূর্ণ "শক্তি-কানন" শেষ করিলাম।

তোমার বাঙ্গালার একটা ছবি ইহাতে আমি চিত্রিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। তোমার ন্যায় আমিও বিশ্বাস করি, বাঙ্গালার আসল যে মহত্ত্ব, তাহা খাঁটি বাঙ্গালিত্ব হইতেই সম্ভবে। যাহা কিছু সেই বাঙ্গালিত্বের বিঘ্নকর, তাহাতে সুফল ফলিবে না। কিন্তু আসলের নামে নকলের প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। সেই জন্য আমি দেড় শত বৎসরের আগের বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর উপর নির্ভর করিয়াছি। ইতি

তোমার স্নেহের
শ্রীশচন্দ্র

নওয়াদা—গয়া।
২৭শে ভাদ্র, ১২৯৩।

শক্তি-কানন।

(উপন্যাস।)

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জগন্নাথ আচার্য্য প্রবাস হইতে গৃহে ফিরিতেছিলেন। পূর্ব্ব বঙ্গ এবং রাজশাহীতে তাঁহার বিস্তর শিষ্য সেবক। প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে গৃহ ত্যাগ করিয়া ফাল্গুনের প্রথমে তিনি রাজশাহীর পথে ফিরিয়া আসিতেন। গৃহদেবতা গোপীনাথের দোলযাত্রা তাঁহার প্রধান উৎসব, সুতরাং ফাল্গুনের প্রথমে গৃহে না ফিরিলে নহে। এবার কিছু দেরী হইয়া গিয়াছে—বাসন্তী পূর্ণিমার আর চারি দিন মাত্র বাকী। আচার্য্য বিষণ্ন মনে পদ্মা পার হইলেন।

সঙ্গে ভৃত্য হরিদাস। হরিদাস স্বগ্রামবাসী এবং শিষ্য। নৌকা তীরে লাগিবামাত্র হরিদাস লম্ফ দিয়া গোরুর গাড়ীর তল্লাসে ছুটিল। নৌকায় আর কয় জন শিষ্য ছিল, তাহারা গুরুদেবকে বিদায় দিবার জন্য সঙ্গে আসিয়াছে। হরিদাসকে দীর্ঘ শিখা দোলাইয়া লম্ফ দিতে দেখিয়া তাহারা প্রভুর জিনিস পত্র বাঁধিতে লাগিল। অনেক জিনিস।

চারি মাস শিষ্য গৃহে বাস করিয়া গুরু আজ গৃহে ফিরিতেছেন,—জিনিসের কথায় আর কাজ কি? তৈজস, বস্ত্র, শয্যায় নৌকা পূর্ণ। দেখিতে দেখিতে পরাণ, শিবু, রাম সে সকল গুছাইয়া নৌকা হইতে তীরে আনিয়া তুলিল। এমন সময়ে শ্রীমান্ হরিদাস গোযান আরোহণ করিয়া বলদদ্বয়ের পুচ্ছ পীড়ন করিতে করিতে দেখা দিলেন। তাঁহার মুখেরও কামাই ছিল না। ইহার মধ্যেই গাড়োয়ানের সঙ্গে চির পরিচিতের মত আলাপ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে "চাচা" সম্বোধন করিয়া অতি যত্নে তাহার গৃহস্থালীর খবর লইতেছিলেন। চাচা আপ্যায়িত হইয়া উত্তর দিতেছিলেন, এবং হরিদাসের প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ বাম হস্তে দীর্ঘ শ্মশ্রু আন্দোলিত করিতেছিলেন।

হরিদাস আবার গাড়ী হইতে লাফাইয়া নদী তীরে দাঁড়াইল। লম্ফ দান যদি ভক্তি প্রাধান্যের পরিচায়ক হয়, তবে তাহার সে প্রশংসায় কিঞ্চিৎ দাবি দাওয়া ছিল। হরি আচার্য্য-ঠাকুরকে চক্ষু টিপিয়া ইশারায় জানাইল, গাড়ী ভাড়া সম্বন্ধে তিনি কোন কথা না বলেন। জগন্নাথ অন্যমনস্ক ছিলেন,—হরিদাসের ইঙ্গিতে মন দিলেন না। তখনই হরি আবার গাড়োয়ানের দিকে ফিরিয়া বলিল,—

"আর বছর কেমন চাচা, আমরা তোমরা গাড়ীতে গিয়াছিলাম?"

সেখপুত্র জগন্নাথ আচার্য্যের নধর দেহ, পুষ্ট গৌর কান্তি এবং মালা ও চন্দনের কোঁটার ঘটা দেখিয়া আভূমিপ্রণত সেলাম করিল এবং সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—"না কর্‌তা, মুই নতুন গাড়ী কর্‌ছি!"

হরি। "সে কি চাচা—তুমিই ত সে, তোমারই মতন তার লম্বা দাড়ি!" পরে পরাণ প্রভৃতির দিকে চাহিয়া অপাঙ্গে ঈষৎ হাসির বিদ্যুৎ খেলাইয়া বলিল,—"চাচা নোক বড় ভাল গো!" কিন্তু চাচা সে সোহাগে ভুলিবার ছেলে নহেন। ভাড়া ঠিক হয় না দেখিয়া হরিদাস আচার্য্যের দিকে ফিরিল।

দেখিল এ দিকে তাঁর মন নাই। বেলা প্রায় শেষ হয় দেখিয়া তিনি কিছু চিন্তাযুক্ত। হরিদাস ডাকিয়া বলিল যে গাড়োয়ান বেশী ভাড়া চাহিতেছে।

জগ। তুমি বুঝি বড় টানাটানি করিতেছ? গরিব মানুষ, ওদের সঙ্গে কি অমনতর করতে হয় রে বাপু!

হরিদাস সে কথা কানে তুলিল না। গাড়োয়ানকে বলিল, "ঠাকুর বলছেন, আর এক আনা বেশী পাবি চাচা!"

জগন্নাথ হাসিলেন—হরিদাসের আচরণে বড় দুঃখেও তিনি না হাসিয়া থাকিতে পারিতেন না। পরে বিদায়ার্থী শিষ্যদের দিকে চাহিয়া বলিলেন——"হরি ত গাড়ীভাড়া করে, কিন্তু এদিকেও আর সূর্য্যাস্তের বড় দেরী নাই। যাত্রাকালে তাড়াতাড়িতে সেটা ভাবা হয় নাই। এখন কি করা যায় বল দেখি?"

তখন তিন শিষ্যে কিছু গোল বাধিল। পরাণ বলে গিয়া কাজ নাই—শিবু বলে যাওয়াই ভাল, কেননা ডাঙ্গার চেয়ে জলে ভয় বেশী। রাম কিছু বলে না, সে ইহার মধ্যেই বাড়ী ফিরিবার কথা ভাবিয়া অন্যমনস্ক হইতেছিল। পরাণ রাগিয়া উঠিয়া শিবুকে বলিল, "পথে ডাকাতের ভয়, ঠাকুর একা এই রাত্রে যাবেন—আর আমরা সুখে বাড়ী ফিরে যাব!" এবার রাম বাড়ীর কথা ভুলিয়া গেল—মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া বলিল, "সে কি, তাই কি হয়? কাল সকালে ঠাকুর যাবেন।" দুজনকে একদিক্ হইতে দেখিয়া শিবু চুপ করিয়া রহিল।

আমরা পলাশী যুদ্ধের আগের কথা বলিতেছি। তখন বড় অরাজক—দেশের প্রায় সর্ব্বত্র ডাকাইতের হাঙ্গামা। তবে এ অঞ্চলে ভয় কিছু কম—কেননা রাজধানী মুরশিদাবাদ খুব কাছে। অন্যত্র যাহাই হউক, এখানে তখনও শাসন তেমন শিথিল হয় নাই। তবে শিবু যা বলিয়াছিল, ডাঙ্গার চেয়ে জলে ভয় বেশী, সে কথা মিথ্যা

নহে। তখন সচরাচর গভীর রাত্রে পদ্মাগর্ভে অনেক যাত্রীর নৌক মারা পড়িত। জলের ডাকাইত ধরা তত সহজ ব্যাপার ছিল না।

জগন্নাথ অনেক ভাবিলেন। রাত্রিকাল, পথ ভাল নহে—সঙ্গেও অনেক জিনিস পত্র, কিন্তু এদিকেও আর চারিদিন মাত্র দেরি। তিনি সময়ে গৃহে না ফিরিলে গোপীনাথের বসন্তোৎসবের কি হইবে? সকল উদ্যোগ বিফল হইবে? এ পর্য্যন্ত বংশে যাহা হয় নাই, এবার তাঁহা হইতে তাহাই হইবে? আর কোন কথা মনে আসিল না। জগন্নাথ পরম ভক্ত—গোপীনাথের প্রধানোৎসবের বিঘ্ন ঘটিবে, এ চিন্তা তাঁহার অসহ্য হইল। তখন তিনি হরি হরি স্মরণ করিয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন,——

"হরি যাওয়াই স্থির—জিনিস পত্র গাড়ীতে তোল।" হাসিয়া গাড়োয়ানকে বলিলেন—"বাপু, হরির কথা শুনিও না, তুমি কি চাও?" গাড়োয়ান হাঁকিল—আট আনা। জগন্নাথ দ্বিরুক্তি করিলেন না। আবার হাসিয়া হরিদাসকে বলিলেন—"কেন হরি, গাড়োয়ান ত বেশী কিছু বলে নাই।" হরি কথা কহিল না. রাগে গর গর করিতে করিতে নিজের তলপী উঠাইল। হুঁকাটী লইতে ভুলিল না। কিছু না বলিয়া, ঠাকুরের দিকে না ফিরিয়াই অগ্রসর হইল।

তখন পরাণ করযোড়ে বিনীত ভাবে ঠাকুরের কাছে নিবেদন করিল যে আজ্ঞা হইলে তাহারা তিন জনে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারে। রাত্রি কাল, কি জানি বিপদ ঘটা বিচিত্র নহে। জগন্নাথ শিষ্যদের প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু সম্মত হইলেন না। আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"বাপু হে, আমি গোপীনাথের কার্য্যে যাইতেছি, বিপদের ভয় করিও না। তোমরা সব বাড়ী ফেলিয়া আসিয়াছ, এখনই ফিরিয়া যাও।" তখন শিবু এবং রাম চোখের

জল মুছিতে মুছিতে প্রভুর দ্রব্যাদি গাড়ীতে উঠাইয়া দিল। আর পরাণ ততক্ষণ তাঁর চরণ তলে পড়িয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল।

জগন্নাথের পুঁজি হাসি—এখনও সে সৌম্য মূর্ত্তি হাসিতে প্রদীপ্ত হইতেছিল, কিন্তু চোখের জল তা মানিল না। ফোঁটা কত গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি চক্ষু মুছিতে মুছিতে প্রণত শিষ্যদের মস্তকে ধীরে ধীরে পদস্পর্শ করিলেন, এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। গাড়োয়ান গাড়ী ছাড়িয়া দিল। জগন্নাথ লাঠিহস্তে পদব্রজে চলিলেন।

তখন পরাণ, শিবু, রাম দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রভুর দিকে চাহিয়া রহিল। জগন্নাথ একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া হাত নাড়িয়া বলিলেন,—"বেলা যায়, নৌকায় গিয়া উঠ।" যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গেল, শিষ্যেরা দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া নৌকায় আসিয়া উঠিল। তিন জনেই প্রভুর সুন্দর মূর্ত্তি ভাবিতেছিল—তিন জনেই ভাবিতেছিল সে তাঁহার প্রধান প্রিয় পাত্র।

ততক্ষণ পদ্মার বিশাল স্থির বক্ষে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের রক্তিমাভ কিরণ খেলিতেছিল। কি সুন্দর! নৌকা নিঃশব্দে ভাসিয়া যাইতেছিল, আর সেই আরোহী তিন জনের বিষণ্ণ মনে প্রকৃতির সে অন্তিম ছবি খানি প্রতিফলিত হইতেছিল। সকলই নীরব—কেহ কাহার সঙ্গে কথা কয় না।

——:০:——

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে গাড়ী ভগবানগোলা পার হইল। হরিদাস কিছু আগে, প্রভুর গাড়ী ছাড়ার যে কিছু বিলম্ব হইল, তাহার মধ্যেই সে আর এক গাড়োয়ানের সঙ্গে আলাপ করিয়া কিঞ্চিৎ তাম্রকূট সংগ্রহ করিয়া লইল এবং লাঠির অগ্রে নিজের ক্ষুদ্র তলপী ঝুলাইয়া বড়

আরামে তামাকু খাইতে খাইতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। স্পষ্ট করিয়া ফিরিয়া দেখে না, কিন্তু অপাঙ্গে প্রভু ও প্রভুর গাড়ীর দিকে বরাবর নজর রাখিতে রাখিতে চলিল। ভগবানগোলা পার হইয়া হরিদাস এক আম্রবৃক্ষতলে বসিল এবং পুনশ্চ তামাকু সেবনের উদ্যোগ করিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। দ্বাদশীর চাঁদ কিরণ দিতেছে।

হরিদাস বসিল, দূর হইতে দেখিতে পাইয়া জগন্নাথ গাড়োয়ানকে শিখাইয়া দিলেন, গাড়ী ঐ গাছতলায় যেন একবার রাখে। হরি রাগ করিয়াছে, তার মান ভাঙ্গিতে হইবে।

হরির গোসা দূর হইয়াছে। সে চকমকি ঠুকিয়া আগুন করিয়া তামাকু খাইতেছিল এবং চন্দ্র কিরণে প্রফুল্ল হইয়া বিরহ কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিল। গাড়ী আসিল, প্রভুও আসিলেন, হরি সব দেখিয়াও দেখিল না। জগন্নাথ ডাকিলেন "হরি!" হরি কথা কহিল না, কিন্তু মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার হস্তে কলিকাটী দিল। জগন্নাথ প্রসন্ন হইয়া বসিলেন, বলিলেন—"হরি, বড় সুন্দর রাত্রি। বিরহ কীর্ত্তনেরই এ সময় বটে। তুমি গাহিতেছিলে, থামিলে কেন? আবার গাও, আমি শুনি।"

হরি এবার কথা কহিল। বলিল, "চলুন, গাহিতে গাহিতে যাই। এখানে বসিলে দেরী হইবে।—কি বল চাচা?"

এখন চাচা হরিদাসের অস্ফুট গালি কিছু কিছু বুঝিয়াছিল বোধ হয়, উত্তরটা তেমন হৃষ্ট চিত্তে দিতে পারিল না। হরি বুঝিতে পারিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইল। কেনমা, বাঙ্গালী মুসলমান হইলেও গাড়োয়ান মুরশীদাবাদের এত নিকটে আসিয়া কাফেরের গালি সহ্য করিবে, এমন দুরাশা হরি মনে স্থান দিল না। হরি বলিল —"চাচা, মাসে তুমি কয় ক্ষেপ গাড়ী বও—বেশ পোষায় ত?"

তখন গাড়োয়ান একটু প্রসন্ন হইল। এবং হরিদাসকে দুঃখের দুঃখী জানিয়া নিজ দুঃখের কান্না কাঁদিতে আরম্ভ করিল। চাচা যাহা বলিল, তাহার অর্থ এই যে তার বৃহৎ পরিবার, অনেকগুলি লেড়কা বালা, আল্লা তার নসীবে সুখমাত্র লেখে নাই। কথা প্রসঙ্গে সে ইহাও জানাইল যে নিকটে বনের মধ্যে একজন "হেঁদু ফকীর" আছে —সে গরিব দুঃখীর মা বাপ। কষ্টে পড়িলে লোকে তার শরণাপন্ন হয়।

জগন্নাথ এ সব কিছু শুনিতেছিলেন না, তিনি চক্ষু ভরিয়া কৌমুদীপ্রফুল্ল প্রকৃতির শোভা দেখিতেছিলেন। অনতিদূরে গভীর বন দেখা যাইতেছিল—চন্দ্রালোকে সে বন ঈষৎ শ্যাম, ঈষৎ নীল শৈল-শ্রেণীবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল। মাথার উপরে কোকিল গায়িতে-ছিল,—পার্শ্বস্থ বৃক্ষে বউকথাকও নিজের মর্ম্ম কথা বলিতেছিল, আর দূরে পাপিয়ার গগনভেদী স্বরলহরী থাকিয়া থাকিয়া অমৃত বর্ষণ করিতেছিল। এই মাত্র মৃদু মন্দ সমীরণ বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পরম বৈষ্ণব জগন্নাথ তখন সে আম্র বৃক্ষকে কদম্ব বৃক্ষ ভাবিয়া আত্ম-বিস্মৃত হইতেছিলেন।

হরিদাসের চক্ষু সকল দিকে—সে প্রভুর চরিত্র বুঝিত। অতএব আর দেরি মাত্র না করিয়া গাড়োয়ানকে গাড়ী ছাড়িতে বলিল। অনিচ্ছায় জগন্নাথ সে আম্রতল হইতে উঠিলেন—আত্ম-বিস্মৃতি আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতেছিল,—চরণে তাঁহার গতিশক্তি রোধ হইয়া আসিতেছিল। ইহা বুঝিয়া হরি গাড়োয়ানের কানে কানে বলিয়া দিল, ঠাকুরের পিছনে পিছনে গাড়ী লইতে হইবে। আগে জগন্নাথ, মাঝে গাড়ী, পশ্চাতে হরিদাস নিজে কৌশলে এই রূপ বন্দোবস্ত করিয়া হরি গাড়ী ছাড়িতে বলিল। প্রভুর "দশার ভাব" দেখিয়া হরি অন্য সময়ে বড় আনন্দিত হইত, কিন্তু এ স্থান এবং সময়ে সে বড়

বিপদ জ্ঞান করিতে লাগিল। এই গাড়োয়ান যবন, সম্মুখে ঐ বন, কে জানে উহার নিজের লোকজন উহাতে লুকাইয়া নাই? তখন হরিদাস প্রথম গাড়ী ছাড়িবার সময় রাগ করিয়াছিল বলিয়া মনে মনে অনুতাপ করিল। ভাবিল, এই রাত্রি কালে না আসিলেই ছিল ভাল—আসা যদি হইয়াছে, তবে পরাণ, শিবু, রামকে সঙ্গে আনিয়া বালুচরে বিদায় দিলেই হইত। হরির হৃদয়ে দারুণ পশ্চাত্তাপ হইল—কিন্তু সে দমিবার লোক নহে। অপাঙ্গে গাড়োয়ানের প্রত্যেক আচরণ, প্রত্যেক ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিতে লাগিল, বাহিরে বড় সরল—চাচাকে সাজিয়া কলিকা দেয় এবং চাচীর রূপ এবং প্রণয়ের কথা জিজ্ঞাসা করে। হাসিতে চাচার সকল দন্তগুলি বাহির হইয়া পড়িয়া চন্দ্রালোকে অধিকতর শ্বেত দেখাইতেছিল। সেই আবক্ষলম্বিত কৃষ্ণ শ্মশ্রু শোভিত আঁধার মুখখানিতে দন্তের সে ভীষণ শোভা দেখিয়া হরিদাস মনে মনে চাচাকে নিশ্চয়ই ডাকাত ঠাহরাইতেছিল, এবং অতি কুলগ্নে যাত্রা করা হইয়াছিল ভাবিয়া এক মনে হরিনাম জপ করিতেছিল।

ততক্ষণ জগন্নাথ আচার্য্য আপনার অজ্ঞাতসারে অগ্রসর হইতে ছিলেন। তাঁহার সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃতি ঘটিয়াছিল। যেন তিনি আর সে জগন্নাথ নহেন—সে মুহূর্ত্তে তাঁহার পৌরুষ ভাব এককালে লয় হইয়াছিল। ভাবিতেছিলেন, তিনি সেই প্রণয়শালিনী বিরহোন্মাদিনী রাধিকা,—আজি এই মাধবী যামিনীতে দূরে ঐ মুরলীরব তাঁহারই নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। আর কি স্থির থাকা যায়? দাঁড়াও প্রাণেশ্বর! কোথাকার লোকলাজ, কুলের কলঙ্ক, সুপথ কুপথ, মায়া মমতা! দাঁড়াও হৃদয়বল্লভ, গোপীজনবাঞ্ছা হৃষীকেশ! দাঁড়াও প্রভু! চিরাশ্রিতা, চিরপ্রেমভিখারিণী দাসী আমি—অপেক্ষা কর প্রভু!—এমন সময়ে হরিদাস আবার বিরহ কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। তাহার

সুকণ্ঠে সুললিত পদ সেই স্থান, কাল এবং পাত্রের মহিমায় জীবন্ত মোহমন্ত্রবৎ ধ্বনিত হইতে লাগিল। কিছুক্ষণের জন্য কোকিল, বউ-কথাকও, পাপিয়া সে গানে আপন আপন সঙ্গীত ভুলিয়া গেল। কিছুই আর শুনা যায় না—সুধু সেই মর্ম্মস্পর্শী বিরহ সঙ্গীত। জগন্নাথের দেহ পুলকে কণ্টকিত হইল। সুখসেব্য বসন্ত সমীরণ হিল্লোলেও তাঁহার স্বেদ নির্গম হইতেছিল।

গাড়ী তখন বনে প্রবেশ করিয়াছে। বনে বড় বড় আম, কাঁঠাল, অশ্বত্থের গাছই বেশী। বন না বলিয়া প্রকাণ্ড উদ্যান বলিলেই তাহার যথার্থ পরিচয় দেওয়া হয়। তবে দক্ষিণ দিক্ কিছু নিবিড়—তেমন চন্দ্রকরেও আঁধার দেখাইতেছিল। জগন্নাথ এ সব কিছুই বুঝিতেছিলেন না, কিন্তু হরিদাস গানের মধ্যেও সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল। গাড়োয়ান বলিয়া দিল, এই বাগানে, ঐ নিবিড় জঙ্গলে সে "হেঁদু ফকীরের" ঘর। সচরাচর কেহ সেখানে যাইতে পারে না!

হঠাৎ হরিদাসের কণ্ঠরোধ হইল—গাড়োয়ান সসম্ভ্রমে গাড়ী থামাইল। জগন্নাথ সশব্দে পড়িয়া গেলেন,—তাঁহার মূর্চ্ছা হইল। জটাজুট-শ্মশ্রুধারী উন্নতদেহ কাপালিক আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। গাড়োয়ান ভয় পাইল না—বরং সেলাম করিল। কিন্তু হরিদাস সে মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে অভিভূত হইল।

—:০:—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে একবার জগন্নাথের বাড়ীর খবরটা লওয়া আবশ্যক। তাঁহার গৃহ কাটোয়ার সন্নিকট, গঙ্গার ধারে কল্যাণপুর নামক ক্ষুদ্র গ্রামে। গৃহে এখন পরিবারের মধ্যে—জ্যেষ্ঠা ভগিনী এবং স্ত্রী। আর একটি মাত্র ছেলে নাম তার লোকনাথ, আর একটি মেয়ে প্রভাবতী—

সে পালিতা কন্যা। অন্য কেহ ছিল না। নাপিত বৌ দাসীর কাজ করিত, ফেলা হাড়ি ওরফে ফলহরি সর্দ্দার রাত্রে বাড়ী রক্ষা করিত এবং প্রয়োজন মতে দিনেও এক আধবার দর্শন দিয়া যাইত।

গ্রামেও জগন্নাথের ৫।৬ ঘর শিষ্য ছিল - তার মধ্যে সঙ্গী হরিদাস একজন। গুরুদেবের প্রবাস কালে তাহারা সর্ব্বদা তাঁহার বাড়ী দেখিত এবং তাঁহার জমি আবাদ করিত। হরিদাসের মাতা এবং স্ত্রী রোজ দুই একবার গুরুবাড়ী আসিত এবং প্রত্যহ প্রসাদ পাইত।

শিষ্যদের কল্যাণে আচার্য্যের বেশ সম্পন্ন অবস্থা। গৃহ দেবতা গোপীনাথের প্রত্যহ অন্ন ভোগ হইত—পাড়ার বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যারা সুতরাং প্রায়শঃ প্রসাদ লাভ করিতেন। অতিথি অভ্যাগত কেহ মধ্যাহ্নে আসিলেও অসম্ভ্রম হইতে হইত না। আর গ্রামের দুঃখীদের মধ্যে যাহার যে দিন কিছু জুটিত না, সে মধ্যাহ্নে আসিয়া "আচার্য্যি ঠাকুরের" বাড়ী পাত পাড়িত। জগন্নাথের স্ত্রী হৈমবতী বড় সুশীলা, সকলকেই মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া খাইতে দিতেন। ননদিনী মৃণ্ময়ী আসলে লোক ভাল, তবে তিনি কিছু রুক্ষভাষিণী। অন্যায়টা তাঁহার সর্ব্বথা অসহ্য। ঠাকুর ভোগের আগে কেহ পাত পাড়িতে আসিয়াছে দেখিলে তিনি জ্বলিয়া যাইতেন। হৈমবতী তাহাতে বড় অপ্রতিভ হইতেন—ভোগের আগে প্রসাদার্থী কাহাকেও দেখিলে অবশ্য পুরুষ নহে—ধীরে ধীরে সাবধান করিয়া দিতেন। তাহারা পরে আবার যথা সময়ে ফিরিয়া আসিয়া বৌঠাকুরাণীকে আশীর্ব্বাদ করিত।

জগন্নাথের গৃহ গঙ্গার ঠিক উপরে। বাড়ীটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একটী মাত্র ইষ্টকরচিত দ্বিতল গৃহ—আর সব মাটীর ঘর। উঠানে তিনটী বড় বড় মরাই—যেন চঞ্চলা কমলার পিঞ্জর। বাড়ীর ভিতর তিনটী গাছ—একটী কামিনী ফুলের, একটী লেবু আর একটী পেয়ারা। লেবুগাছটী বারমাস একদল মৌমাছির দখলে থাকিত।

অন্দর হইতে বহির্ব্বাটীর পথে ঠাকুরঘর, সেও মৃণ্ময়, কিন্তু অতি যত্নে রচিত। উঠানে চারি কোণে বড় বড় ইষ্টক বেদীতে চারিটী তুলসী গাছ। বহির্ব্বাটীতে চণ্ডীমণ্ডপ—সেখানে গোপীনাথের দোল হয়। তাহার প্রাঙ্গণে বেদিকা বেষ্টিত পুরাতন সহকার তরু বেড়িয়া বেড়িয়া প্রকাণ্ড মাধবীলতা বিসর্পিত হইয়া উঠিয়াছে। বৈঠকখানার সম্মুখে একটী বকুলগাছ, কখন পত্রের সৌন্দর্য্যে এবং কখন বা ফুলের গন্ধে সেস্থান মুগ্ধ করিয়া রাখিত।

যখন সন্ধ্যাকালে বন পথে জগন্নাথের সেই অবস্থা, তখন বাড়ীতে কি হইতেছিল বলি শুন। অবশ্য সেই দ্বাদশীর চাঁদ উঠিয়াছে। সে বড় শোভা। ভাগীরথীর চঞ্চল বক্ষে চন্দ্র কিরণ পড়িয়া পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছে। অনন্ত চন্দ্রকরলেখা অনন্ত প্রবাহে মিশিয়াছে, ক্বচিৎ একমাত্র লহরী, একমাত্র আবর্ত্তন সে স্বপ্নময় শান্তি ভাঙ্গিয়া দিতেছে। দূরে সে নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া নাবিকের গান পরদায় পরদায় উঠিতেছে—গান বুঝা যায় না, কিন্তু সে সুরে শ্রোতার হৃদয় লয় হইতেছিল। জগন্নাথের বৈঠকখানার সম্মুখে বকুল ঝোঁপে বসিয়া কোকিল মহাশয় বিরহ যাতনায় হু হু করিতেছিলেন—লোকে শুনিতেছিল কু-উ-উ! আর ঠাকুর বাড়ী আর অন্দরের উঠানে পৌষ-সংক্রান্তির সেই আলিপনার রেখা—এখনও তা মুছিয়া যায় নাই—সেই আলিপনার রেখা শুভ্রতর দেখাইতেছিল; সেই লক্ষ্মীর পা, সকমল মৃণালের চিত্র শ্বেতসর্প বলিয়া এক একবার ভ্রম হইতেছিল।

গোপীনাথের আরতি শেষ হইয়া গিয়াছে। মৃণ্ময়ী ছাদে বসিয়া গঙ্গা দর্শন করিতে করিতে হরিনামের মালা ফিরাইতেছিলেন এবং প্রতিবেশিনী আত্মীয়ার সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন। কথায় কথায় জগন্নাথের বাড়ী আসার কথা উঠিল, মৃণ্ময়ী হরিনামের মালা মাথায় স্পর্শ করিয়া ঝুলির মধ্যে রাখিলেন, চিন্তা প্রকাশ করিয়া বলিলেন,

"বড় ভাবিতে হয়েছে বোন্, আজও জগন্নাথ কেন বাড়ী এলোনা। অন্য বছর এতদিন কোন্ কালে আসে। পদ্মাপারে পৌঁছান খবর পেয়েছি, তবু ভাবনায় ঘুম হয় না। আর দোলেরও ত দিন নেই—কি হবে তাই ভেবে অস্থির হয়েছি।"

প্রতিবেশিনী বরদার মা মৃণ্ময়ীর সমবয়স্কা প্রবীণা গৃহিনী—তবে পরের কথায় কিছু থাকেন ভাল। তিনিও যেন বড় চিন্তিত, দীর্ঘ নিশ্বাস এবং 'আহা'র বহুল প্রয়োগ করিয়া মৃণ্ময়ীকে তাহা বুঝাইয়া দিলেন। বেশীর ভাগ বলিলেন, "বউও বড় ভাবছে!"

মৃ। কোন্ বউ?

বরদার মা। কেন লোকুর মা! নাপিতবৌ তাই বলছিল।

মৃ। নাপিতবৌ বড় দোঠকৃঠকে—বউ তাকে ও সব কথা বলে কেন?

এই বলিয়া ব্যাঘ্র-রাশি মৃণ্ময়ী ঠাকুরাণী "বউ, বউ" বলিয়া দুই বার ডাকিলেন, কিন্তু উত্তর পাইলেন না। বউ তখন নীচে পাকের ঘরে লোকনাথ এবং প্রভাবতীকে আহার করাইতেছিলেন, ননদের গর্জ্জন শুনিতে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। বরদার মা একটু অপ্রতিভ হইয়া কথা ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন, বলিলেন,—

"যাহোক, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বউ তোমার। অনেক অনেক বউ দেখেছি, কিন্তু এমন আর দেখি নাই। মুখে কথাটী নাই। তোমায় যেন বাঘের মত দেখে।"

মৃণ্ময়ী নিতান্ত অপ্রসন্ন হইলেন না। এবং বউকে ডাকিতে ভুলিয়া গেলেন। কিন্তু নাপিতবৌর উপর রাগ বাড়িল বই কমিল না। বলিলেন,

"বউ ভাল বটে, কিন্তু লোকে পাছে মন্দ করে। এই নাপিতবৌটাকে আমার বড় ভয় করে, মাগী বড় দোঠকৃঠকে! জগন্নাথ

গোপীনাথের ইচ্ছেয় ভালোয় ভালোয় বাড়ী আসুক, দোলের পর ওকে বিদায় দিব।"

বরদার মা মৃণ্ময়ীকে চিনিত,—ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠে দেখিয়া পলায়ন স্থির করিল এবং কাজ আছে বলিয়া উঠিয়া গেল। নাপিতবৌর বে-আদবি মনে করিয়া অনেকক্ষণ মৃণ্ময়ী ঠাকুরাণী রাগে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিলেন। পরে শান্ত হইয়া হরি-নামের মালা বাহির করিয়া আবার জপে নিযুক্ত হইলেন।

নীচে পাকশালে হৈমবতী লোকনাথ এবং প্রভাকে ভাত খাও-য়াইতেছিলেন। লোকনাথ ১০। ১১ বৎসরের, কিন্তু প্রভা সাত বছরের মাত্র, তাহাকে খাওয়াইয়া দিতে হইতেছিল। লোকনাথ হাসিতে হাসিতে বলিল,

"মা তুই বোনটীকে অত ভাল বাসিস্ কেন? ও ত তোর পেটে হয়নি?"

হৈম ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"ছি বাবা, ও কথা বলিতে নাই।" প্রভার চক্ষু ছল ছল করিতেছিল। হৈম মৃদুভাবে পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কে তোরে একথা বলিল রে, লোক?"

লোক। কেন নাপিতবৌ! প্রভার মার মরার কথা, বাপ সন্ন্যাসী হইয়া যাওয়ার কথা, সব কথা যে আজ আমাদের কাছে বলিল। শুনে প্রভা কত কাঁদিল। ঐ দেখ মা, এখনও বোনটীর চোখ ফুলে রয়েছে।

হৈম লজ্জায় প্রভার দিকে চাহিতে পারিল না। মুখ নত করিয়া মনে মনে নাপিতবৌর বুদ্ধির নিন্দা করিতেছিল। প্রভা কাঁদিয়া ফেলিল।

তখন হৈম প্রভাকে কোলে তুলিয়া লইল। "লক্ষ্মী মা আমার।

কে বলে তোমার মা নাই ?—আমিই ত মা !”—প্রভার যে সকড়ি হাত, তাহা তথন মনে স্থান পাইল না।

প্রভার আর খাওয়া হইল না, কিন্তু লোকনাথ বসিয়া বসিয়া আহার সম্পূর্ণ করিল। ততক্ষণ হৈমবতী প্রভাকে ভুলাইতেছিলেন। পুত্রের আহার শেষ হইলে দুজনের মুখ প্রক্ষালন এবং প্রভার বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। শেষ লোককে আদর করিয়া কাছে ডাকিলেন। দুষ্টছেলে একটু রঙ্গের গন্ধ পাইয়া বড় খুসী হইল—হাসিয়া বলিল—“কেন মা ?”

“একটী কথা বলিব, শুন্‌বি ত সোণাছেলে আমার ?”

লোক। আগে ত বল কি কথা !

মা। এ কথা পিসিমাকে বলিও না —কেমন ?

দুষ্টছেলে বুঝিল, মার অনুরোধটা কি। কিন্তু তবু দুষ্টামি ছাড়ে না। হাসি সম্বরণ করিয়া নিতান্ত ভাল মানুষের মত বলিল—“কি কথা মা ?”

মা। এই প্রভার কান্নার কথা। তা হলে নাপিতবৌর বড় লাঞ্ছনা হবে। বলিও না বাপ্‌ আমার !

লোক মাথা নাড়িয়া সায় দিল, কিন্তু তখনই নাচিতে নাচিতে পিসীর কাছে গেল। পিসী তখন জপে মগ্ন। ডাকিল “পিসিমা !” কিন্তু পিসিমা বড় আদর করিলেন না, বরং ভাইপোকে কাছে আসিতে দেখিয়া হুঁ হুঁ করিয়া ছুঁইতে মানা করিলেন।

এখন লোকনাথের বড় দরকার যে পিসিমার জপ একটু শীঘ্র সাঙ্গ হয়, নহিলে মজা হইবে না। অতএব সুবোধ ছেলে পিসিকে আর কিছু না বলিয়া লাফাইয়া ছাদের আলিসায় উঠিতে চেষ্টা করিল। মৃন্ময়ী সশঙ্কে জপ শেষ করিলেন এবং চীৎকার করিয়া ব্যস্ত হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছে আসিলেন, বলিলেন।

"হতভাগা ছেলে, নাব বল্‌চি! পড়ে এখুনি মারা যাবি যে! নেবে আয় বলচি!"

লোক তাই চায়। হাসিয়া নাবিয়া আসিল এবং পিসির কোলে উঠিতে গেল।

পিসি। ছুঁস্‌নে আমায়—তোর নোঙরা কাপড়। এইখানে বস্‌। প্রভা কোথায়?

তখন লোক বসিয়া বসিয়া প্রভা এবং নাপিতবৌর কথা সকলই বলিল। মিথ্যা কিছুই বলিল না। দুষ্ট বটে কিন্তু অসত্যপ্রিয় নহে। একটু রঙ্গপ্রিয়, তাই মার কাছে মাথা নাড়িয়াও পিসির কাছে এ কাহিনী বলার লোভটুকু সামলাইতে পারিল না। আর নাপিতবৌর উপর একটু রাগ ছিল—কেন সে যখন তখন বোনটীর সঙ্গে বিয়ে হবে বলে রাগায়?

তখন মৃণ্ময়ী ঠাকুরাণী একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার গর্জ্জনে বাড়ী কাঁপিয়া উঠিল। হৈমবতী প্রমাদ গণিল। পিসির হুকুম পাইয়া লোকনাথ বড় স্ফূর্ত্তিতে বাহির বাটীতে ফ্যালাহাড়ির অনুসন্ধানে ছুটিল।

হৈম রান্নাঘরের কাজ সারিয়া নিজে কাপড় ছাড়িয়া প্রভাকে কোলে করিয়া আদর করিতেছিল। প্রভা টুক্‌টুকে মুখখানি চাঁদের পানে স্থাপিত করিয়া ছোট ছোট দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছিল এবং মার কাছে কড়ি গাছের গল্প শুনিতেছিল। হৈম একটু অবসর পাইয়া মাথার ঘোমটা কিছু কমাইয়া আনিয়াছিল—মৃদুমন্দ বসন্ত সমীর আসিয়া তাহার অলকদাম ঈষৎ কম্পিত করিয়া শ্রান্তি দুর করিতেছিল। আর আকাশের চাঁদ হাসিয়া হাসিয়া এই মানবীর সুকুমার হৃদয়ের লীলা-ভঙ্গ দেখিতেছিলেন।

এমন সময়ে ননদের গর্জ্জনে বাড়ী কাঁপিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে লোকনাগ ছুটয়া বাহির বাটীতে গেল দেখিয়া প্রথমে হৈম ভাবিল,

বুঝি লোকুর জন্ম ঠাকুরঝিকে অশুচি হ'তে হয়েছে। কিন্তু আর বড় ভ্রম রহিল না। নাপিতবৌর যে আজ কপাল ভাঙ্গিয়াছে, তাহা তখনই প্রতিবেশীদেরও হৃদয়ঙ্গম হইল। সেই নীরব নিশীথে মৃণ্ময়ী ঠাকুরাণীর সুকণ্ঠ আকাশতলে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ননদ ডাকিল "বউ,—ও বউ, একবার উপরে এস ত!" বউ কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভাকে কোলে করিয়া পূর্ণমাত্রায় ঘোমটা টানিয়া ছাদে চলিলেন। মনে নানা ভয়, নানা তর্ক বিতর্ক। সে দিনকাল গিয়াছে, কিন্তু তবুও আজ "ননদী বাঘিনীর" বিভীষিকা নব বধূর চলন ফেরন শাসিত করিয়া থাকে।

বউ আসিয়া নত ভাবে একধারে দাঁড়াইলেন। মৃণ্ময়ী ঠাকুরাণী একবার বধূর আপাদ মস্তক দেখিয়া লইলেন—কিন্তু কোন কটু কথা বলিলেন না। তাহার চরিত্রের প্রধান মূর্ত্তি শাসনপ্রিয়তা—হৈমবতীর মত তন্ময় রাজভক্ত প্রজাও সংসার রাজ্যে আর হয় না। অতএব মৃণ্ময়ী বউকে বড় ভাল বাসিতেন—কখন উচ্চ কথাটী বলিতেন না। বিধাতা তাঁহাকে সে সুমতি দিয়াছিলেন, নহিলে জগন্নাথের গৃহ তেমন শান্তিময় হইত না।

মৃন্ময়ী মৃদুভাবে বধূকে নিকটে বসিতে বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কাপড় ছাড়িয়াছেন কি না? তখন প্রভাকে টানিয়া কোলে লইলেন।

প্রভার মুখ দেখিয়াই বুঝিলেন, লোকুর কথা সত্য—কাঁদিয়া চক্ষু ফুলিয়াছে। নাপিতবৌর উপর রাগের বেগ আবার তীব্র হইল,—

"দেখেছ, পোড়ার মুখীর আক্কেল! আমি ওকে ঝাঁটা মেরে তাড়াব। নহিলে ও কোন দিন তোমায় আমায় ঝগড়া বাধিয়ে দিবে!"

হৈম অপ্রতিভ হইল এবং অবিশ্বাসের মৃদু হাসি হাসিল। কোন কথা কহিল না। ননদের স্বভাব জানিত। বুঝিত যে তাঁর রাগের মুখে যাহা কিছু বলা হইবে, তাহাতেই রাগ বাড়িবে, কমিবে না। বধূকে নীরব দেখিয়া হৈম ঠাকুরাণী নাপিতবৌর চৌদ্দ পুরুষের ইতিহাস বলিতে লাগিলেন।

ওদিকে ফ্যালা হাড়ি বৈঠকখানার বারান্দায় নিত্য যেমন শয্যা রচনা করে, তেমনি করিয়া নিদ্রার সুখ উপভোগ করিতেছিল। ইহার মধ্যেই তার অর্দ্ধেক রাত্রি—এবং তার নাসিকার বিকট ধ্বনিতে লোকনাথের এক একবার ভয় করিতেছিল। লোক শিয়রে দাঁড়াইয়া ডাকিল "ফ্যালারে ফ্যালা,—ওঠ বলচি ওঠ, পিসিমা ডাক্‌চে।" দুই পাঁচ, সাত ডাক—তথাপি উত্তর নাই, কিন্তু নাসিকার গর্জ্জন ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল। আটবারের বার শ্রীমান্ ফলহরির নিদ্রাভঙ্গ হইল।

ফ্যালা উঠিয়া বিরক্ত হইয়া বলিল,—"কি ঠাকুর এত রাত্রে ডাকাডাকি কেন? চাঁদনি রাত, আজও একটু ঘুমুতে দিলে না?"

কিন্তু তখনই পিসি ঠাকুরাণীর চির পরিচিত মধুর রব তাহার কানে গেল। ফ্যালা দ্বিরুক্তি না করিয়া বালক ঠাকুরের সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে গেল।

উঠানে আসিয়া ফ্যালা হাঁকিল,—"আজ্ঞে আমি এসেছি!" সঙ্গে সঙ্গে লোকনাথ পিসিমার নিকট গিয়া বসিল। তখন নাপিত বৌর চতুর্দ্দশ পুরুষের—শ্বশুর এবং পিতৃকুল উভয়েরই—শ্রাদ্ধ হইতেছিল।

পিসি ঠাকুরাণী ফ্যালার আওয়াজ শুনিয়া প্রভাকে বধূর কোলে দিলেন—সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—এবং আলিসার কাছে দাঁড়াইয়া হুকুম দিলেন—

"নাপিত বৌ পোড়ারমুখীকে একবার ডাক ত—রাত্রেই যেন আসে।"

হৈম মৃদুভাবে বলিলেন, "কাল সকালে ত সে আসিবেই!" কিন্তু সে কথা ননদের কানে গেল না।

অবসর বুঝিয়া লোকনাথ পিসিমাকে অনুরোধ করিল—"সেই রাজপুত্র, সদাগরের পুত্তরের কথা বল।" তখন মৃণ্ময়ী ঠাকুরাণী হরিনামের মালা এবং নাপিতবৌকে অব্যাহতি দিয়া উপকথায় মন দিলেন।

হৈমর তাহাতে মন ছিল না—তিনি ততক্ষণ স্বামীর পদারবিন্দ চিন্তা করিতেছিলেন। সেই মুহূর্ত্তে, বন পথে জগন্নাথের মূর্চ্ছা হইল। অকস্মাৎ হৈমবতীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—অজ্ঞাত বিপদের বিষাদ ছায়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার মনের উপর দিয়া চলিয়া গেল। এ সংসারে বিধাতার সৃষ্টির প্রধান রহস্য মানুষ নিজে—অথচ মানুষ আত্ম-জ্ঞান যতটা সহজ ভাবে, আর কিছু ততটা নহে।

ফ্যালা হাড়ি লাঠি ঠক্ ঠক্ করিয়া নাপিত বৌর বাড়ী চলিল। কাঁচা ঘুমটা ভাঙ্গিয়াছে, অতএব ফলহরি সর্দ্দার অপ্রসন্ন চিত্তে এবং মৃণ্ময়ী ঠাকুরাণীর সম্বন্ধে শীঘ্র শীঘ্র গঙ্গা লাভের কামনা করিয়া কচ্ছপ গতিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। ফলহরির একটু একটু সাপের ভয় আছে—এ জন্য যেখানে গাছের ছায়া বা প্রাচীরের রেখায় চন্দ্র কিরণ কলঙ্কিত হইয়াছে, দূর হইতে সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া লাঠি একটু বেশী মাত্রায় ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে যাইতেছিল। পথে শ্রীদাম মদকের সঙ্গে দেখা হইল। শ্রীদাম দোকান পাট বন্ধ করিয়া

বাড়ী ফিরিতেছিল। সর্দ্দারকে চিনিয়া শ্রীদাম হাঁকিল—"সর্দ্দারের পো এখন যাও কোথায়? আচার্য্য ঠাকুর আসেন নাই?"

ফ্যালা। (দুঃখিত ভাবে) যাব আর কোথায় মাথা মুণ্ডু—ও সব জিজ্ঞেস্ কর কেন? এই খেটে খুটে দুপুর রাতে একটু ঘুমুচ্ছিনু—তা এখনই নাপিত বৌকে ডাক্!

শ্রীদাম। এর মধ্যেই ঘুমুচ্ছিলে সর্দ্দার—পহর রাতও যে হয় নি। এখন নাপিত বৌকে কেন? পিসি ঠাকুরাণী বুঝি রেগেছেন? ঐ ভয়ে আমি ঠাকুর বাড়ী বড় একটা যাইনে!

ফলহরি বড় দুঃখেও হাসিল। বলিল—"পিসিমা নোক ভাল, দয়া মায়া আছে, তবে একটু রাগী রুখ্‌খী! তা সবাই ভাল মানুষ হলে কি চলে ছিদাম? পিসিমা আছেন বলেই আচাযি্য ঠাকুরের সংসার অমন চলে,—নইলে যেমন ভাল মানুষ ঠাকুর, তার চেয়ে আবার ঠাক্‌রুণটী!"

শ্রীদাম কথাটা ফিরাইতে চেষ্টা করিল—কি জানি পাছে পিসি ঠাকুরাণীর কানে উঠে! অতএব শ্রীদাম ফলহরি সর্দ্দারের কথায় সাড়ে ষোল আনা সায় দিয়া "আচাযি্য ঠাকুরের" এখনও বাড়ী না আসার কারণ সুধাইল। সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দারকে অনুরোধ করিল, এবার "ভিন গাঁর" লোককে কোন কাজ না দিয়া দোলের মিষ্টান্ন তাহাকেই সব যেন ফরমায়েস্ দেওয়া হয়। মদকপুত্র ইহাও বুড়া সর্দ্দারকে ইঙ্গিতে জানাইল যে তাহাতে তারও কিছু লাভ থাকিবে।

ফলহরি মিষ্টান্ন ভোজনাশায় দ্বিগুণ বল পাইয়া কচ্ছপ গতি একটু দ্রুত করিলেন এবং অল্প কাল মধ্যে নাপিতবৌর বাড়ী পৌঁছিলেন। তখন শ্রীমতী বিধুমণি ওরফে নাপিতবৌ একটু আগে প্রতিবেশিনীর সঙ্গে উদ্দেশে কোন্দল ও জয়লাভ করিয়া দাওয়ায় চাঁদের আলোকে শুইয়াছিলেন। কাছে বসিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠা যাতা নিজ কন্যা

সোহাগীর মাথা নাড়িয়া দিতেছিল এবং নাপিতবৌর কৃত পরনিন্দা বিশেষ তৃপ্তির সহিত গলাধঃকরণ করিতেছিল। নাপিতবৌ গ্রামের অন্যান্য বাড়ীর কুৎসা শেষ করিয়া নিজ মনিব বাড়ীর পালা গাহিতেছিলেন এবং মৃণ্ময়ী ঠাকুরাণীর চরিত্রের বিধিমতে আশ্লেষণ বিশ্লেষণ করিয়া বউ ঠাকুরাণীকে আসরে নামাইলেন। তখন যাতা বলিল,—

"এ তোর বড় অন্যায় ভাই—বউ ঠাকুরাণীর নিন্দার কি কিছু আছে? ও কথা বলিস্‌নে বোন্‌,—অধম্ম হবে!"

নাপিতবৌ শুইয়াছিল, উপাধানে বামহস্ত এবং তাহার উপর মস্তক রক্ষা করিয়া দলিত ফণিনীবৎ অর্দ্ধ শয়ান হইল। যাতার দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিল—

"আমার চেয়ে তুই বেশী জানিস দিদি? আমি ত তার নিন্দা কর্‌চিনে—বল্‌চি কি, বউটা বড় মিন্‌মিনে প্যান্‌প্যানে!"

যাতা। কেন? সবাই ত তার সুখ্যাতি করে।

না। ছাই অমন সুখ্যাতের মুখে! আদ্ধেরে মাগী, বয়েস্‌ হলো ৬।৭ গণ্ডা, এখনও ননদের কাছে যেন জুজুমানা! কেন রে বাপু তোর হলো ঘর সংসার, ননদকে অত ভয় কেন?

যাতা চুপ করিয়া রহিল—এ নিন্দাটা তার ভাল লাগিতেছিল না,—কিন্তু প্রতিবাদ করিতেও আর সাহস হয় না।—এখনি নাপিত-বৌ তুমুল কোন্দল বাধাইবে। কোন্দলে তিনিও বড় অপটু নহেন, তবে নাপিতবৌ সে মহাব্যাপারে একরূপ সিদ্ধবিদ্যা। অতএব সোহাগীর মা, বোবার শত্রু নাই ভাবিয়া নীরবে কন্যার মাথা নাড়িতে লাগিল এবং অভ্যাস গুণে সে অল্পালোকেও উৎকুণ জাতির ধ্বংস করিতেছিল। কোন্দলের বড় সুযোগ চলিয়া যায় দেখিয়া নাপিতবৌ

ফুলিতে লাগিল এবং বার বার যাতার উপর তীব্র কটাক্ষ বর্ষণ করিতেছিল।

এমন সময়ে লাঠি ঠক্ ঠক্ ফলহরি সর্দার সে রঙ্গভূমে দর্শন দিলেন। প্রথমে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সর্দার বিরাশী ওজনে গলার আওয়াজ দিলেন এবং ভাঙ্গা গলায় হাঁকিলেন,—"নাপিতবৌ!"

নাপিতবৌ ফলহরিকে চিনিয়া মনে মনে তাহাকে বুড়া এবং পোড়ারমুখো প্রভৃতি সুসভ্য ভাষায় সমাদৃত করিয়া যেন চেনে নাই এমনই ভাণ করিল—যে অবস্থায় শুইয়াছিল, সেই ভাবেই থাকিয়া বলিল—"কেরে মিন্‌সে, এত রাত্রে?"

ফলহরি একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"আমি গো নাপিতবৌ—আমি, ফলহরি!"

"ওমা সর্দ্দারের পো!—তা এত রাত্রে কেন গা?" এই বলিয়া লজ্জাশীলা উঠিয়া বসিল এবং অতি ব্যস্ত হইয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিল।

ফলহরি বলিল—"পিসি ঠাকরুণ ডেকেছেন— এখনই যেতে হবে!"

"কেন, ঠাকুর কি এসেছেন?"—নাপিতবৌর কণ্ঠ সন্দেহপূর্ণ।

ফল। তা নয়—পিসিমা কেন ডেকেছেন।

নাপিতবৌ একটু ভাবিল, বুঝিল আজ্ প্রভাকে কাঁদাইয়াছিল বলিয়াই এ জোর তলব। সর্দ্দারের সঙ্গে রাত্রেই মনিব বাড়ী গেলে পরিণাম যাহা হইবে, বুঝিতে তাহার বাকী রহিল না। মৃণ্ময়ী ঠাকুরাণীকে যে চিনিত, তাহার অন্য সিদ্ধান্ত করার সম্ভাবনা ছিল না। বিশেষ, নাপিতবৌ।

নাপিতবৌ সর্দ্দারকে আদর করিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল,—"বলি সর্দ্দারের পো, পিসিমার রাগ টাগ ত দেখ নাই?" মনে বড় সন্দেহ, বুড়া পাছে আসল কথা না বলে।

কিন্তু ফলহরি তত ফের ফাঁপর বুঝে না—যাহা জানিত, একেবারে বলিয়া ফেলিল। “রাগ বৈ কি, খুব রাগ, গলার চোটে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল!—গরিব মানুষ, খেটে খুটে একটু ঘুমুচ্ছিনু,—তা এই চাঁদনি রেতে—”

নাপিতবৌর মতলব সিদ্ধ হইল, কাজেই সে আর বুড়ার কাঁদুনি শুনিতে রাজি নহে। সর্দ্দারকে বাধা দিয়া বলিল,—“বলগে পিসি ঠাকুরুণকে, আজ্ আমার অসুখ করেছে, কাল সকালে যাব!”

এই বলিয়া নাপিতবৌ পুনরায় শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল—সত্য সত্যই যেন অসুখ করিয়াছে। ফলহরি আবার লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে আচার্য্য গৃহে ফিরিল, এবং বাটীর মধ্যে আর না গিয়া যথা স্থানে শয়ন করিল।

তখন পিসি ঠাকুরাণীর উপকথা শেষ হইয়াছিল—লোকনাথ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহারও ঘুম পাইতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া লোকনাথকে কোলে করিয়া তিনি শয়ন করিতে গেলেন—নাপিতবৌ তখন আর হৃদয়ে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছিল না। হৈমবতী তৎপূর্ব্বেই প্রভাকে লইয়া শয়ন করিয়াছিলেন—নিদ্রার জন্য নহে—চিন্তার জন্য। জগন্নাথের পূর্ণ মূর্ত্তি মনে করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন—কিন্তু পারিতেছিলেন না। মুখেরও সবটা একেবারে মনে আসে না।—কি বিপদ! তখন সাধ্বী স্বামীর সেই প্রীতিপ্রফুল্ল, অনিন্দ্যসুন্দর ললাট এবং নেত্র যুগল ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রা গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জটাজুটধারী সন্ন্যাসী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। জগন্নাথ ভূমিশয্যায় অজ্ঞান—স্পন্দমাত্র রহিত। আম্রশাখার অবকাশ পথে

চন্দ্র কিরণ আসিয়া তাঁহার মুখে ও বামবাহুতে পড়িয়াছে। মুখের সবটা দেখা যাইতেছিল না, কিন্তু তাহাতেই সে সৌম্যমূর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল। একটু দূরে দাঁড়াইয়া গাড়োয়ান ও হরিদাস। গাড়োয়ানের দাঁড়াইবার ভঙ্গী সরল অথচ সম্ভ্রমময়—ভয়ের সঙ্কোচ বা চাঞ্চল্য নাই। হরিদাস বাস্তবিক ভয় পাইয়াছে, কিন্তু অনতি-বিলম্বে সে মনের চাঞ্চল্য দমন করিয়া ফেলিল। তখন সঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী ও গাড়োয়ানের ভাব ভঙ্গী লক্ষ্য করিতে লাগিল। গাড়োয়ানের নিঃসঙ্কোচ ভাবে হরির পূর্ব্ব সন্দেহ জাগিয়া উঠিল, কিন্তু সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি দেখিয়া সে সন্দেহ মনে বড় স্থান দিতে পারিল না। ইহারই মধ্যে এক একবার প্রভুর দিকে অলক্ষ্যে চাহিতেছিল।—ভয় বা বিস্ময়ের অনুরোধে একবারও হরিনাম ভুলে নাই।

সন্ন্যাসীর দীর্ঘ গঠন এবং নিবিড় জটাজুট ভিন্ন সে চন্দ্রালোকে আর বড় কিছু দেখা যাইতেছিল না ।বর্ণ গৌর নহে—অতএব কেশরাশির মহিমায় তখনকার মুখচ্ছবির কোন ভাবভঙ্গী বুঝা যাইতেছিল না। হরিদাস সকল স্থলে লোকের মুখ দেখিয়া মনের কথা জানিতে চেষ্টা করে, অনেক স্থলে সফলও হয়, কিন্তু এখন তাহার যত্ন বিফল হইল। এ সব কয়েক মুহূর্ত্তের কাজ। বজ্রগম্ভীর স্বরে সন্ন্যাসী ডাকিলেন—"গাড়োয়ান!" গাড়োয়ান করযোড়ে নিকটে আসিল, কোন কথা কহিল না। সে স্বরে কঠোরতার সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটু মাধুরী ছিল, যাহাতে শ্রোতার হৃদয় স্নিগ্ধ হয়। হরিদাস কিছু আশ্বস্ত হইল—আশা তাহার কানে কানে বলিয়া দিল, সন্ন্যাসী যেই হউক, ডাকাইতের সর্দ্দার নহে।

সন্ন্যাসী মূর্চ্ছিত জগন্নাথের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হইয়াছে?" গাড়োয়ান ভাল করিয়া সব উত্তর দিতে পারিতে-

ছিল না, কাজেই হরি আসিয়া জুটিল এবং বিনীত ভাবে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে বুঝাইয়া দিল যে জগন্নাথের মূর্চ্ছা ভয়বশত নহে। এ মূর্চ্ছা "দশার" মূর্চ্ছা—এখনই ভাঙ্গিবে। সেই আশ্বাসে সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন—দৃষ্টি সম্পূর্ণ সেই তৃণশয্যাশায়ী অজ্ঞান মূর্ত্তির উপর। হৃদয়ে তাঁহার তুমুল ঝটিকা বহিতেছিল। মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল না দেখিয়া শেষে সন্ন্যাসী জগন্নাথের নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, বলিলেন—"ভয় নাই বটে, কিন্তু বড় দুর্ব্বল। একটু শুশ্রূষার দরকার। চল, আমার কুটীরে লইয়া যাই।"

হরির ভয় দূর হইতেছিল, কিন্তু এ কথায় তাহার মনে নূতন রকমের সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে কিঞ্চিৎ দুঃসাহস সংগ্রহ করিয়া চোক মুখ বুঝিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরের কথায় প্রতিবাদ করিয়া বসিল। সন্ন্যাসী মুখে কোন উত্তর দিলেন না, ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া হরিদাসকে বেশী কথা বলিতে বারণ করিলেন। কথায় প্রকাশ না হউক, কিন্তু মূর্ত্তিতে সে অস্পষ্টালোকেও রুষ্টভাব প্রকাশ পাইতেছিল। হরি তাঁহার একটী মাত্র কটাক্ষ দেখিয়া মুখ নত করিল। বিদ্যুতে যেমন চক্ষু ঝলসিয়া যায়, সে ভৈরব মূর্ত্তির কটাক্ষ-পাতে হরির সে দশা হইল।

সন্ন্যাসী আর অপেক্ষা মাত্র না করিয়া মূর্চ্ছিত জগন্নাথকে একেবারে কোলে তুলিয়া লইলেন। অবলীলাক্রমে জগন্নাথের বলিষ্ঠ স্থূলদেহ কক্ষে লইয়া তিনি সেই নিবিড় কাননের দিকে চলিলেন—সে অসম্ভব বল দেখিয়া হরি এবং গাড়োয়ান বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া রহিল। হরিদাস কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিল না। বিপদে তাহার তত উপস্থিত বুদ্ধি, সন্ন্যাসীর কটাক্ষে ভাসিয়া গিয়াছিল। গাড়োয়ান হরির কানে কানে বলিয়া দিল—"তুমিও কেন সঙ্গে যাও না—ভয় নাই, গরিবের মা বাপ!" হরি একটু উচ্চস্বরে

উত্তর করিল—"আর জিনিস পত্র ?" তখন তাহার বুদ্ধির স্থিরতা ছিল না।

হরির কথায় সন্ন্যাসী একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলেন, কিন্তু দাঁড়াইলেন না। সে কটাক্ষ হরি দেখিতে পাইল না, কিন্তু গাড়োয়ান দেখিল। কটাক্ষ যেন তাহার মর্ম্ম স্পর্শ করিল। সে কম্পিত দেহে, করযোড়ে সন্ন্যাসীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—"জিনিস পত্রের জন্য ভাবনা নাই, কর্ত্তা!"

তখন, উপায়ান্তর না দেখিয়া হরি গাড়োয়ানের ধর্ম্ম-জ্ঞানের উপর অগত্যা নির্ভর করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু সে সম্বন্ধে তাহার ঘোরতর কুসংস্কার,—মুসলমানের ধর্ম্ম-জ্ঞান থাকিতে পারে, ইহা তাহার বুদ্ধিতে আসিত না। মুসলমান ত দূরের কথা, শাক্তদের প্রতিও তার ঐরূপ ভাব। কথায় এবং কার্য্যে সর্ব্বদা সে ইহার পরিচয় দিত এবং সে জন্য আচার্য্য ঠাকুরের কাছে মৃদু ভৎসিতও হইত। ভৎসনার উত্তর দিত না, কিন্তু রাগ করিত, রাগ পড়িয়া গেলে সময় বুঝিয়া হাসিয়া হাসিয়া গুরুদেবকে অনুযোগ করিত—তাঁর কাছে বৈষ্ণবের আদর নাই! সন্ন্যাসী ঠাকুরের কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাহার ঠিক্ বোধ হইয়াছিল যে তিনি ডাকাইতের সর্দ্দার নহেন, কিন্তু সে মূর্ত্তি শক্তি উপাসকের মূর্ত্তি, ইহা তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না। অতএব একটু অশ্রদ্ধা ভিতরে ভিতরে উদয় হইল। সন্ন্যাসী জগন্নাথকে আপন আশ্রমে লইয়া যাইতে চাহিলে তাহার সন্দেহ হইল, কি একটা কুমতলব আছে, ঠাকুরকে শেষে শক্তিমন্ত্রই দিয়া দেয়, কি আর কিছু করে! তাই সে অসমসাহসে সন্ন্যাসীর প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছিল। এক্ষণে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া বিপন্ন প্রভুর সঙ্গে থাকাই কর্ত্তব্য স্থির করিল এবং সমস্ত মনটুকু হরিপদে নিক্ষেপ করিয়া বিধর্ম্মী শাক্তের অনুসরণ করিল। মনে হইল বাড়ী আর

ফিরিতে পারিবে না।—একবার বৃদ্ধা মাতা এবং স্ত্রীর জন্য হৃদয় বড় চঞ্চল হইল—কিন্তু বৈরাগীর সে চাঞ্চল্য কতক্ষণ? গুরু সম্মুখে আছেন, তাহাই যথেষ্ট। যাইবার সময় হরি গাড়োয়ানকে বলিয়া গেল—"দোহাই তোমার আল্লার—উপরে ঐ আকাশ আছেন!" গাড়োয়ান স্থির ভাবে বলিল—"বৈষ্ণবের ব্যাটা, তুমি নির্ভাবনায় যাও—কোন পরওয়া নেই" এই বলিয়া সে গোরু দুটাকে ছাড়িয়া দিয়া গাড়ীখানি আমগাছ তলায় রাখিল।

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে সন্ন্যাসী গভীর কাননাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। গভীর কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এত গভীর যে তেমন সুন্দর জ্যোৎস্নালোকও তাহাতে বড় প্রবেশ করিতে পারে নাই। বৃক্ষ শিরে শ্যামল পত্রগুচ্ছে যে কিরণ প্রতিফলিত হইতেছিল, নীচে তাহাই আধ আলো আধ ছায়ায় উষার মলিন জ্যোতি প্রতিবিম্বিত করিতেছিল। কোন গাছে পাখী আছে কি না বুঝা যায় না, এমনি নীরব—ভয়ে বুঝি শুষ্ক পত্রও খসিয়া পড়িতেছে না! হরিদাসের শরীরে কেমন এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আশঙ্কার ভাব জন্মিতেছিল। সে শক্তির রাজ্য—বৈষ্ণবের প্রেমময় দৃষ্টির স্থান নহে।

এই ভাবে প্রায় দুই দণ্ড গেল। সন্ন্যাসীর দীর্ঘ দেবদারুতরুতুল্য দেহ মাত্র হরিদাসের লক্ষ্য—দৃষ্টি কেবল সম্মুখে, পার্শ্বে চাহিতে সাহস হয় না। এমন সময়ে দূরে একটা আলোক স্তূপ দেখা গেল—সে আলোক সম্মুখস্থ বারিরাশিতে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। পরিখার উপর দিয়া একটী মাত্র পথ, তাহাও বৃক্ষবাটিকায় নিক্ষিপ্ত। পথের প্রবেশ দ্বারে সেই অগ্নি-স্তূপ—সহসা প্রবেশ করা যায় না। হরি ভাবিল, আগুনের ভিতর দিয়া সন্ন্যাসী যাইবে কিরূপে?—আমিই বা যাই কি প্রকারে? ভাবিতে ভাবিতে দেখিল, সন্ন্যাসী অগ্নি সম্মুখস্থ হইয়া একবার দক্ষিণ বাহু আন্দোলিত করিলেন—অমনি

আগুন নিভিয়া গেল। সন্ন্যাসীকে আর দেখা গেল না—কিন্তু আগুন আবার জ্বলিয়া উঠিল। তখন বিস্ময়ে হরিদাসের গতি রোধ হইল, মনে হইল সকলই ভৌতিক কাণ্ড। পশ্চাতে ফিরিতেও আর সাহস হয় না। ভাগ্যে যাহাই থাক্, ঠাকুরের কি হয় দেখিতে হইবে। এই ভাবিয়া হরি স্পন্দিত হৃদয়ে নিকটস্থ বৃক্ষ-তলে বসিল। অমনি বৃক্ষোপরি শ্যেন পক্ষী বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন রাত্রি প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। দূরে শৃগালের কোলা-হল শুনা যাইতেছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অগ্নিকুণ্ড পার হইয়া সন্ন্যাসী বৃক্ষবাটিকার পথে অগ্রসর হইতে-ছিলেন—সম্মুখে সুদীর্ঘ মনুষ্য মূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী মৃদুভাবে বলিলেন, "তোমাকেই এখন আমি চাহিতেছিলাম ভৈরব! কিন্তু তুমি দিবসের শ্রমে ক্লান্ত হইয়াছ ভাবিয়া একটু ইতস্তত করিতেছিলাম। জনার্দ্দন কোথায়?"

জনার্দ্দনের তখন অর্দ্ধেক রাত্রি—কিন্তু বেশী কথা বলা ভৈরবের অভ্যাস নহে। সে শুধু গাম্ভীর্য্যের ম্লান হাসি হাসিল। সন্ন্যাসী তাহার দুই অর্থ বুঝিলেন। প্রথমত, জনার্দ্দন এমন সময়ে কবে জাগিয়া থাকে—দ্বিতীয়ত শ্রমে কি আবার ক্লান্তি আছে না কি? ভৈরব নীরবে প্রভুর দিকে বাম বাহু প্রসারিত করিল। সন্ন্যাসী হাসি-লেন—"পারিবে না ভৈরব, দুই বাহুরই দরকার। আমার তাহাতেও কষ্ট হইয়াছে।" কিন্তু ভৈরব বাম বাহুই স্থির রাখিল—জগন্নাথকে কোলে লইবার সময় একবার মাত্র দক্ষিণ বাহু আন্দোলিত করিল। তখন তাঁহাকে শিশুর মত বামস্কন্ধে ফেলিয়া চলিল। দুই চারি

কথায় উপযুক্ত আদেশ দিয়া সন্ন্যাসীও ভিন্ন পথে চলিয়া গেলেন।

ভৈরব আসিয়া একখানি মাটির ঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইল, একখানি দীর্ঘ অজিনাসন, নীচে তার খড়ের বালিশ বিছানা ছিল। ভৈরব অতি যত্নে মূর্চ্ছিত জগন্নাথকে তাহার উপর শয়ন করাইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল—ব্যাপার খানা কি? বুঝিল সামান্য মাত্র মূর্চ্ছা—মাথার এক স্থান ফুলিয়াছে স্পর্শে অনুভব করিয়া সিদ্ধান্ত করিল, এই পতনই মূর্চ্ছার কারণ। তখন ভৈরব ঘরের ভিতর হইতে মাটীর কলসীর শীতল জল তাম্র পাত্রে ঢালিয়া রোগীর মাথায়, মুখে, চোখে সেচন করিতে লাগিল। তাহার উপর মৃদুমন্দ সমীরণ শরীর শীতল করিতেছিল। ক্রমে জগন্নাথের চেতনা হইল—তিনি হরি হরি বলিয়া উঠিয়া বসিলেন।

প্রথমে আচার্য্য কিছু বুঝিতে পারিলেন না। চারি দিকের দৃশ্য ভয়েরই উপযোগী। দীর্ঘ তাল এবং দীর্ঘতর দেবদারু ও শাল বৃক্ষ সকল ভীম নীরবে অনন্ত গম্ভীর মন্ত্রীসমাজের মত শনৈঃ শনৈঃ শির সঞ্চালন করিতেছিল— কোথাও কিছু দূরে ঝাউ বৃক্ষশ্রেণী অবিশ্রান্ত সির্ সির্ শব্দে বায়ু প্রবাহ রোধ করিতেছিল। সে কাননতলেও চন্দ্রকররাশি প্রতিবিম্বিত হইতেছিল—কিন্তু একটু একটু ছায়া ছায়া ম্লান মূর্ত্তি। বৃক্ষশিরে শ্যামল পত্র সকল কিন্তু সর্ব্বত্রই কৌমুদী সম্পাতে সমান উজ্জ্বল। জগন্নাথের সে দিকে দৃষ্টি ছিল না। তিনি সেই ভীমদর্শন কানন তলে অপরিচিত অসাধারণ মনুষ্য মূর্ত্তি দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন।

জগন্নাথকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া ভৈরব পুনরায় গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল এবং কতকগুলি ফল ও ভৃঙ্গারে পূর্ণ করিয়া জল আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিল। জগন্নাথ তাহা স্পর্শও করিলেন না। দেখিয়া ভৈরব করযোড়ে বিনীতভাবে তাঁহাকে আহার করিতে

অনুরোধ করিল। বিস্মিত জগন্নাথ কিছু আশ্বস্ত হইলেন। কেননা সে স্থান কাল পাত্র ধরিলে আতিথ্য-সৎকারের স্থল ছিল না। আর মানুষের পক্ষে মনুষ্য কণ্ঠের মোহিনী শক্তি কত, জীবনে এই তিনি প্রথম অনুভব করিলেন।

যাহা হউক, তথাপি তিনি কিছু বুঝিতে পারিলেন না। হরি হয় ত নিকটেই তাঁহার মত বিপন্নাবস্থায় আছে, তাহাকে উচ্চস্বরে ডাকিতেও সাহস হয় না। একবার মনে হইল, এ বুঝি ভৌতিক মায়া। হয় তাহাই, নয় ডাকাইত, দুয়ের একটা ইহা তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত হইল। তাঁহাকে যেই যে ভাবে ধরিয়া আনিয়া থাকুক, ভৈরব যে তাহার অনুচর মাত্র এবং তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তখন জগন্নাথ কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন -"তুমি কে?"

উ। আপনার দাস।

জ। আমার দাস! সে কেমন কথা?—

উ। এখন আপনারই দাস—যে যখন বিপদে পড়ে, আমি তখন তাহারই দাস। কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।

জ। বুঝিলাম তোমার সার্থক ব্রত! ভাল এ কোন্ স্থান? তোমারই বা নাম কি?

উ। এ স্থান শক্তি-কানন। আমার নাম ভৈরব।

জগন্নাথ বুঝিলেন, অভ্যাস বা শিক্ষামত ভৈরব বড় মিতভাষী, আপনা হইতে বেশী কথা বলিবে না। কি প্রশ্ন করিবেন, আপনার সেই বিপন্নাবস্থায় কৌতূহল বৃত্তির কতখানি পরিচালনা করা উচিত তাহা তিনি ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ বাক্য ব্যয় করিলেন না। শেষে কথা কহিলেন—"হরিদাস কোথায় আছে?—আমার ভৃত্য হরি কি এখানে নাই?"

ভৈরব কথায় কোন উত্তর দিল না—ইঙ্গিতে তাঁহাকে অনুসরণ করিতে বলিয়া পথ দেখাইয়া চলিল। সে ইঙ্গিতে এত বিনয়, যে জগন্নাথ আচার্য্য মুগ্ধ হইলেন। জ্যোৎস্নালোকে এতক্ষণে তাহার ভীমকান্তরূপ তিনি চক্ষু ভরিয়া দেখিতে পাইলেন। "কান্ত" বলিলে যদি গৌরবর্ণ বুঝিতে হয়, তবে আমরা কিছু গোলে পড়িলাম। কৃষ্ণবর্ণে পুরুষোচিত বলিষ্ঠ গঠন এবং দীর্ঘায়ত জ্যোতির্ম্ময় চক্ষুর যে সৌন্দর্য্য, আমরা তাহা দিন দিন ভুলিয়া যাইতেছি! এ "কালা আদমির" দেশে কথায় কথায় তুষার এবং কৌমুদীর মিলনের চেষ্টাটা কিছু বাড়াবাড়ি রকমের হইয়া উঠিয়াছে। সেকেলে জগন্নাথ ভৈরবের সে মূর্ত্তি দেখিয়া ভাবিতেছিলেন—মানুষের মত মানুষ বটে!

উভয়ে এক জীর্ণ প্রাচীন মন্দির সমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মন্দির শীর্ষে অশ্বত্থবৃক্ষ শাখা প্রশাখায় চন্দ্র কিরণ মাখিয়া মৃদু সমীরে ঈষৎ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছিল। সর্ব্বত্র নিশীথের নীরবতা—মাঝে মাঝে কোকিল বৌকথাকও পাপিয়ার দূর-শ্রুত গীতি লহরীর শেষ তানটুকু মাত্র শুনা যাইতেছিল। আর সেই রুদ্ধ-দ্বার মন্দির হইতে এক একবার ধ্যানমগ্নের প্রলাপময় অথচ নিমজ্জনোন্মুখবৎ মনুষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হইতেছিল। সেইখানে সোপানোপরি জগন্নাথকে বসাইয়া রাখিয়া ভৈরব হরির খোঁজে চলিয়া গেল।

জগন্নাথ এক মনে সেই কণ্ঠস্বর শুনিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে শরীর তাঁহার কণ্টকিত হইল। সেই বিজন কাননে চির পরিচিত কণ্ঠ শুনিয়া তিনি স্তম্ভিত এবং কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সেই জীর্ণ মন্দির ভবানীমন্দির—তিনিই শক্তিকাননের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। প্রতিষ্ঠাতা একজন তান্ত্রিক ধনী—শেষ বয়সে তিনি বিষয় বাসনা ত্যাগ করিয়া এইস্থানে বাস করিতেন। রাজমহলের নিকট বিন্ধ্যশ্রেণীর পাদমূলেও তিনি আর এক ভবানীমন্দির স্থাপনা করিয়াছিলেন—সেথানেও সময় সময় থাকিতেন। সেই থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ভবানীর উভয় প্রতিষ্ঠা ভূমির তিনি নাম দিয়াছিলেন—**শক্তি-কানন।**

সন্ন্যাসী তাঁহারই শিষ্য এবং উভয় শক্তি-কাননের এখন অধিকারীও তিনি। অধিকাংশ সময় তিনি পাহাড়ের শক্তি-কাননে কাটাইতেন,—এখানে সময়ে সময়ে আসিতেন মাত্র। ভৈরব বরাবর সঙ্গে থাকিত। এখানকার স্থায়ী পূজারী জনার্দ্দন শর্ম্মা। তাঁহার পরিচয় ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি।

মূর্চ্ছিত জগন্নাথকে ভৈরবের হস্তে সমর্পণ করিয়া সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে ভবানীমন্দিরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ধীরে ধীরে—কারণ আজ্ বড় অন্যমনস্ক। স্মৃতির উপর স্মৃতি আসিয়া তাঁহার হৃদয় মথিত করিতেছিল। সংযতচিত্ত সন্ন্যাসী মন্দিরে প্রবেশ করিয়া যথন দ্বার রুদ্ধ করিলেন, তথন তাঁহার গণ্ডে দুই ফোঁটা অশ্রু প্রদীপ আলোকে জ্বলিতেছিল। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ উজ্জলতর করিতে গিয়া তিনি বাহিরে অন্তরের অভিনয় প্রত্যক্ষ করিলেন। প্রদীপ উজ্জলতর হইল—সঙ্গে সঙ্গে শিখা বিকীর্ণ করিয়া দুই ফোঁটা জ্বলন্ত ঘৃত গৃহতলে পড়িয়া গেল। তথন সন্ন্যাসী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধ্যানে বসিলেন।

মনস্থির হইতেছিল না। সম্মুখে খর্পর খড়্গাধারিণী, নীলবরণা

মহামায়া মূর্ত্তি—নিশীথে মৃদু প্রদীপালোকে সে মূর্ত্তি ভয়ানক দেখাইতেছিল। সন্ন্যাসী হৃদয়ে সে মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত করিতে চাহিতেছিলেন—পারিতেছিলেন না। আত্ম-হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যে তিনি অবসন্ন হইতেছিলেন—মানস-নেত্রে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিতে-ছিলেন—তুচ্ছ পথ মাত্র অতিক্রম করিয়াছেন। কই হৃদয় ত শান্ত হয় নাই—পাপস্মৃতি ত দূর হয় নাই—সেই নরকের দৃশ্য কি অনন্ত কাল মর্ম্ম পীড়িত করিবে?

এ যন্ত্রণা বেশীক্ষণ থাকে না। থাকিলে জীবন তার অসহ্য হইত। ক্রমে সন্ন্যাসী তন্ময়চিত্তে উপাস্য দেবতার ধ্যানে মগ্ন হইলেন। অনেকক্ষণ পরে ঊর্দ্ধ নেত্রে করযোড়ে বলিতে লাগি-লেন—

"মা জগদীশ্বরি—সর্ব্বার্থ-সাধিকে! এ হৃদয়ের সকলই ত তুমি দেখিতেছ, কথায় আর কি জানাইব মা? যে বিস্মৃতিলাভের জন্য আজ সাত বৎসর তোমার চরণে রোদন করিলাম, কই তাহা ত পাইলাম না! ভুলি ভুলি কই ভুলিতে ত পারি না? অনন্তকাল ধরিয়া কি হৃদয়ে সে নরক বহিতে হইবে? দয়াময়ী তুমি—একবার পদস্খলন হইলে তার কি আর ক্ষমা নাই? নাই থাক, তুমি যাহা দিয়াছ, তাই আমার যথেষ্ট। কঠিন নীরস হৃদয়ে তুমি ভক্তির অমৃত ঢালিয়া দিয়াছ. তার চেয়ে আর অধিক আছে কি? এখন সেই ভক্তিতে বল দাও।—মূর্খতা, অনাচার স্বার্থে দেশ আজ পূর্ণ—তোমার নামে অবধুতেরা পাপের দুর্গন্ধে পুণ্যের সৌরভ মিশাইতে চায়! মাগো—আজ তোমার অধিষ্ঠান-ভূমি দুঃখ-দারিদ্র্যের আবাস হইয়াছে—তুমি বল না দিলে কে তা দূর করিবে? বল যদি না দিবে, তবে আকাঙ্ক্ষা দিয়াছ কেন!" * *

উচ্ছ্বাসে সন্ন্যাসী অবসন্ন হইতেছিলেন—এত তন্ময়তা যে ভাষা

তাঁর নিমজ্জনোন্মুখের অন্তিম ব্যাকুলতার ঘর্ঘর বই আর কিছু বোধ হইতেছিল না। সেই কণ্ঠ শুনিবার জন্যই জগন্নাথ মন্দির বাহিরে উন্মুখ হইয়াছিলেন।

হঠাৎ সন্ন্যাসীর বোধ হইল, সে মন্দির অনন্ত নীলাকাশে পরিণত হইয়াছে—কোটী কোটী সূর্য চন্দ্র তাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে—আর সকল ব্যাপিয়া অসীম ধবলাগিরি সদৃশ মহামূর্ত্তি তাহাতে নিশ্চল ভাবে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার পুঞ্জপুঞ্জ জ্যোতি-বিমণ্ডিত ভাস্বর অলকরাশির সব দেখা যাইতেছিল না—অনন্ত আকাশও তাহা ধারণ করিতে পারে নাই। আর চরণদ্বয় দেখা যাইতেছিল না, অথচ মনে হইতেছিল উভয় চরণ বেড়িয়া বেড়িয়া ব্রহ্মাণ্ডের নীল সলিল রাশি উৎসারিত হইতেছে। কি ভয়ানক! ভয়ানকে কি সুন্দর! ইহার কাছে কি মানুষের কল্পিত মূর্ত্তি! সন্ন্যাসীর চক্ষু পলকে ঝলসিয়া গেল—মুহূর্ত্তের জন্য জ্ঞান লোপ পাইল—মনুষ্য ইন্দ্রিয়ে সে অনন্ত বিরাটরূপ ধারণীয় নহে। তিনি রুদ্ধ নিশ্বাসের যাতনা অনুভব করিয়া আপনার অজ্ঞাতসারে চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। সেই উজ্জ্বল প্রদীপ—আঁধার আলোকে ছায়া ছায়া নীরব গৃহ, আর সেই ভীমা ভবানীর নীলিমাময়ী প্রতিমা আবার চক্ষুর সমক্ষে ভাসিয়া উঠিল! সকলই সেই—নির্ব্বাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্।

স্তম্ভিত সন্ন্যাসী আবার বলিতে লাগিলেন—"মা ভবানি, এ কি মূর্ত্তিতে দেখা দিলে? এ যে অনন্ত বিরাট পুরুষের মূর্ত্তি মা! ইহাতে কি বুঝিব যে আজি হইতে অনন্ত শক্তিময় ব্রহ্ম মূর্ত্তিতে তোমার উপাসনা করিব—পিতা বলিয়া ডাকিব, মা সাধের 'মা' সম্বোধন কি তোমার আর ভাল লাগে না? এমন মধুর আর কি আছে? না মা, মা নাম ভুলিতে পারিব না। এত দুঃখ দারিদ্র্য চারিদিকে, কোথাও ত শান্তি পাই না—কেবল শান্তি পাই যখন তোমায় ডাকি,

মা জগদম্বে! আজি আমরা ক্ষুধার্ত্ত শিশুর দল—অসহায় দুর্ব্বল—তোমার কাছে আবদার করিয়াই বাঁচিয়া আছি। বড় দুঃখ দুর্দ্দিনের দিন,—মা অনন্ত শক্তি, মা না বলিয়া আর কিছু বলিতে আজ যে আর মন উঠে না—কিছুতে আর যে শান্তি পাই না!—"

কতক্ষণ এরূপ চলিত বলা যায় না—কেননা সন্ন্যাসী ক্রমে উত্তেজিত হইতেছিলেন, তাঁহার মুদ্রিত নেত্র-যুগল হইতে অবিরল ধারায় অশ্রুপাত হইতেছিল। এমন সময়ে রুদ্ধ দ্বারে কে আসিয়া আঘাতের উপর আঘাত করিল। ২।৪।৫ বার—সন্ন্যাসী বুঝিলেন, এ যে-ই হউক, ভৈরব নহে। তখন তিনি ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে ভবানী প্রতিমা সমক্ষে প্রণত হইলেন। পরে বাহিরে আসিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এইখানে একটু পিছাইয়া গিয়া গোড়ার কথা না বলিলে আর চলিতেছে না। জগন্নাথ আচার্য্যের আর এক ভগ্নী ছিলেন—তিনি মৃণ্ময়ী ঠাকুরাণীর চেয়ে ছোট, জগন্নাথের বড়। তাঁহার স্বামী জগদীশ শর্ম্মা বিখ্যাত দার্শনিক, লোকে জানিত তিনি কঠোর নাস্তিক। কেননা ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পাণ্ডিত্যটুকু মাত্র তাঁর ছিল—ব্রাহ্মণত্ব বড় ছিল না। সামাজিক আচার-ব্যবহারের খুঁটিনাটি তিনি বড় একটা বুঝিতেন না এবং মানিয়াও চলিতেন না।

এরূপ প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবণতা উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে—বিশেষ যুবকের পক্ষে এ প্রকৃতির পরিণাম সচরাচর ভাল হয় না। পাণ্ডিত্যের বন্ধন সকল সময়ে এত দৃঢ় নহে যে প্রবৃত্তি-স্রোতকে ঠিক্ বিপরীত দিকে ফিরাইতে পারে। অতএব জগদীশের জীবন অনুদিন কেবল আত্ম এবং আত্মেতর ভাবের সংগ্রাম। এই সংগ্রামে জয়লাভ করিলে

মানুষ দেবত্ব লাভ করে—মহাজনেরা তাহাই করিয়া থাকেন বলিয়া আমাদের জন্য "পন্থা" নির্দ্দেশ করিতে পারিয়াছেন। এমন অনেক মানুষ আছে, যাহাদের লক্ষ্য সেই দেবত্ব—কিন্তু পশুত্বের প্রভুতা তাহাদের উপর সর্ব্বতোমুখী। মুখে সদালাপ ভিন্ন অন্য কথা নাই—ভিতরে হয় ত দৌর্ব্বল্য চারি পোয়া। যে মনুষ্য চরিত্র বুঝে না, সে সর্ব্বক্ষেত্রে ইহাতে ভণ্ডামির আরোপ করে। সংসারে ভণ্ডামির অভাব নাই, কিন্তু অনেক স্থলে সেই মৌখিক সদালাপ আন্তরিক সংগ্রামের ফল—জীবন-নাটকের ঘাত-প্রতিঘাত সেই খানে। তুমি এমন মানুষ খুব কম দেখাইতে পারিবে, যাহার জীবন এই ঘাত-প্রতিঘাতে কখন-না-কখন ক্ষত-বিক্ষত হয় নাই। ক্ষেত্রভেদে এই জীবন্ত নাটকের পরিণাম স্থির হইয়া থাকে।

জগদীশের সঙ্গে বিচারার্থ কল্যাণপুরে সময়ে সময়ে বড় বড় অধ্যাপক পণ্ডিতের সমাগম হইত—কেননা দর্শনশাস্ত্রে তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। একবার এক অবধূত আসিয়াছিলেন। তাঁহার মনের কথাটা কি প্রথমে বুঝা যায় নাই। যে কয়দিন তিনি কল্যাণ-পুরে ছিলেন, গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষতল আশ্রয় করিয়াছিলেন—সঙ্গে একজন মাত্র শিষ্য। গুরু অগ্নিকুণ্ড মধ্যে বসিয়া থাকিতেন—শিষ্য সে গণ্ডী পার হইত না। অবধূতের সৌম্য প্রবীণ মূর্ত্তি, তাঁর অগ্নিকুণ্ড, জপতপের ঘটায় গ্রামে বড় হৈ চৈ পড়িয়া গেল—মহা-পুরুষের কাছে ঔষধ লইবার জন্য অমনি অঞ্চলের লোক ভাঙ্গিতে লাগিল। জগদীশকে অনেকে আসিয়া খবর দিল যে মহাপুরুষ অনেক উৎকট ব্যাধি হাত বুলাইয়াই আরাম করিতেছেন। প্রথমে তিনি তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়াছিলেন। শেষে এত আশ্চর্য্য খবর অবিরত তাঁহার শ্রুতিপথে আসিতে লাগিল যে, পণ্ডিতও টলিয়া গেলেন। স্থির করিলেন অবধূতকে একবার স্বচক্ষে দেখিয়া আসিবেন।

তার পর আহারান্তে মধ্যাহ্নে জগদীশ সন্ন্যাসী দর্শনে গেলেন। ভয়ানক ভিড়, কিন্তু সকলেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে চিনিত, সসম্ভ্রমে তাঁর জন্য পথ মুক্ত করিল। জগদীশ কোন দিকে দৃকপাতও করিলেন না, নিঃসঙ্কোচে একেবারে মহাপুরুষের গণ্ডী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাহিরের জনতা হইতে ভয় বিস্ময়ের অস্ফুট কোলাহল উঠিল। তখন শিষ্য ঔষধ বিতরণ করিতেছিল। গুরু নীরবে দূর হইতে তাহাই দেখিতেছিলেন—কখন বা মৃদু স্বরে দুই একটী ব্যবস্থা বলিয়া দিতেছিলেন।

তখনই কল্যাণপুরের ঘরে ঘরে ভ্রমণ করিয়া এক পরম সত্য জনরব মনের গতিকেও পশ্চাৎ করিয়া গ্রামে গ্রামে রটিয়া গেল। সকলেই ভীতি-বিহ্বল চিত্তে শুনিল, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মহাপুরুষের গণ্ডীর মধ্যে যখন প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, অমনি কুণ্ডের আগুন দপ দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া তাহাকে গ্রাস করিল। কিন্তু অপরাহ্নে গ্রামবাসীরা দেখিল, পণ্ডিত সশরীরে হেলিতে দুলিতে গঙ্গাতীর হইতে গৃহে ফিরিতেছেন।

এই প্রবীণ অবধূতের নাম বিশুদ্ধানন্দ স্বামী। তাঁহার সঙ্গে জগদীশের যে সব বিচার হইয়াছিল, তাহার আমূল বৃত্তান্ত বলিবার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে আমরা কয়টী কথা বলিব।

সন্ন্যাসী বলিলেন “পণ্ডিত, এ অল্প বয়সেও তুমি দিগ্বিজয়ী দার্শনিক, এ বড় আহ্লাদের কথা। কিন্তু এ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিণাম কি?”

জগ। কি আজ্ঞা করিতেছেন, বুঝিতে পারিলাম না।

স। তুমি নিরীশ্বরবাদী কঠোর দার্শনিক, জীবনে কখন শান্তি পাইবে না।

জগ। জ্ঞানেই আমার বন্ধন, সামাজিক প্রকৃষ্ট নীতিতেই আমার

প্রবৃত্তি। তাহাতেই আমি শান্তি পাই। অসার অনিশ্চয় সার করিয়া শান্তি লাভ আমার বোধ হয় বাতুলতা মাত্র।

মহাপুরুষ। অসার অনিশ্চয় কিসে? তোমার দার্শনিকেরাই যে অভ্রান্ত তার নিশ্চয়তা কি? আপনার হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখ। দেখিবে, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত জ্ঞানে হৃদয় কখন কখন বড় চঞ্চল হয়, শ্রান্ত হইয়া হৃদয় আশ্রয় অন্বেষণ করে। এই যে আশ্রয় আশ্রিতের ভাব, ইহাই ধর্ম্ম। সেই ভাব স্ফুরণের উপায় ভক্তি। অতএব ধর্ম্ম প্রবৃত্তিমূলক। তুমি ধর্ম্ম মান না, কিন্তু সামাজিক নীতি মান। নীতির শক্তি আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু সে শক্তি নিবৃত্তিমূলক। নিবৃত্তি মান, প্রবৃত্তি মান না এ বড় আশ্চর্য্য।

জগ। আপনার ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা আপনার দিক্ হইতে দেখিলে আপাতত বেশ বিশদ বোধ হয়, কিন্তু ইহা বিচার-সাপেক্ষ। আর নীতি নিবৃত্তিমূলক কিসে, বুঝিলাম না।

স। ইহা বোধ হয় অস্বীকার করিবে না যে সমাজে মানুষ দুইটা পরস্পর বিরোধী শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে। সেই দুটা শক্তি,—বাহিরের জগতের শক্তি আর তোমার মনের জগতের শক্তি—শক্তি দুইটাকে দমন করিয়া পাঁচ জনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া সমাজে বাস করার যে ব্যবস্থা, তাহাই নীতি। কাজেই নীতি নিবৃত্তিমূলক।

জগদীশ কোন উত্তর করিলেন না—বিজ্ঞতার মৃদু হাসি হাসি-লেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "আজ্ বুঝিলে কি না জানি না, কিন্তু সময়ে আমার কথা স্মরণ করিবে। এই প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির সামঞ্জস্য নহিলে শান্তি নাই। কেন বৎস আপনার সঙ্গে আপনি সংগ্রাম করিয়া ক্ষত-বিক্ষত হও?"

পরদিন হইতে স্বামীজিকে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

ইহার কিছু দিন পরে জগদীশের প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হইল। এতদিন কোন অভাব জানিতে পারেন নাই—শাস্ত্রালোচনায় সর্ব্বদা মগ্ন থাকিতেন, আত্ম এবং আত্মেতর ভাব ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু স্ত্রী-বিয়োগে সংসার আঁধার হইল—আর কেহ ছিল না—বন্ধন বড় শিথিল হইয়া গেল। মৃতদার যুবা দার্শনিক—বয়স তখনও পঁয়ত্রিশ হয় নাই—পূর্ব্বের মত আর অনন্যমনে শাস্ত্রালোচনা করিতে পারিতেন না। দুই বৎসর মধ্যে প্রবৃত্তিস্রোতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের বাঁধ ভাসিয়া গেল।

তখন জগন্নাথ—জগদীশের চেয়ে বয়সে পাঁচ বছরের ছোট—মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাঁহার পুনরায় বিবাহ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এ বিষয়ে মা বোনকে সম্মত করা যত সহজ তিনি ভাবিয়াছিলেন বাস্তবিক কার্য্যকালে দেখিলেন, ততটা সহজ নহে। মরিলেই কি সম্বন্ধ যায়?—বিশেষ হিন্দুর মেয়ের সম্বন্ধ! আজ্ মেয়ে মরিয়াছে বলিয়াই কি আপনা হইতে তাহার সতীন করিয়া দিতে পারা যায় গা? অনেক শোক দুঃখ, প্রতি-বন্ধকের পর মা ভগ্নী বুঝিলেন যে জগন্নাথ পরামর্শটা বড় মন্দ ঠাওরায় নাই—মানুষটা একেবারে বয়ে যাবে?—আহা! তার যদি মা, বোন, ভাই বর্গ থাকিত, তবে কি বিবাহ দিয়া এ অধঃপাত নিবারণ করিত না? তারপর,—প্রথমা পত্নীর স্বর্গলাভের দুই বৎসর পরে—জগদীশ পণ্ডিত আবার বিবাহ করিলেন।

কিন্তু পাপের শক্তিটা অন্তর্জগতের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি*—একবার যদি পদস্খলন হইল, তবেঃ প্রতিপদে অধোগতি দ্রুততর হইবেই হইবে। কিছু দিন মধ্যে জগন্নাথ বুঝিলেন, পুনরায় বিবাহদানের

* "Sin is a gravitation."

উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছে। আরো বুঝিলেন, জীবনে কোন একটা গুরুতর রকমের পরিবর্ত্তন না ঘটিলে আর জগদীশ সুধরাইয়া উঠিতে পারিবে না। হইলও তাই।

নাপিতবৌর পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি। কল্যাণপুরে যে তার শ্বশুরালয় তাহাও পাঠক জানেন—তাহার পিতৃগৃহও সেইখানে। তার একমাত্র ভ্রাতা উদ্ধব, সুন্দরী যুবতী ভার্য্যা লইয়া বাস করিত। জগদীশ পণ্ডিতের চক্ষু তাহার উপর পড়িল। দেখিতে দেখিতে উদ্ধবের গৃহে সুখের প্রদীপ নিবিয়া গেল। উদ্ধব জগন্নাথের শিষ্য, শিষ্টশান্ত লোক, গুরুর খাতিরে অনেক সহিল, কিন্তু শেষে আর পারিয়া উঠিল না। যে সদাই হাসিত, তার মুখ বিষাদ-কালিমায় আচ্ছন্ন হইল—সে জগদীশের উপর জাতক্রোধ হইল। প্রতিহিংসা রাক্ষসী তাহার ঘাড়ে চাপিয়া রাতদিন কেবল চোখে চোখে রক্তের নদীর মূর্ত্তি আঁকিতে লাগিল—বুঝাইল, মনের সুখ যদি আবার ফিরিয়া চাস্ তবে এ নদী পার হ। তখন উদ্ধব আপনার কাছে আপনি প্রতিশ্রুত হইল যে অবিশ্বাসিনী ভার্য্যা এবং ইহলোকের সকল সুখ শান্তির হন্তারককে একত্রে হত্যা করিবে।

জগদীশের দ্বিতীয় বার বিবাহের চারি বৎসর পরের এ ঘটনা।—তিন দিন মাত্র তাঁহার কন্যা সন্তান জন্মিয়াছে। কার্ত্তিকী অমানিশার গভীর রাত্রে উদ্ধব প্রামাণিকের গৃহে বড় গোল উঠিল। জগন্নাথ প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঘটনা স্থলে আসিয়া দেখিলেন, উদ্ধবের গৃহে রক্তের স্রোত বহিতেছে। তাহার স্ত্রীর দেহ দ্বিখণ্ডিত হইয়া মাটিতে লুটাইতেছে—পার্শ্বে শাণিত রুধিরাক্ত খড়্গ প্রতিহিংসার জীবন্ত মূর্ত্তিবৎ ক্ষীণ দীপালোকে রক্তপ্রভা প্রতিবিম্বিত করিতেছে। আর কোথাও কেহ নাই। সকলে বুঝিল, খুনী একজনকে মারিয়াই

পলাইয়াছে, জগদীশ বাঁচিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই রাত্রি হইতে কেহ আর তাঁহার কোন সম্বাদ জানিল না।

তখনই এ সর্ব্বনেশে খবর সদ্যপ্রসূতা বালিকার কানে উঠিল। সে ঘৃণায় লজ্জায় মরিয়া গেল। পরদিন গুরুতর জ্বর হইল। এক দিনের বিষম জ্বরে মর্ম্মপীড়িতা দুঃখিনীর সকল যন্ত্রণা শেষ হইল। মরিবার আগে সে জগন্নাথের পত্নী হৈমবতীর হাতে মেয়েটীকে সমর্পণ করিয়া গেল। বছর ফিরিতে না ফিরিতে জগন্নাথও মাতৃহীন হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

সেই ভয়ানক রাত্রে প্রতিহিংসার উদ্যত খড়্গ ব্যর্থ করিয়া জগদীশ পণ্ডিত প্রাণপণে জাহ্নবীর তীরে তীরে ছুটিয়া পলাইতেছিলেন। অনুসৃত—আসন্নমৃত্যু—ভয়ার্ত্ত মৃগবৎ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত তিনি ছুটিয়া চলিলেন। ক্রমে শ্রান্ত ক্লান্ত হইতেছিলেন, দারুণ অবসাদ আসিয়া তদীয় চিত্তবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করিতেছিল। অপঘাত-মৃত্যু-ভয় দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষম আত্ম-গ্লানি তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিল। যে প্রাণের ভয় পশুবৎ এতক্ষণ তাঁহাকে তাড়না করিয়াছে, দেখিলেন তাহার বিনাশই তাঁর পক্ষে সর্ব্বতোভাবে ছিল ভাল। সম্মুখে ভাগীরথীর স্রোত অবিরাম প্রবাহিত হইতেছিল, তারকা-সনাথ সুনীল গগন ছায়া তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। জগদীশ ভাবিতেছিলেন—কিসের জন্য জীবন? সমাজে আর মুখ দেখাইবার স্থান নাই! আত্ম-হত্যাই তাঁহার পাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। এই জাহ্নবী-স্রোতে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া সকল জ্বালা যদি জুড়াইতে পারি, তবে আর এ

ভার বহন করি কেন? কিন্তু পরলোকে কি হইবে? জগদীশ পণ্ডিত ইতিপূর্ব্বে আর কখন সে কথা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখেন নাই। পরলোকের অস্তিত্বে কখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। কিন্তু আজ আত্মহত্যা স্থির নিশ্চয় করিয়া ভাবিলেন, বাস্তবিক পরলোক যদি থাকে. তাঁহার গতি কি হইবে? দেশবিশ্রুত পাণ্ডিত্য-খ্যাতি এবং যশোলাভের দুর্দ্দমনীয় স্পৃহা—ইহাই এতদিন তাহাকে মায়ামুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সে সকলের পরিণাম কি আত্ম-বিনাশ?

সহসা অদূরের শ্মশানভূমিতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। বহ্নিমুখ-বিবিক্ষু পতঙ্গবৎ বেগে সেই দিকে আকৃষ্ট হইয়া চলিতে চলিতে জগদীশ পণ্ডিত দুই একবার চিত্ত স্থির করিতে চেষ্টা করিলেন। সে পথে না গিয়া অন্য দিকে অগ্রসর হইবার উদ্যম করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। একটা অনির্ব্বচনীয় মোহ তাঁহার ইচ্ছাশক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া সেই আলোকের দিকে টানিয়া লইয়া চলিল।

সে চিতাগ্নি নহে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কল্যাণপুরে অগ্নিকুণ্ড মধ্যে তিনি যে অবধূতের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন, আজিও সেই দৃশ্য। নিষ্পাপ অগ্নিকুণ্ড মধ্যে নির্ব্বেদ পবিত্রমনা যোগী মুদ্রিত নেত্রে পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন—আর শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়াও নিজে তিনি পশুর অধম হইয়াছেন। স্বীয় কলুষিত জীবনের দৈন্য এবং হীনতা এমন করিয়া আর কখন জগদীশের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই।

পণ্ডিত তখন শরীর ও মনের সেই অবসন্নাবস্থায় এই নূতন চিত্তবিক্ষোভের বেগ আর সহিতে পারিলেন না,—মূর্চ্ছিত হইয়া অগ্নিকুণ্ডের বাহিরে সশব্দে পড়িয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর নির্দ্দিষ্ট কোন আশ্রম ছিল না। সচরাচর তীর্থস্থানের অদূরে অথচ লোকালয় হইতে পৃথক স্থানে সামান্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বৎসরের অধিকাংশ সময় তিনি ক্ষেপণ করিতেন। এইরূপে হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা বিস্তার লাভ করিয়াছিল, কিন্তু মোটের উপর শিষ্যসংখ্যা বেশী ছিল না। পরহিতে তিনি পাত্রাপাত্র বাছিতেন না, কিন্তু দীক্ষাপ্রার্থীকে বিষম অগ্নি-পরীক্ষায় ফেলিয়া এরূপ পরখ্ করিতেন যে শেষরক্ষা ভার হইত। আবার নিগূঢ় অভিপ্রায় সিদ্ধির অনুকূল বুঝিলে যোগ্য পাত্রকে আপনা হইতেই নির্ব্বাচন করিয়া শিষ্যত্বে বরণ করিতেন!

কয় বৎসর হইতে তিনি ভাগীরথী-তীরস্থ তীর্থগুলি মধ্যে মধ্যে দর্শন করিয়া বেড়াইতেছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র তীর্থদর্শনই উদ্দেশ্য নহে। যখন যেখানে যাইতেন, কল্যাণপুরের অনুরূপ অগ্নি-কুণ্ড রচনা করিয়া প্রথমতঃ ঔষধ বিতরণ করিতেন, তার পর স্থানীয় সুধীগণকে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদের সহিত নানা শাস্ত্রালোচনা করিতেন। জ্ঞান-তৃষ্ণা চরিতার্থ করা প্রধান লক্ষ্য হইলেও সেই সুযোগে কতকগুলি কর্ম্মবীর প্রস্তুত হইতে পারে কি না ইহা তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিলেন। কেবল পণ্ডিত এবং চরিত্রবান হইলেই তাঁহার আদর্শ পূর্ণ হইত না। একাগ্রতা এবং আন্তরিকতা তিনি কর্ম্মক্ষেত্রের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ উপলব্ধি করিয়া সেই গুণে গুণী অথচ পতিত ব্যক্তিকেও সমাদরে গ্রহণ করিতেন। বলিতেন, মনুষ্যমধ্যে তাহারাই রত্ন—পঙ্কে পড়িয়া মলিন হইয়াছে বলিয়া অনাদৃত হইবার নহে। কল্যাণপুরে প্রথম জগদীশ পণ্ডিতকে যখন তিনি দেখিলেন, তখনও কোনরূপ পাপ তাহার দেহ স্পর্শ করে

নাই। কিন্তু সেরূপ প্রকৃতির মুখ্য গুণ এবং দোষ নখদর্পণে প্রত্যক্ষ করিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন "কেন বৎস, আপনার সঙ্গে আপনি সংগ্রাম করিয়া ক্ষতবিক্ষত হও?

এ কথা সেই মাহেন্দ্রক্ষণে জগদীশের "কানের ভিতর দিয়া, মরমে পশিয়াছিল!" কিন্তু তখনও একাগ্রচিত্তে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভব করার সময় আসে নাই। পাপ-প্রলোভনে পড়িয়া "স্রোতের সেউলিবৎ" যখন ভাসিয়া যাইতেছিলেন, তখনই এক এক দিন স্বামীজির স্নেহার্দ্র গম্ভীর কণ্ঠ তিনি হৃদয়মন্দিরে প্রতিধ্বনিত হইতে শুনিতেন। "আজ বুঝিলে কি না জানি না, কিন্তু সময়ে আমার কথা স্মরণ করিবে। এই প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির সামঞ্জস্য নহিলে শান্তি নাই!"

যে নাস্তিক, ইচ্ছা করিয়াই সে পিতৃহীন হয়, ইহা মহাজনের কথা। পাপের পরিপূর্ণতার ভিতর, প্রথম এই পরম সত্য জগদীশ পণ্ডিতের মলিন হৃদয়ে প্রতিভাত হইল। ভগবানের এই পাপ-পুণ্যের সংসারে কোন শিক্ষাই ব্যর্থ হয় না। পত্নীহন্তা উদ্ধব তাঁহার জীবননাশে অকৃতকার্য্য হইয়া অজেয় শক্তির বৎসল ভাব জগদীশের মনে দৃঢ় মুদ্রিত করিয়া দিল। এতদিন ইচ্ছা করিয়াই তিনি পিতৃহীন হইয়াছিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বস্থলী এবং নবদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী পদ্মাতীরে তখনকার দিনে এক নিবিড় জঙ্গল ছিল। বিশুদ্ধানন্দ স্বামী সেইখানে আপনার মনোমত ক্ষুদ্র দুই খানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। প্রায় সমস্ত রাত্রি অগ্নিকুণ্ড রচনা করিয়া কুটীরের অদূরে জপতপে তাঁহার অতিবাহিত হইত।

জগদীশ পণ্ডিতের মূর্চ্ছা যখন ভাঙ্গিল, প্রভাত-সূর্য্যের কণক কিরণ তখন বৃক্ষপত্র-শিরে এবং জাহ্নবী-বক্ষে সবে মাত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।' তখনও সম্পূর্ণ জ্ঞানসঞ্চার হয় নাই। আবছায়ার মত মনে হইতেছিল, শৈশবে একবার জলমগ্ন হইয়া তিনি মাতৃ-কোলে অজ্ঞান হইয়াছিলেন। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, মাতা স্নেহপূর্ণ সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া পূর্ব্বের মতই নবীভূত জীবন-স্পন্দন লক্ষ্য করিতেছেন। দীর্ঘ কাল পরে মাতৃমূর্ত্তি দর্শন এবং তাঁহার কোমল বৎসল স্পর্শ অনুভব করিয়া পণ্ডিত বিহ্বল হইতেছিলেন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কাতর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"মাগো! মা তুমি কোথায়!"

সে কাতরোক্তি কেবল মাতৃগত প্রাণ একান্ত নির্ভরশীল শিশুতেই সম্ভবে। বিশুদ্ধানন্দ স্বামী কুটীরের হর্ম্ম্যতলে বসিয়া মূর্চ্ছিত জগদীশের মস্তক স্বকীয় উরুদেশে রক্ষা করিতেছিলেন। মাতার ন্যায় উৎকণ্ঠায় তিনি তাঁহার মুখ প্রতি চাহিয়া ছিলেন,—তাহাতে তাঁহার সুপ্রসন্ন আনন-শ্রীতে জননীসম্ভব মাধুর্য্য বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। জগদীশের কণ্ঠোচ্চারিত মাতৃসম্বোধন তাঁহার মর্ম্ম স্পর্শ করিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ভয় কি বৎস! অভয়া মাতৃরূপে তোমায় দর্শন দিয়াছেন।"

সম্পূর্ণ জ্ঞানসঞ্চার হইলে জগদীশ পণ্ডিত অনুতাপে জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন। স্বামীজির প্রতি বাক্যে এবং কার্য্যে তাঁহার প্রতি চিরপরিচিত প্রীতিপাত্রের সরল স্নেহ উছলিয়া উঠিতেছিল। ইহাতে নিজ কলুষিত জীবনের দৈন্য মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া তিনি ম্রিয়মাণ হইতেছিলেন। সমস্ত দিন বিশুদ্ধানন্দের সহিত ভাল করিয়া আলাপ করিতে পারিতেছিলেন না।

তাঁহাকে স্নানাহার এবং বিশ্রাম করাইয়া মধ্যাহ্নের পর স্বামীজি

একাকী পূর্ব্বস্থলীর বাজারের দিকে ছদ্মবেশে বেড়াইতে গেলেম। কল্যাণপুর কাটোয়ার যত নিকটবর্ত্তী, পূর্ব্বস্থলীর তত কাছে না হইলেও সেখান হইতে তেমন দূর নহে। সেই দিন হাট উপলক্ষে সে অঞ্চলের অনেক লোক সেখানে উপস্থিত ছিল।—নিজ কল্যাণপুরের ২।৪ জনও হাট করিতে আসিয়াছিল। সুতরাং জগদীশ পণ্ডিত এবং উদ্ধব সংক্রান্ত মুখরোচক পরীবাদটি শাখা-পল্লবিত হইয়া নিমেষে নিমেষে কিছু না কিছু নূতনরূপ পরিগ্রহ করিতেছিল। স্বামীজি সেই বাজার-গল্প মন্থন করিয়া তাহার সারটুকু উদ্ধার করিলেন। নিন্দুকেরা জগদীশের ন্যায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের পদস্খলনে উল্লসিত হইয়া বলিতেছিল,

দেব্‌তার বেলা লীলা-খেলা
পাপ লিখে যে মানুষের বেলা!

বিশুদ্ধানন্দ স্বামী শুনিতে শুনিতে ভাবিতেছিলেন, মনুষ্যলোকে অধিকাংশ পাপ মানুষের অসূয়া এবং পরনিন্দা-প্রিয়তার ফল। সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীরা লোকসমাজে মিলিয়া মিশিয়া কি এমন শিক্ষা-দীক্ষা দিতে পারেন না, যাহাতে মানুষ মানুষকে আন্তরিক ভাল বাসিয়া এই হীনতা পরিহার করিতে পারে! বিপন্ন একটা কাকের জন্য বায়সমণ্ডলীতে হাহাকার পড়িয়া যায়, কিন্তু মানুষের ভিতর সে সহৃদয়তা কয় জনের আছে! ওঃ, আমরা সব কি করিতেছি!

স্বামীজি সূর্য্যাস্তের পর যখন আশ্রমে ফিরিলেন, তাঁহার হৃদয় তখন এই ভাবে পূর্ণ। জগদীশের উচ্চ মাথা হেঁট হইয়াছিল, তিনি আপনা হইতে বিশুদ্ধানন্দের সম্মুখীন হইতে পারিতেছিলেন না। মানুষের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা দূরে থাকুক, উদার আকাশ-তলে মুক্ত জাহ্নবীর শান্ত শীতল বায়ু সেবন পর্য্যন্ত তাঁহার ন্যায় অযোগ্যের অধিকার-বহির্ভূত ভাবিয়া কুটীরের এক কোণে

অপেক্ষাকৃত অন্ধকারতলে তিনি আত্মগোপন করিতেছিলেন। আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া ভূমিশয্যায় শয়ান ছিলেন—এবং মুদিত নেত্রে গত নিশীথের পাপদৃশ্য মানসচক্ষে দেখিতে দেখিতে এক একবার আপনার অধঃপাত কল্পনা করিয়া শিহরিয়া উঠিতে-ছিলেন। স্বামীজি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সেখানে দেখা দিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মহাপুরুষ বলিলেন, "জগদীশ, তোমার এ সব দুর্ভোগ সকলই আমি পূর্ব্বাহ্নে জানিতাম। আজ তোমার গৃহিণীর মৃত্যু হইল। একবার তাঁহার চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া তুমি আমার শিষ্যত্ব স্বীকার করিবে চল। আজি হইতে তোমার নবজীবন লাভ হইবে।" জগদীশের মনে ঘোর বিপ্লব ঘটিতেছিল, গৃহিণীর মৃত্যুসম্বাদ নীরবে শুনিলেন। নীরবে স্থিরচিত্তে সন্ধ্যার পর মহাপুরুষের অনুগমন করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশীর রাত্রি—জাহ্নবী-তীরে সর্ব্বত্র ঘোর অন্ধকার—জগৎ সংসার কেবল অন্ধকারমাত্রাত্মক বলিয়া মনে হইতেছিল। উর্দ্ধে চাহিলে নক্ষত্ররাজির স্নিগ্ধ আলোক দেখা যায়—মহাপুরুষ বার বার তাহাই দেখিতেছিলেন, কিন্তু জগদীশের সে দিকে চক্ষু ফিরাইতে সাহস হইতেছিল না। হঠাৎ তিনি একবার চাহিয়া আবার চক্ষু নত করিলেন—যেন সেই সব দেবচক্ষু তাঁহার হৃদয়ের পাপ তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন! দূরে শ্মশানে শৃগাল কুক্কুরের সেই নিশীথ রব বড় ভয়ানক শুনাইতেছিল। শেষে মধ্যাহ্ন রাত্রি উত্তীর্ণ হইলে উভয়ে কল্যাণপুরের শ্মশানে পৌঁছিলেন।

শ্মশানপ্রান্তে একমাত্র চিতা সদ্য দাহকার্য্যের পরিচয়

দিতেছিল—কোথাও অর্দ্ধদগ্ধ বংশখণ্ড এখনও ধূমোদ্গার করিতেছিল, কোথাও নির্ব্বাণোন্মুখ অঙ্গার ভস্মাবরণ হইতেও ঈষৎ লোহিত আভা লুকাইতে পারিতেছিল না। দুইটা শৃগাল নিকটে বসিয়া অস্থি চর্ব্বণ করিতেছিল—মনুষ্য-সমাগমের শব্দে একটু দূরে গিয়া বসিল। ভাগীরথীর কুল কুল রবের বিরাম নাই—আকাশের অস্ফুট প্রতিবিম্ব তাঁহার বুকে পড়িয়াছে। চাহিয়া চাহিয়া জগদীশ চক্ষু মুদিলেন—সে আঁধারের শোভা তাহার সহ্য হইল না।

সন্ন্যাসী ডাকিলেন "বৎস জগদীশ—এই তোমার গৃহিণীর চিতা, এইখানে আজ তোমার পাপের অনলে নিরপরাধিনী সাধ্বী বালিকা চিতাভস্মে পরিণত হইয়াছে!" কি কঠোর কণ্ঠ! মহাপুরুষের কি এই কণ্ঠ? না যমদূত মহাপুরুষবেশে জগদীশকে নরককুণ্ডে ফেলিয়া ভৎসনা করিতেছে! দিগদিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইল—সে কণ্ঠ জগদীশের মর্ম্মে মর্ম্মে বাজিয়া উঠিল! তখন তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

যখন জ্ঞান হইল, তখন জগদীশ দেখিলেন, তাহার মস্তক মহাপুরুষের অঙ্কে—মহাপুরুষ সান্ত্বনা করিতেছিলেন, "ভয় কি আমি উদ্ধার করিব!" জগদীশের যেন আবছায়ার মত মনে হইতেছিল, "শত শত কৃষ্ণকায় ভীষণ সর্প অগ্নিশিখার মত জিহ্বা বাহির করিয়া তাহাকে দংশন করিতে আসিতেছে! ঐ দংশন করে—কে বাঁচাইবে!" জগদীশ সজ্ঞানে চীৎকার করিলেন—"রক্ষা কর, রক্ষা কর!" সর্পের নিশ্বাসে বিষম পূতিগন্ধের সঞ্চার হইতেছিল—নাসারন্ধ্রে তাহার দারুণ জ্বালা বোধ হইতে লাগিল, আর সেই সর্পজিহ্বার শিখায় চক্ষু দগ্ধ হইতেছিল—সর্ব্বেন্দ্রিয় কেবল যন্ত্রণামাত্রাত্মক। জগদীশ কাতর কণ্ঠে চিৎকার করিতে লাগিলেন—"কে আছ রক্ষা কর, রক্ষা কর। এ যে নরক।—রক্ষা কর, রক্ষা কর!"

তখন মহাপুরুষ আবার ডাকিলেন—“বৎস, চাহিয়া দেখ—ভয় কি? ঐ দেখ জগদম্বা তোমায় অভয় দিতেছেন!” এ কি সন্ন্যাসীর কণ্ঠ? বড় মধুর বড় স্নিগ্ধকর! জগদীশ চাহিয়া দেখিলেন সেই ঘোর অন্ধকারে কিসের জ্যোতি ফুটিয়াছে! নীলাকাশতলে সিংহ-বাহিনী অভয়ামূর্ত্তি, তাঁহাকে অভয় দিতেছেন—“ভয় নাই!” জগদীশ না নাস্তিক, ঐশ্বরিক লীলায় আস্থাশূন্য জ্ঞানসর্ব্বস্ব দার্শনিক! তাঁহার মত পাপীর উপরেও দয়া! তখন তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল—কাঁদিয়া বলিলেন “এস মা পাপী সন্তানকে কোলে কর। তুমি দুর্জ্ঞেয় অনন্ত শক্তি, আজ জননী-মূর্ত্তিতে দেখা দিলে!” হৃদয়ে কোথা হইতে অজেয় বলের সঞ্চার হইল,—জগদীশ উঠিয়া বসিয়া মহাপুরুষের পদযুগল আলিঙ্গন করিলেন। সেই মাহেন্দ্রক্ষণে সন্ন্যাসী জগদীশকে শক্তিধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন!

দুই বৎসর ক্রমাগত মহাপুরুষের সহবাসে জগদীশ দিব্য জ্ঞান লাভ করিলেন—তাহার নবজীবন হইল। গুরুদেব জগদীশকে সর্ব্বদা বলিতেন “পণ্ডিত, তোমায় দীক্ষিত করিব, ইহা আমার অনেক দিনের বাসনা। কল্যাণপুরে তোমায় দেখিতেই আমি গিয়াছিলাম। মূর্খ অর্ব্বাচীনদের হাতে পড়িয়া মহামহোপাধ্যায় ভক্তদের কীর্ত্তিসকল লোপ পাইতে বসিয়াছে,—দেশের ধর্ম্মমাত্রেই বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। তোমার মত জ্ঞানী ভক্তেরই এখন প্রয়োজন।” দুই বৎসরে অনেক শিক্ষা দিয়া গুরুদেব জগদীশকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। কোথায় গিয়াছিলেন, কেহ জানে না। বিদায় কালে জগদীশকে বলিয়াছিলেন, “যদি কখন আধ্যাত্মিক বিপদে পড়—স্মরণ করিও, দেখা দিব। ইচ্ছা হইলে নিজেই দেখা দিব।”

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শক্তিকাননের এই সন্ন্যাসী—সেই জগদীশ শর্ম্মা। আর সেই মাতৃহীনা কন্যা—প্রভাবতী। নাস্তিক দার্শনিক আজ তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। কখন কার কি হয় বলা যায় না জীবনে তাঁর সত্যসত্যই গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

মন্দির হইতে বাহির হইয়াই সন্ন্যাসী দেখিলেন, সম্মুখে জগন্নাথ আচার্য্য। তিনিও ইহাই আশা করিয়াছিলেন। মূর্চ্ছিতাবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া সন্ন্যাসীর যে ভাবান্তর হইয়াছিল, পাঠক তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। অতএব এখন আর তিনি বেশী অভিভূত হইলেন না। তবে চারি চক্ষে মিলন হইলে ভূতপূর্ব্ব দৌর্ব্বল্যের স্মৃতি আবছায়ার মত মনের উপর দিয়া এক বার চলিয়া গেল। বিদ্যুতের মত তাহা ক্ষণিক, ততোধিক যন্ত্রণাকর। হীনতা জ্ঞানে জগদীশের ওষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল। জগন্নাথের কিন্তু এই সবে প্রথম সাক্ষাৎ—কণ্ঠস্বরে চিনিয়াও তিনি এতক্ষণ প্রতীতি লাভ করিতে পারেন নাই। কৌতূহলের বেগ সামলাইতে না পারিয়া তিনি দ্বারে আঘাত করিলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই ভয়ে শরীর ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল। সাত বৎসরে জগদীশের কত পরিবর্ত্তন! শুধু মনের কথা বলিতেছি না। দীর্ঘ জটাজুট এবং দীর্ঘতর শ্মশ্রু-রাজিতে মুখমণ্ডল আবৃত—হঠাৎ চিনিয়া উঠা সহজ নহে। চক্ষে চক্ষে মিলন হইলে প্রথম মুহূর্ত্তে জগন্নাথের মনে হইল, তাঁহার ভ্রম হইয়াছে—কোন্ কাপালিককে তিনি মিছামিছি ঘাঁটাইয়া বিপদের উপর বিপদ আনিয়াছেন—কাজটা বড় গর্হিত হইয়াছে। এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সঙ্কুচিত ভাবে কিঞ্চিৎ পিছু হটিয়া আসিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী ছাড়িল না—বিষাদের হাসি হাসিয়া আগ্রহে তাঁহার হাত ধরিল। তখন আর ভ্রম রহিল না।

অনেক ক্ষণ কাহারও বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। সন্ন্যাসী নীরবে নরক-যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিলেন—সেই নিশীথ শোণিত-তরঙ্গ তাঁহার মানস-নেত্রে ভাসিতেছিল। হায় স্মৃতি—তোমার কি লোপ হয় না? জগন্নাথও সেই রাত্রির কথা ভাবিতেছিলেন। সন্ন্যাসী প্রথমে কথা কহিলেন,—

"জগন্নাথ, ভাবিয়াছিলাম এ জন্মে আর সাক্ষাৎ হইবে না।—আমার অপরাধ আজও কি ভুলিতে পার নাই?"

জগন্নাথ কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি নীরবে জগদীশকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। সন্ন্যাসী ইহা আশা করেন নাই।

তখন ভবানী-মন্দিরের সোপানশ্রেণীর উপর বসিয়া বসিয়া উভয়ে সাত বৎসরের কত কথা কহিলেন। জগন্নাথের বলিবার বেশী কিছু ছিল না। তাঁহার শান্ত গৃহস্থের জীবন, এক ঘেয়ে মৃদু প্রবাহ—সাত বৎসরে নূতন কিছু হয় নাই। তবে হরির কৃপায় ভক্তিতে দিন দিন আনন্দ বাড়িতেছে। পরম ভক্ত গোস্বামী এই বলিয়া চক্ষু মুছিলেন।

স্বীয় জীবনের কথা শেষ করিয়া জগদীশ বলিলেন "জগন্নাথ, গুরুদেবের বিরহ যে সহ্য করিতে পারিব, ইহা বিদায় কালে ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই। পুনর্জ্জন্মে আবার বিরহ আছে, তা ত জানিতাম না। যাহা হউক, তাঁহার সংসর্গহীন হইয়া সময়ে সময়ে পাপের প্রলোভনে পড়িতাম, কিন্তু গুরুদেব এখন আমার প্রকৃত পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন। সংযম এখন অভ্যস্ত হইয়াছে। এখন যাতনা কেবল স্মৃতির জন্য—পূর্ব্ব স্মৃতি লোপ হয় না কেন? ক্রমে এই শক্তি-কাননে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ইহার যিনি অধীশ্বর, তিনি কয় বৎসর সর্ব্বদা আমায় কাছে কাছে রাখিতেন—আমার নিকট মহাপুরুষ দত্ত বিদ্যার কিছু কিছু তিনি শিখিতে পারিয়া-

ছিলেন। মৃত্যুকালে নিজ কীর্ত্তিসমূহের ভার আমায় দিয়া গিয়াছেন। সংসার-বন্ধন ছাড়িয়াছিলাম, আবার নূতন বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছি।”

জগদীশ তার পর স্মিতমুখে জগন্নাথের দিকে চাহিলেন, সে মুখে চিন্তার ছায়া পড়িতেছিল। সন্ন্যাসী কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আমার কাহিনী শুনিয়া তুমি বড় অন্যমনস্ক হইয়াছ দেখিতেছি। কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি?”

গোস্বামী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, “জিজ্ঞাস্য কিছু ছিল, কিন্তু কাজ নাই। আজ তুমি তান্ত্রিক সন্ন্যাসী, আমি ক্ষুদ্র বৈষ্ণব মাত্র। শাক্ত বৈষ্ণবে কবে মিলিয়াছে?”

জগদীশ উচ্চ হাস্য করিলেন—পরে উত্তর করিলেন—“আজ বুঝি জীবনে সর্ব্বপ্রথম এই তুমি প্রবঞ্চনা করিতেছ। আমি জানি তুমি চিরদিন পরম ভক্ত—কাহারও ধর্ম্মবিশ্বাসের নিন্দা করিয়া তুমি মর্ম্মপীড়া দাও না। আমার নাস্তিকতারও তুমি কখন নিন্দা কর নাই। কিন্তু ইহা তোমার জানা উচিত যে আমি অন্ধ কাপালিক নহি। আমায় অবাধে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে পার।”

জগ। তুমি অত বড় পণ্ডিত, ধর্ম্মই যদি শেষে অবলম্বন করিলে তবে তন্ত্রের ধর্ম্ম কেন? এমন প্রেমের পন্থা থাকিতে শক্তিভাব কি জন্য? কেন সে সব অনাচার, জীবহত্যা?

জগদীশ। অনাচার জীবহত্যা—মূর্খ উপাসকের কাজ। প্রকৃত তন্ত্রশাস্ত্র সে সবের সহায় নহে। কতকগুলা অর্ব্বাচীন শাস্ত্রটাকে ছারখার করিয়াছে। আমার ব্যাখ্যা শুনিয়া বিচার কর।

জগ। রক্ষা কর ভাই! তুমি পণ্ডিত, নানা রকমে আমায় বুঝাইতে পারিবে। কিন্তু আমি সার বুঝিয়াছি, ভক্তি ভিন্ন মুক্তি নাই। তোমার তর্ক-যুক্তি আঁধার বাড়ায় মাত্র—কমাইতে পারে না।

জগদীশ। কেন, তোমার শাস্ত্রেও ত জ্ঞানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত

হয়েছে। জ্ঞানমূলা ভক্তি, তোমাদের একটি শ্রেষ্ঠ সাধন। তবে তর্ক-যুক্তির দোষ দাও কেন?

জগ। যাই বল—ভক্তিই সব। মহাপ্রভু কি জ্ঞানহীন ছিলেন? তিনি জ্ঞান ছাড়িয়া শুধু ভক্তি সার করিয়াছিলেন কেন?

জগদীশ। ভাল, যুক্তিতে কাজ নাই। একটা লৌকিক কথা বলি। ধর্ম্ম কি শুধু পরলোকের জন্য, ইহলোকের জন্য নয়?

জগ। ধর্ম্ম ভিন্ন এক দণ্ড আমরা তিষ্ঠিতে পারি না। সদাই হরি স্মরণ করিতে হবে।

জগদীশ। বেশ কথা। তবে ধর্ম্ম ইহকালের জন্য এবং ধর্ম্ম পরকালের জন্য। কিন্তু তোমার বৈষ্ণবধর্ম্ম ইহকালের ভাবনা ভাবে না। যে বৈরাগী, সংসার তাহার নহে।

জগ। আমিও ত' বৈরাগী—সংসারী নই কি?

জগদীশ। তোমার মত সংসারী কয় জন? বৈষ্ণব বলিলেই বুঝায়, সংসার-বিরাগী, কৌপীনধারী। যে চৈতন্যদেব তোমাদের আদর্শ, তিনি শোকাতুরা বৃদ্ধা মাতা, যুবতী ভার্য্যা ছাড়িয়া কঠোর সন্ন্যাস সার করিলেন। আর কি রক্ষা আছে? তাঁর ভক্তদের মধ্যে বৈরাগ্য রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে দারিদ্র এ সংসারের সর্ব্ব প্রধান বিপত্তি, তাই তোমরা ডাকিয়া আলিঙ্গন কর। এই কয় বৎসর ক্রমাগত বাঙ্গালা মুল্লুক ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমার ধারণা হইয়াছে, বাঙ্গালীর প্রধান দুঃখ অন্ন-বস্ত্রের। যার পেট পুরিয়া খাইবার সংস্থান নাই, সে অন্য ভাবনা ভাবিবে কখন? রোজ রোজ অকাল। তার উপর তোমাদের এই শিক্ষায় সোণায় সোহাগা হইতেছে—হায় মা ভবানি!

জগন্নাথ উত্তর করিলেন না। জগদীশ পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন "ভাই জগন্নাথ, আমি ধর্ম্মদ্বেষী নিন্দুক নহি। কোন ধর্ম্মের উপর

আমার এখন বিতৃষ্ণা নাই। তোমার প্রেম-ধর্ম্মের যাহা মর্ম্ম, তাহার আমি বিরোধী নহি। কিন্তু আমি বলি কি, যে পাপ দেশশুদ্ধ গ্রাস করিতে বসিয়াছে, তোমরা তাহার সহায়তা করিতেছ। তন্ত্রশাস্ত্র আর যাই হোক্, দারিদ্র পাপের সহায় নহে। ধন-সঞ্চয়ের নাম শক্তি-সঞ্চয়—সামাজিকের তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। না করিলে অধর্ম্ম হয়।

জগ। তবে তুমি সংসার ছাড়িয়া এ সাত বছর সন্ন্যাসী হইয়া বেড়াইলে কেন?

জগদীশ। কি না তুমি জান? আমার সন্ন্যাস ঘটনা-স্রোতের অনিবার্য্য ফল। কিন্তু আমার মত সন্ন্যাসী চাই। সন্ন্যাস নহিলে চলে না। নির্লিপ্ত হইয়া শিক্ষা না দিলে শিক্ষার ফল হয় না। আমার গুরুদেবের আদেশ এই যে কখন আপনা লইয়া থাকিও না। এ সাত বৎসর আমার জীবনের ব্রতই পরার্থ—বাক্যে হউক, কার্য্যে হউক, পরের দুঃখ দুর করাই এখন আমার ব্রত। তোমার বৈরাগ্য কি এমনই সন্ন্যাস?

ভক্তিতে ভাবুকতা আসে। জগন্নাথ জগদীশের ধর্ম্ম-ব্যাখা প্রশংসমান চক্ষে শুনিতেছিলেন। জগদীশ গভীর শাস্ত্র জ্ঞানে ভক্তি মিশাইয়া তাঁহাকে মোহিত করিতেছিলেন। মূর্খ তান্ত্রিক তাহা পারিত কি? গোঁড়ামি আমার বোধ হয় নির্জ্জলা মূর্খতার ফল। ধর্ম্মকে যদি প্রকৃত "শান্তিবারি" করিতে চাও, তবে জ্ঞানের সঙ্গে গাঁথিয়া দিও। জগন্নাথ তাহাই ভাবিতেছিলেন।

জগদীশ আবার বলিতে লাগিলেন—"বুঝিয়া দেখ, তন্ত্রের ধর্ম্ম ইহলোকের কেমন উপযোগী, বিশেষ আজ্ বাঙ্গালার পক্ষে। তোমরা দেবতার কাছে কিছু প্রার্থনা কর না—আমরা জগদম্বার কাছে আবদার করি—'মা ধনং দেহি মানং দেহি!' শুধুই কি আবদার

করি? তোমরা ভাব, আমাদের অনেক বুজরুকি আছে, কিছু হয় ত আছে—কোন্ ধর্ম্মে নাই? কিন্তু সব নয়। বুদ্ধিবলে মানুষ জড়ের রাজা। জড় প্রকৃতিকে উঠ বলিলে উঠিবে, বস বলিলে বসিবে, তবে সেই রাজ্য সার্থক। আমরা সেই চেষ্টা করি। আমাদের যোগের মানে তাই!"

এই কথোপকথন আরও কিছুক্ষণ চলিত বোধ হয়—কিন্তু এমন সময় ভৈরব আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তিন জনে ভবানী-মন্দির ত্যাগ করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

হরিদাস সেই বৃক্ষতলে বসিয়া প্রাণ হাতে করিয়া হরিনাম করিতেছিল। পলাইবার উপায় নাই—উপায় থাকিলেও তাহার সে প্রবৃত্তি নাই। প্রভু যদি না ফিরিলেন, তবে আর গৃহে গিয়া ফল কি? হরি স্থির করিল, কপালে যাহাই থাক, রাত্রি প্রভাত না হইলে সে বৃক্ষতল হইতে উঠা হইবে না। সূর্য্য উঠিলে পরিখার ধারে সে অগ্নিস্তূপ অবশ্য নিবিয়া যাইবে। না নিবিলেও দিবালোকে ব্যাপারখানা কি বুঝা যাইবে। প্রথমে এত সাহস হয় নাই, কিন্তু অন্তিম বিপদ মনে করিয়া হরি "মরিয়া" হইল। সে স্থির করিল, প্রভাতে যদি প্রভুর সম্বাদ না পাওয়া যায়, তবে যেমন করিয়াই হউক, সে ভূতের দেশে প্রবেশ করিতে হইবে। প্রাণ যায়, ক্ষতি নাই।

হরি বরাবর সেই আলোকরাশির উপর নজর রাখিয়াছিল—কেহ ইন্ধন না দিলেও বরাবর সে অগ্নি সমান ভাবে জ্বলিতেছিল, ইহা সে দেখিতেছিল। অতএব সেটা যে ভূতের দেশ, সেই সন্ন্যাসী

যে ভূতের মায়াবী অনুচর, সে বিষয়ে হরিদাসের অল্প সন্দেহ রহিল। বিশেষ সে কটাক্ষ এবং সেই অমানুষী বল তাহার মনে জাগিতেছিল! হরি ভাবিতেছিল, ঠাকুরকে যদি আবার ফিরিয়া পাওয়া যায়, তবে অনেক পুণ্যের ফল। কিন্তু সে ভরসা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। এমন সময়ে সেই আলোক-রাশি হঠাৎ নিবিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘতর মনুষ্য-মূর্ত্তি—হাত পা ওয়ালা তালগাছ—তাহার দৃষ্টি পথে পড়িল। হরি কাঁপিতে কাঁপিতে ঠিক্ করিল, এই বার তাহার পালা। প্রভুকে মারিয়া ফেলিয়া ভূতেরা এখন তাহার অনুসন্ধানে চর পাঠাইয়াছে। হরি চক্ষু বুজিয়া হরিনাম করিতে লাগিল—তাকাইতে আর সাহস হয় না। বিপদে কাহারও কাহারও আধ্যাত্মিক বল বাড়ে। হরির তাহাই হইল। সে মানস-চক্ষে দেখিল শূন্য পথে দিব্য জ্যোতি নারায়ণ সহাস্য বদনে তাহাকে অভয় দিতেছেন। সেই চাঁদ সহস্র গুণ সুন্দর হইয়াছে, সে কৌমুদী সহস্র গুণ শুভ্রতর শীতলতর রশ্মিতে পরিণত হইয়াছে। হরির দিব্য চক্ষু খুলিয়া গেল। কি ছার বাহ্য জগতের সৌন্দর্য্য! সে চক্ষু যে লাভ করিয়াছে, বাহিরের চক্ষুতে তার প্রয়োজন কি?

এই ভাবে হরি কতক্ষণ ছিল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। হঠাৎ জগন্নাথের কণ্ঠস্বরে তাহার চেতনা হইল। চাহিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে বিস্মিত স্তম্ভিত হইল। দেখিল, বনপথের সেই জটাজূটধারী সন্ন্যাসী সে কঠোর ভাব ছাড়িয়া হাসিয়া হাসিয়া জগন্নাথের সঙ্গে কথা কহিতেছে—প্রভুও স্মিত মুখে তাহার উত্তর দিতেছেন। আর সেই জীবন্ত তালগাছটা, যে একটু আগে তাহাকে ভয় দেখাইতে গিয়াছিল—সেই ত বোধ হইতেছে—সে একটু অন্তরে দাঁড়াইয়া বিনীতভাবে উভয়ের কাথাবার্ত্তা শুনিতেছে। হরি সহসা আপন চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না—ভাবিল, এইমাত্র বিপদ-

স্বপ্নন হরিকে যেমন স্বপ্ন দেখিয়াছিল, ইহাও তেমনি স্বপ্ন। অতএব সে দুই চারি বার চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া চাহিয়া দেখিল—তথাপি ভ্রম দূর হইল না। তখন হরিদাস দাঁড়াইয়া উঠিল।

জগন্নাথ হাসিয়া বলিলেন, "হরি! এত সাহস তোমার—আজ সব কোথায় গেল? সন্ন্যাসীর জটা দাড়ি দেখিয়া একেবারে অজ্ঞান হইয়াছিলে?"

জগদীশও হাসিলেন।—বলিলেন "যেমন গুরু তেমনি চেলা! তবু হরিকে সাহসী বলিতে হবে। গড়ের পারে সে গাছতলায় থাকিতে হইলে এতক্ষণে তুমি মারা পড়িতে।"

ভৈরব মুখ নত করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, আর হরিদাস অবাক হইয়া সকলের ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। গুরুদেবের কথায় উত্তর দিল না। অপরিচিত "বিকট মূর্ত্তি" শাক্তদের সঙ্গে প্রভুর এত ঘনিষ্ঠতা তাহার ভাল লাগিতেছিল না। একবার মনে হইল, বুঝি পরিচিত, কিন্তু তখনই হরি বিচার করিল যে, হইলই বা পরিচিত, বৈষ্ণব শাক্তের সঙ্গে অত মাখামাখি করিবে কেন? এমন সময় সন্ন্যাসী ভৈরবকে ডাকিয়া বলিলেন যে "হরিকে বিশ্রাম করাও—বড় ক্লান্ত হইয়াছে। কিছু খাইতে দাও।"

শুনিয়া হরিদাস ভাবিল "ও হরি! শাক্ত ব্যাটারা ফাঁকি দিয়ে আমায় প্রসাদ খাওয়াবে! প্রাণ থাকিতে তা হবে না। প্রভু গঙ্গাস্নান করিয়া শুদ্ধ না হলে তাঁহার প্রসাদ পর্য্যন্ত খাওয়া হবে না।"

এ দিকে সন্ন্যাসীর মুখের কথা খসিতে না খসিতে ভৈরব ফলমূল আনিয়া হাজির করিল। জগন্নাথ হরিদাসকে ইঙ্গিত করিলেন "খাও!" সে ইঙ্গিত আর কেহ বুঝিল না। জগন্নাথ জানিতেন, হরি তাহা স্পর্শও করিবে না। কিন্তু হরি ভৃঙ্গারের জলে হাত মুখ

প্রক্ষালন করিতে লাগিল। ইহা কেবল ভৈরবকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য। পুনরায় জল চাহিল। ভৈরব জল আনিতে গেলে সেই অবকাশে ফলমূলগুলি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। মনে জানিত, এখনও তাহাদের হাতে আছে। অন্যত্র হইলে স্পষ্টত "শাক্তের প্রসাদের" উপর ঘৃণা প্রকাশ করিতে তাহার আপত্তি ছিল না।

হরিদাসের জলযোগের উদ্যোগ দেখিয়া জগন্নাথ সন্ন্যাসীকে একটু দূরে লইয়া গেলেন এবং সেখানে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "এখন তবে আমাদিগকে বিদায় দাও। দোলযাত্রার আর মোটে চারিদিন মাত্র বাকী। আজ না গেলে সময়ে পৌঁছিতে পারিব না।"

জগদীশ বিমনা হইলেন। পরে উত্তর করিলেন—"আমি ভাবিতে-ছিলাম, দুই দিন তোমায় ছাড়িয়া দিব না। আজ তোমায় দেখিয়া বড় সুখ হইল। এ প্রত্যাশা আমি করি নাই। যখন বনপথে মূর্চ্ছিতাবস্থায় তোমায় দেখিয়াছিলাম, তখন ভাবিয়াছিলাম দেখা দিব না—কেননা পূর্ব্বস্মৃতিতে আমার বড় যন্ত্রণা, সে সব মনে হইলে হৃদয়ে আমার নরক জ্বলিয়া উঠে। সে স্মৃতিলোপ হয় না কেন? যে পশুত্ব আমায় নরকের পথে লইয়া গিয়াছিল, গুরুর কৃপায় তাহা হইতে ত মুক্ত হইয়াছি—তবু এ যাতনার অবসান হয় না কেন?"

কথা বলিতে সন্ন্যাসী বড় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, মুখের প্রসন্নভাব লোপ পাইল, চক্ষু কঠোর অথচ শূন্যদৃষ্টি ব্যঞ্জক হইল। এই মূর্ত্তিতে হরি বনপথে তাঁহাকে দেখিয়াছিল। জগন্নাথ ব্যথিত হইলেন। তবে ধর্ম্মও জগদীশকে সান্ত্বনা দিতে পারে নাই?

সন্ন্যাসী আপনা আপনি সংযত হইলেন। আবার অন্য মনে বলিতে লাগিলেন—"আজ এই সাত বৎসর ক্রমাগত মা ভবানীর

চরণে কামনা করিলাম—'মা শেষে অধম সন্তানকে উদ্ধারই যদি করিলে, তবে এ নরক-যাতনা দূর করিয়া দাও,—পাপ-স্মৃতি বিলুপ্ত কর!' কই যাতনা ত ঘুচিল না? কখনো কি ঘুচিবে না?” প্রতি কথায় দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছিল—প্রতি দীর্ঘশ্বাসে হৃদয়ের রক্ত যেন বাষ্পাকারে বাহির হইতেছিল। কি তীব্র অনুশোচনা! জগন্নাথ স্তম্ভিত হইলেন।

কিন্তু রাত্রি অধিক হইয়া উঠিল—জগন্নাথ দেখিলেন, এ ভাবে বিদায় গ্রহণ সহজ হইবে না। বিশেষ বিদায়ের পূর্ব্বে প্রভার সম্বন্ধে কয়টি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে হইবে। তখন তিনি আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন,—

“জগদীশ, এ অনুতাপ বড় যন্ত্রণাকর, কিন্তু শীঘ্রই তুমি শান্তি পাইবে। স্মৃতি লোপ হয় না—হইলে অনেক দুঃখ কমিত। এখনও তোমার জ্ঞানবল ভক্তিবলের চেয়ে বেশী। যত দিন উভয়ের সামঞ্জস্য না হইবে ততদিন বোধ হয় মাঝে মাঝে তোমার অনুশোচনা হইবে। চল গৃহে চল। আবার গৃহী হইলে ভক্তি বাড়িবে বই কমিবে না। মাতৃহীনা কন্যার মুখ দেখিলে গৃহিণীর প্রতি অবিচারের ক্ষালন হইবে। কন্যাস্নেহে ভক্তির বৃদ্ধি হইবে।”

জগন্নাথের কণ্ঠে এত আগ্রহ, এত সহৃদয়তা, যে সন্ন্যাসী মুগ্ধ হইলেন। কিছু ক্ষণের জন্য আত্ম-বিস্মৃত হইলেন। পরে বলিলেন, “জগন্নাথ সে অনুরোধ করিও না, গৃহে আর ফিরিব না। যে ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছি, যে ব্রত সার করিয়াছি, গৃহে-তাহা সিদ্ধ হইবে না। হইলে মহাপুরুষ সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে দিতেন না। গৃহে আর ফিরিব না।”

জগ। তবে সে নিরপরাধিনী কন্যার কি হইবে? তার কি

অপরাধ? তুমি পিতা আজও জীবিত—সে মাতৃহীনা দুঃখিনীর উপায় কি করিলে?

জগদীশ। তোমার কথা সকলই সত্য—কিন্তু মায়াজালে থাকিয়া কে কবে ব্রত সাধন করিতে পারিয়াছে? বুদ্ধদেবের কথা ভাবিয়া দেখ, তোমার চৈতন্যের কথা মনে কর। মা ভবানী আমার উপায় করিয়াছেন, তার উপায় কি করিবেন না? আমি পিতা জন্মদাতা মাত্র—তোমরাই স্ত্রী-পুরুষে তার প্রকৃত পিতা মাতা।

সন্ন্যাসী এমন স্থির অবিকম্পিত কণ্ঠে এই কথাগুলি উচ্চারিত করিলেন যে, জগন্নাথের তাহা প্রতিবাদ করিবার সাহস হইল না। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব হইয়া রহিলেন। জগন্নাথ আবার বলিলেন—

"তাহাই যদি তোমার স্থির সংকল্প, তবে একটা কথার উত্তর দাও। আমাদের সাধ, তোমার কন্যাকে পুত্রবধূ করিয়া জীবন সার্থক করিব। আজ তোমার দেখা না পাইলে তোমার মত লওয়া হইত না। দেখা যদি হইয়াছে, তবে অন্তত এ বিষয়ে তোমার মতামত দেওয়া উচিত।"

জগন্নাথ দেখিলেন, সহসা সন্ন্যাসীর মুখে বিষাদ-কালিমা ব্যাপ্ত হইল। কিন্তু পলকে তিনি আত্মসম্বরণ করিলেন। তখন উত্তর করিলেন—"ভবিতব্য কে খণ্ডাইবে? এখন বিবাহ দিও না। এ বিবাহ যদি হইবার হয়, সাত বৎসর পরে আপনিই হইবে।"

বিস্ময়ে জগন্নাথ সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সে দৃষ্টি অর্থপূর্ণ। বুঝিয়া জগদীশ বলিলেন—"বিধাতা যখন ভবিষ্যৎ জ্ঞান আমাদের পক্ষে রুদ্ধ করিয়াছেন, তখন চেষ্টা করিয়া তাঁহার অবাধ্য হওয়া মঙ্গলের কথা নহে। এ দুঃখের সংসারে ইচ্ছা করিয়া দুঃখ বৃদ্ধি করা আমাদের রোগ,—তাই জ্যোতিষের সৃষ্টি। মহাপুরুষ আমাকেও জ্যোতিষ শিখাইয়াছিলেন—কিন্তু অল্প মাত্র।

তোমার কৌতূহল নিবারণ করিতে পারি, এত জ্ঞান আমার নাই।"

আর বেশী কথা হইল না। সন্ন্যাসীর শেষ কথায় জগন্নাথ বড় বিষণ্ণ হইলেন—প্রায় নীরবে শক্তি-কানন হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। পরিখার পথে সেই আলোকরাশি জ্বলিতেছিল। ভৈরব পথ দেখাইয়া চলিল—তাহার হস্তান্দোলনে ক্ষণকালের জন্য অগ্নিস্তূপ নিভিয়া গেল। জগন্নাথ বড় অন্যমনস্ক—সে দিকে মন ছিল না। কিন্তু হরি সে দৃশ্যে বড় ভয় পাইল। চিরদিন সে কথা তার মনে ছিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অতি প্রত্যুষে নাপিতবৌ শয্যা ত্যাগ করিয়া ভয়ে ভয়ে মনিব বাড়ী চলিল। রোজ যেমন সকালে উঠে, আজ্ তার চেয়ে দুই দণ্ড আগে উঠিল—কাজ করিবার জন্য নহে, আজ্ কিছু মতলব ছিল। নাপিতবৌ জানিত, মৃণ্ময়ী ঠাকুরাণী দুচক্ষে তাহাকে দেখিতে পারেন না, সদাই ছিদ্রান্বেষণ করেন। কাজেই রাত্রের ব্যাপার সহজে মিটিবে বলিয়া তাহার ভরসা হইল না। সে বুদ্ধ খাটাইয়া স্থির করিল, পিসি ঠাকুরাণী উঠিতে না উঠিতে বউ ঠাকুরাণীর সঙ্গে একবার দেখা করিতে হইবে। প্যানপ্যানে মিনমিনে বউটা যে তাহার হইয়া ননদকে দুটো কথা বলিবে, সে দুরাশা তাহার হইল না—তবে তার একটু মায়া দয়া আছে, যদিই কোন উপায় করিতে পারে। নাপিতবৌ সেই ক্ষীণ আশায় বুক বাঁধিয়া ভয়ে ভয়ে চলিল। নিজের বুদ্ধি-কৌশলের উপর তার অগাধ বিশ্বাস—অতএব সে ভয়ের মধ্যেও সাহসের অভাব ছিল না।

পথে কাহারও সঙ্গে দেখা হইল না। কেবল পাখীরা গাছে গাছে

কলরব করিতেছিল—আর কোথাও নিশাচর শৃগাল প্রভাতালোকের ভয়ে চোরের মত লুকাইয়া লুকাইয়া পলাইতেছিল। প্রভাত সমীরণ আদর করিয়া সকলেরই পরিচর্য্যা করিতেছিল। গাছের ফুল পত্র হইতে প্রান্তরের তৃণগাছটী পর্য্যন্ত সে মৃদু হিল্লোলের স্পর্শসুখে স্পন্দিত হইতেছিল। কোথাও গাছের ঝোপ হইতে অলক্ষ্যে দইয়ালের স্বরলহরী উঠিতেছিল—নব বসন্তের সোণার কচি পাতা সে আঁধারে গাঢ় সবুজ বলিয়া ভ্রম হইতেছিল। দেখিতে দেখিতে নাপিতবৌ আচার্য্য ঠাকুরের বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। বকুল গাছে কোকিল গায়িতেছিল—কু—উ! আর ফলহরি সর্দ্দার তাহারই সম্মুখে বৈঠকখানার বারান্দায় আলু থালু বেশে নিদ্রা যাইতেছিল। দেখিয়া নাপিতবৌ চক্ষু ফিরাইল এবং সর্দ্দারের পোকে মনে মনে যমের বাড়ী পাঠাইয়া দিল। তখন অশুভ আশঙ্কায় ভীত হইয়া সাবধানে একেবারে খিড়কীর ঘাটে গেল।

তখনও কেহ ঘাটে এসে নাই। অতএব কিছুক্ষণ নাপিতবৌকে আশার উৎকণ্ঠায় কাটাইতে হইল—একবার ভাবিল, সেই অবকাশে দুই চারিটা সামান্য কাজ সারিয়া ফেলিবে, চুপ করিয়া চোরের মত বসিয়া থাকা ভাল হইতেছে না। বউ-ঠাকুরাণী আগে উঠিবে ইহা নিশ্চয়। কাজ করিতে করিতে দেখা হয়, সে আরো ভাল! কিন্তু তাহার আবশ্যক হইল না। একটু পরেই বাসন হাতে আধহাত ঘোমটা টানিয়া বধূ ঠাকুরাণী দেখা দিলেন। নাপিতবৌকে দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইলেন- দুই চারিবার ঢোক গিলিয়া বলিলেন,— "তা এয়েছ বেশ করেছ! আমি ভেবেছিলাম আজ্ যদি না এস, তবে লোক পাঠাইয়া সম্বাদ নেব।"

নাপিতবৌর চক্ষে অমনি কোথা হইতে জলের স্রোত ছুটিল। চক্ষু মুছিতে মুছিতে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল—

"না এসে কি করি মা! তোমরা হ'লে মনিব, মারলে মারতে পার, রাখ্‌লে রাখ্‌তে পার। পিসিমা যে কেন আমাকে দেখ্‌তে পারেন না, তা ত বল্‌তে পারিনে।"

হৈম এ কথায় উত্তর করিলেন না—একবার ভাবিলেন, জিজ্ঞাসা করিবেন, কাল কেন প্রভাকে অমন করিয়া কাঁদাইয়াছিল—কাজটা ভাল হয় নাই। কিন্তু বড় লজ্জা করিতে লাগিল। নাপিতবৌ আবার বলিল,

"এখনও ত পিসিমা উঠেননি—উঠলে আমার কি সুমুখে থাকা উচিত? তুমি কি বল মা?"

হৈম নাপিতবৌর মুখের দিকে চাহিতে পারিতেছিলেন না—চক্ষু নত করিয়া বলিলেন—"আমিও তাই ভাবচি।"

নাপিতবৌ নতনয়না হৈমবতীর প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিল, আবার বলিল,

"তুমি কেন ননদকে একবার বুঝিয়ে বল না মা! তোমারি হলো ঘর সংসার—তুমিই ত আসল গিন্নি। তোমার কথা তিনি ঠেলিতে পারিবেন না।"

হৈম লজ্জায় জিভ কাটিলেন এবং ভীত হইয়া চারি দিক চাহিয়া দেখিলেন। তখন একটু দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—

"অমন কথা বলো না নাপিতবৌ—ছি!— আমি তাঁকে কিছু বলিতে পারিব না।" কিন্তু দৃঢ়তা মুমূর্ত্ত মাত্রের জন্য। পরক্ষণেই বড় চক্ষু-লজ্জা হইল। কি জানি বেচারি যদি মনে কষ্ট পেয়ে থাকে!

নিরুপায় দেখিয়া নাপিতবৌ আবার চক্ষুর ফোয়ারা খুলিয়া দিল। হৈমর বড় কষ্ট হইতে লাগিল,—কিন্তু তিনি কি করিবেন? ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "নাপিতবৌ, আমার একটা কথা শুন। আজ্

ঠাকুরঝিকে দেখা দিও না। এ দু'দিন বাড়ীতেই থাকিও। সোহাগীকে লুকাইয়া পাঠাইয়া দিও—তোমায় প্রসাদ দিব। তার পর তিনি আসুন!"

আহ্লাদে নাপিতবৌ চক্ষুর জল মুছিল। আধ হাসি মুখে উৎসাহে বলিল—"তবে মা! আমার জন্য তুমি তাঁকে বলিবে?" হৈম ঘাড় নাড়িল—"আমি বলিতে পারিব না, তুমিই তাঁকে বলিও। তিনি ঠাকুরঝিকে বুঝিয়ে বলিবেন।" নাপিতবৌ অনেক অনুনয়, অনেক অনুরোধ করিল, কিন্তু কিছুতেই বধূ ঠাকুরাণীকে সে কথায় রাজি করিতে পারিল না। তখন ম্লান মুখে সেই পরামর্শই ঠিক্ করিয়া বিদায় হইল। তখনও আর সকলে নিদ্রিত, অতএব অলক্ষ্যে এই মানব-শৃগালী বাটীর বাহির হইয়া গেল।

নাপিতবৌ যখন বাড়ী পৌঁছিল, সোহাগীর মা আর সোহাগী তখন উঠিয়া পাট করিতেছিল। সোহাগীর মা দেখিয়া বলিল—"কি লা বউ, এত সকালে যে বড় ফিরে এলি?" মনে বড় আনন্দ, বুঝি কিছু হয়েছে! নাপিতবৌ মুখ হাত নাড়িয়া উত্তর দিল—"গতর দিয়েই ত সব দিদি! শরীরটে রাত থেকে খারাপ হয়েছে, তাই মনিব বাড়ী বলে এলাম।" সোহাগীর মা আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। নাপিতবৌ তখন আপন ঘরে গিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া আবার শয়ন করিল। মাতার শিক্ষামত একটু পরে দ্বারের ছিদ্র দিয়া সোহাগী দেখিয়া আসিল, খুড়ি কি আহারে বসিয়া গিয়াছে!

যথা সময়ে মৃণ্ময়ী ঠাকুরাণী শয্যাত্যাগ করিলেন। তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই—তবে উঠিতেও আর দেরী নাই। পূর্ব্ব গগনের রক্তিমচ্ছায়া গঙ্গার প্রশান্ত বক্ষে পড়িয়াছে—নাবিকেরা নৌকা বাহিয়া ললিত রাগিণী ভাঁজিতে ভাঁজিতে মহানন্দে চলিয়াছে। প্রত্যহ শয্যা

ত্যাগ করিয়াই মৃণ্ময়ী গঙ্গাদর্শন করিতেন—আজ গঙ্গাদর্শনান্তে ছাদ হইতে বাটীর আঙ্গিনায় তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তখনও কেহ পাট করিতে আসে নাই,—মাটীর ঘর সব বাসি পড়িয়া আছে। দেখিয়াই তাঁর নাপিতবৌকে মনে পড়িয়া গেল। অমনি দ্রুতপদে নীচে আসিলেন। লোকনাথ ও প্রভা সঙ্গে সঙ্গে আসিল।

তখনই ফলহরি সর্দ্দারের তলব হইল। সর্দ্দার এই মাত্র বিছানা তুলিয়া লাঠি হাতে প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছিল, অমনি ডাক পড়িল। এ দিকে প্রাতঃকৃত্যের জোর তলব, ও দিকে পিসি ঠাকুরাণীর জরুরি তলব—ফলহরি একটু বিপদগ্রস্ত হইয়াই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। মৃণ্ময়ী ঠাকুরাণীর রাগ তখন সবে মাত্র চড়িয়া উঠিতেছে—অতএব প্রথমেই সর্দ্দারের উপর সকল কোপ পড়িয়া গেল। মৃণ্ময়ী গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"মেয়ে মানুষ বলে আমাদিকে তোর গেরাহ্যিই হয় না, কেমন রে ফেলা?"

ফ্যালা। (করযোড়ে) আজ্ঞে না পিসি ঠাকৃরুণ,—এমনও কথা? ঠাকুরের চেয়ে তোমায় বেশী ভয় করি!

পিসি ঠাকুরাণী একটু নরম হইলেন, বলিলেন "তুই রাত্রেই সে পোড়ারমুখীকে ডাকিয়া আনিস্ নাই কেন?"

আর কেহ হইলে পিসি ঠাকুরাণীর রাগ নিবৃত্তি করিবার জন্য হয় ত একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া উত্তর দিত, কিন্তু ফলহরি সোজা পথটাই ভাল বুঝিত। সে নাপিতবৌর সকল কথা বলিয়া শেষে সব দোষটুকু নিজের উপর লইল। বলিল—"তুমি রাগ কর আর যাই কর, বুড় মানুষ, অত রাত্রে ঘুম্ ফেলে কি আর তোমায় খপর দিতে পারি গো পিসি ঠাকৃরুণ?—আর তাতে হ'তই বা কি?"

পিসি ঠাকুরাণী একেবারে জল হইয়া গেলেন—একটু ভাবিয়া বলিলেন, "সে পোড়ারমুখী ত আজও আসেনি—সত্যি অসুখই তবে

করেছে, আর তারে কাজও নেই। ফলহরি, তুই এখনই হরিদাসের বৌকে ডেকে দিস্ ত!”

ফলহরি আবার করযোড় করিল। —“ঐটি মাপ করগো পিসি ঠাকৃরুণ! হরির মা কোন পুরুষ মানুষ বাড়ী যাওয়া দেখিতে পারে না। বুড়ী বড় গাল দেয়। আমার কচি কাচার সংসার, গালকে বড় ভয় করে!”

তখন লোকনাথ হরিদাসের বাড়ী ছুটিল,—পিসিমা বারণ করিলেন, “তুই পাঠশালে যা, আর কেউ যাবে এখন।” কিন্তু ততক্ষণ লোক অর্দ্ধেক রাস্তা পার হইয়া গিয়াছে।

হরিদাসের বাড়ী একটু দূরে—গ্রামের প্রান্তরভাগে। পাঁচ বৎসর হইল সে গ্রামান্তর হইতে আসিয়া এখানে বাস করিয়াছে—কাজেই তার তিনখানি কুটীরই নূতন। জগন্নাথ আচার্য্য ইদানীং তাহাকে লইয়াই প্রবাসে যাইতেন, বাড়ীতে হরির বৃদ্ধা মাতা, যুবতী ভার্য্যা ভিন্ন আর কেহ ছিল না। অতএব তাহার প্রার্থনা মত তিনি তাহার বাড়ীর চারিদিকে প্রাচীর দেওয়াইয়া দিয়াছিলেন। তিনখানি ঘর ছাড়া হরির বাড়ীতে একটী মড়াই ছিল—আর পাকের ঘরের একধারে একটী গরু থাকিত। উঠানে একটী তুলসী গাছ, আর একটী শেফালিকার। উঠানটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বুড়ী স্বহস্তে কুটা-গাছটী পর্য্যন্ত তুলিয়া ফেলিত।

বুড়ী কিছু সন্দিগ্ধ চিত্ত—তার প্রধান দোষই তাই। সর্ব্বদা তাহার ভয়, পাছে পুত্রবধূ দুশ্চরিত্রা হয়, প্রতি কথায় এবং কার্য্যে সে ইহার পরিচয় দিত। পুরুষ মানুষ সে পথে কেহ আসিলে কিছু গালি তাহাকে অবশ্য উপার্জ্জন করিতে হইত। প্রতিবেশিনী কোন স্ত্রীলোক বধূর সঙ্গে বেশী আলাপ করিবে, ইহা পর্য্যন্ত বুড়ীর অসহ্য। হরি মাতাকে এরূপ দুর্ব্যবহার হইতে নিবৃত্ত করিবার অনেক চেষ্টা

করিয়াছিল, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। বধূ প্রথমে নীরবে সকল সহিয়া থাকিত। কতক স্বেচ্ছায়, কতক বা স্বামীর অনুরোধে অনেক দিন পর্য্যন্ত শাশুড়ীর কোন কথায় উত্তর দিত না। কিন্তু একটী ছেলে হইয়া নষ্ট হওয়ার পর তাহার সহিষ্ণুতা কিছু কমিয়া আসিয়াছিল—এখন আর বড় চুপ করিয়া থাকিতে পারিত না. নিতান্ত অসহ্য হইলে শাশুড়ীকে পাটকেলটী খাইতে হইত।

প্রাতে উঠিয়া বুড়ী চরকা কাটিতে বসিত এবং শতবার উঠিয়া উঠিয়া ঘাটের পথ দেখিয়া আসিত। হরির বউ জল আনিতে, বাসন মাজিতে যতবার ঘাটে যাইবে, ততবার বুড়ী চরকা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইবে। ভয়ে কোন প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত হরির বউর সঙ্গে কথা কহিতে সাহস করিত না—কে গালি খাইবে? তবে ইদানীং তাহারা আর বড় কিছু গ্রাহ্য করিত না—হরির বউও হাসিত, তাহারাও হাসিত। বুড়ী কিন্তু নিজ ব্রতে অচল অটল. হরি হাসিয়া বলিত, "মা! তোমার হরিনাম হয়েছে বউ!"

লোকনাথ যখন হরির বাড়ী পৌঁছিল, বউ তখন ঘাটে,—বুড়ী চরকা ছাড়িয়া বাড়ীর বাহিরে আসিয়াছে। বউ প্রতিবেশিনী অমলার সঙ্গে কথা কহিতেছিল—দুজনে বড় প্রণয়। অমলা বলিল—

"বউ লো বউ!"

বউ বলিল—"কেন লো!"

অ। তোর বর আজও এল না কেন লো?

বউ। (হাসিয়া) আমার না তোর?

অ। মর, রঙ্গ দেখ—ঐ দেখ্ তোর শাশুড়ী দাঁড়িয়ে!

বউ। মরুক—নতুন ত আর নয়! তোর বুঝি গালাগালির ভয় আজও যায় নি?

অ। ও গাল অঙ্গের ভূষণ! ও শুনলে আর তোর সঙ্গে চখো-

চোখি ধরা হয় না।—সত্যি বল না, তোর বরের কোন খবর পেয়েছিস্ ?

বউ। তোর যে দেখ্‌ছি বড় গরজ! (একটু ভাবিয়া) সত্যি কোন খবর পাইনি। আচার্য্য বাড়ীতেও আসেনি!

এমন সময়ে শাশুড়ী আসিয়া হাজির হইলেন। দুজনেই একটু অপ্রতিভ হইল। শাশুড়ী বলিল—"আবাগের বেটি, একটু শিগ্‌গির আয়! পাড়ার শতেকখোয়ারীরা হয়েচে যেমন—কেবল গল্প আর গল্প।"

বউ স্থির ভাবে বলিল—"মর্, ঘাটে আবার কেন ?" শাশুড়ীর এখন এ রকম উত্তর সহিয়া গিয়াছিল—পাটিকেল আর বড় লাগিত না। অতএব স্থুধু বলিল—"ছোট ঠাকুর এয়েছে তোকে ডাক্‌তে।"

জল রাখিয়া বউ গলায় আঁচল বেড়িয়া গুরুপুত্রকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, তারপর গুরু-বাড়ী চলিয়া গেল। হরির মা নিশ্চিন্ত মনে চরকা কাটিতে লাগিল। বধূ গুরুগৃহে গেলে তার কোন সন্দেহ থাকিত না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

গাড়োয়ান গরু ছাড়িয়া দিয়া আমগাছ তলায় গাড়ী রাখিল এবং গাড়ীর পিছন দিক্ হইতে বিচালি লইয়া গরু দুটাকে খাইতে দিল। সন্ন্যাসীর কটাক্ষ তাহার মনে জাগিতেছিল, অতএব পরীক্ষা করিয়া দেখিল, জিনিষপত্র সব ঠিক বাঁধা আছে কি না ? একবার মনে হইল যদি বাঘ আসে! কিন্তু রাত্রে সর্ব্বদা সে পথে গাড়ী চলে, বিশেষ, নিকটেই হেঁদুফকীরের আস্তানা, সে ভয় মনে বড় ঠাঁই দিল না। তাহার ধ্রুব বিশ্বাস যে হেঁদুফকীরের মহিমায় কোন বিপদ ঘটিবে না।

অতএব নিশ্চিন্ত হইয়া গাড়োয়ান গাড়ীর উপরে আসিয়া বসিল। মন্দ মন্দ বায়ু সংস্পর্শে আম্রশাখা ঈষৎ কাঁপিতেছিল—আর তাহারই অবকাশপথে চন্দ্রকররাশি গাড়োয়ানের মুখে ও বাহুতে পড়িয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছিল। মাঝে মাঝে মুকুল হইতে দুই চারিটী ফুল খসিয়া তাহার মাথায় ও দাড়ীতে নীরবে আশ্রয় লইতেছিল—মাথায় বেশীক্ষণ টিকিতে পারিতেছিল না, কিন্তু সেই ঘন কৃষ্ণ দীর্ঘ শ্মশ্রুরাজি তলে মৌরসী পাট্টা গ্রহণের যোগাড় করিতেছিল। এখনও কতক কতক মৌমাছি ভোমরার পাল মধুলোভে অন্ধ হইয়া মুকুল স্তূপে বিচরণ করিতেছিল,—কেহ বা গন্ধে ভোর হইয়া কেবল ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছিল। এ মাধবী কৌমুদী প্রফুল্ল নিশিতে তাহাদেরও যে রূপ রস গন্ধোন্মাদ জাগিয়া উঠিবে, ইহার আর বিচিত্র কি? কাজেই সব গাছটা ব্যাপিয়া মত্ততার একটা অস্ফুট মধুর ধ্বনি উঠিতেছিল। নিকটেই কাঁঠাল গাছে বউ-কথা-কও থাকিয়া থাকিয়া ডাকিতেছিল—"বউ কথা কও।" সেখের পো কৌতূহলী হইয়া কাঁঠালগাছের দিকে চাহিয়া চাহিয়া জ্যোৎস্নাপাতে তাহার পত্ররাশির চাকচিক্য লক্ষ্য করিতেছিল—ভাবিতেছিল,—'আচ্ছা, পাখীটা অত ডেকে ডেকে মরে কেন? সত্যই কি ওর বিবিটা কথা কয় না?" অমনি তাহার মনে সহধর্ম্মিণীর ও সাধারণত পুরুষজাতির উপর গৃহিণীকুলের নানা অত্যাচারের কথা ভাসিয়া উঠিল। প্রকৃতির সে মধুর শোভায় হৃদয় তার তরঙ্গিত হইতেছিল—মনুষ্যমাত্রেই সে শোভা উপভোগের অধিকারী। প্রভেদ কেবল মাত্রায়। অনুশীলনে শোভানুভাবকতা অধিকতর স্ফূর্ত্তিলাভ করে মাত্র।

অনেক ক্ষণ হইয়া গেল—তবু গুরু ঠাকুর বা বৈষ্ণবের ব্যাটার দেখা নাই। গাড়োয়ান একটু উৎকণ্ঠিত হইল—"তামাম রাত জেগে

কি পরের জিনিস আগ্‌লান যায় হে আল্লা ?" এই অবস্থায় তাহার তন্দ্রা আসিল, সে একটু গোলাপী রকমের স্বপ্ন দেখিল। দেখিল হেঁদু ফকীর মুরশীদাবাদের নবাবের দরবারে দাঁড়াইয়া নবাবের দিকে তীব্র কটাক্ষ করিতেছে, ভয়ে নবাব মসনদ ছাড়িয়া পলাইয়া গেলেন। মসনদে বসিয়াই ফকীর সে সব দাড়ি চুল ফেলিয়া দিয়া বহু মূল্য পোষাক পড়িল এবং গাড়োয়ানকে তলব দিল। দুই জন ঘোড়সওয়ার তখনই আসিয়া তাহার কুটীরে উপস্থিত—সে এই মাত্র বাড়ী আসিয়া তামাকু খাইতেছে। এমন সময়ে সওয়ার হাঁকিল—"গাড়োয়ান!"

গাড়োয়ান চক্ষু মেলিয়া দেখিল, সম্মুখে জগন্নাথ আচার্য্য—পাছে দাড়াইয়া হরিদাস। অমনি সে সসম্ভ্রমে উঠিয়া বসিল এবং গাড়ী হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিল।

জগন্নাথ গাড়োয়ানকে কিছু না বলিয়াই গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া শয়ন করিলেন। দুশ্চিন্তা এবং ক্লান্তি যুগপৎ তাঁহাকে অবসন্ন করিয়াছিল—কাহার ও সঙ্গে আলাপের প্রবৃত্তি এক্ষণে ছিল না। হরিদাস তত ক্লান্ত হয় নাই—দুশ্চিন্তারও তাহার কোন কারণ ছিল না। শক্তি-কাননের সেই সব ব্যাপার তাহার মানস নয়নাগ্রে ভাসিতেছিল। সে সব যে ভৌতিক নহে, ইহা সে তখনও প্রত্যয় করিতে পারিতেছিল না। আর অনাচারী শাক্তদের সঙ্গে তাহাদের আড্ডায় এতক্ষণ থাকিতে হইয়াছিল ভাবিয়া শরীরটা তাহার অশুচি বোধ হইতেছিল—কতক্ষণে গঙ্গাস্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে ইহাই তাহার প্রধান চিন্তা। যাহা হউক, সে আবার নিজ স্বভাব মত গাড়োয়ানের সঙ্গে হাসি তামাসা আরম্ভ করিয়া দিল এবং দুই চারি কথায় চাচার মনটা খুসি করিয়া এক ছিলিম তামাক সাজিতে বলিল। চাচা তামাকের দিকে মনোনিবেশ করিলে হরি অলক্ষ্যে গাড়ী খানার

উপর চক্ষু বুলাইয়া লইল—কটাক্ষে বুঝিল, জিনিস পত্র সং পূর্ব্ববৎ বাধা ছাঁদা আছে, একচুল তফাৎ হয় নাই। এখন তাহার উপর তার কিঞ্চিৎ বিশ্বাস জন্মিল।

হরিদাস তামাক খাইতে আরম্ভ করিলে গাড়োয়ান গরু আনিয়া গাড়ীতে যুড়িল এবং দেরী না করিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। হরি পূর্ব্ববৎ গাড়ীর পশ্চাতে চলিল—একবার উঁকি মারিয়া দেখিল, প্রভু নিদ্রিত হইয়াছেন।

অনেকক্ষণ কোন কথা হইল না। চিন্তার উপর চিন্তার তরঙ্গ আসিয়া হরিদাসকে বড় অন্যমনস্ক করিতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া ভৈরবের সেই ভৈরবমূর্ত্তি এবং সেই পরিখার পথের আলোক তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। হরি ভাবিতেছিল শাক্তেরা ত তাহাদের সঙ্গে কোন অসদ্ব্যবহার করিল না, আর তাহাদের যে সব অনাচারের কথা সে শুনিয়াছিল, তাহারও কোন চিহ্ন দেখা গেল না। ঠাকুরের সঙ্গেই বা সন্ন্যাসীটার তত ভাব কেমন করিয়া হইল, ভাবিয়া ভাবিয়া হরির কৌতূহল অসহনীয় বেগ ধারণ করিল। ইচ্ছা তখনই ঠাকুরের নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া সকল কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু সে বেগ সম্বরণ করিয়া হরি প্রতিজ্ঞা করিল ঠাকুরকে কিছুই সুধান হইবে না, তিনি আপনিই সব অবশ্য বলিবেন। শক্তি-কাননের সে অনুপম গম্ভীর দৃশ্য, সর্ব্বোপরি সেই আলোকের কথা মনে ভাবিয়া হরি মনে করিল, তবে শাক্তদের এমন কিছু গৌরব আছে, যা বৈষ্ণবের নাই। সে চিন্তায় তাহার বড়ই কষ্ট বোধ হইল, আর চুপ করিয়া থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তখন হরি আপনা হইতে গাড়োয়ানের সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল।

গাড়োয়ানও ভাবিতেছিল, কিন্তু সে ভাবনা অন্য রকমের। সে

ভাবিতেছিল হেঁদু ফকীরের আস্তানায় ত যাওয়া যায় না—ইহারা গিয়া কি দেখিয়া আসিল? এই বৈষ্টবের বেটাকে জিজ্ঞাসা করিলে হয় না? যদি খাপা হয়? গরীব বেচারীর মনের বাসনা মনেই লয় হইতেছিল। এ সংসারে যার যত দুঃখ, সে তত সহিষ্ণু, তত আত্মসংযমী। কথায় বলে, শরীরের নাম মহাশয়!

হরি বলিল, "চাচা, ঐ ত তোমার হেঁদু ফকীর?"

চাচা দাঁত বাহির করিয়া স্মিতমুখে একবার দাড়ি চুমরাইয়া লইল। হঠাৎ আশা সফল হওয়ায় একটু খুসী হইল—

"হয়, বৈষ্টবের ব্যাটা, উনিই বটে!"

হরি। বড় না কি দয়ালু—গরিবের মা বাপ?"

চাচা। এ অঞ্চলে অমন আর কে? আজ দু'মাস হলো ফকীর এখানে আসছে। যার যখন দুক্ষু কষ্ট হয়, সেই তেনাকে জানায় অমনি মেহেরবাণী করে। যার উপর আল্লার মেহেরবাণী আছে সে নইলে গরীবের দুঃখু বোঝবে কে, বৈষ্টবের ব্যাটা?

হরি। আচ্ছা, তুমি না তখনি বলছিলে বড় জঙ্গলে তার ঘর—যখন তখন কেউ সেখানে যেতে পারে না? তবে দুঃখু কষ্ট তোমরা জানাও কেমন করে?

চাচা। কেন ঐ বাগানে এসে দেঁড়িয়ে রইতে হয়। হয় ফকীর নয় তার চেলা ওখানে ভোর দিন থাকে, রাত্রেও কখন কখন থাকে। চেলাটা আবার এক এক দিন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়, সে যে জোয়ান—অমন মরদ কেউ দেখেনি!

হরিদাস আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। তখন গল্প আরম্ভ করিল। সে রাত্রে শক্তি-কাননের ঘটনা সহস্র গুণে অতিরঞ্জিত করিয়া সে চাচাকে অতিমাত্র বিস্মিত করিতেছিল। যে জাতি আরব্যোপন্যাস প্রভৃতি সত্যমূলক গ্রন্থ রচনা করিয়া এ দেশ দুনিয়াটা

কল্পনারাজ্যের নিতান্ত এক্তিয়ারের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন, নিরক্ষর বাঙ্গালী হইলেও গাড়োয়ান সে জাতির একজন এবং তাহার কিম্বদন্তীতে নিতান্ত অনভ্যস্ত ছিল না। অতএব হরিদাসের কাহিনী সে পরম আনন্দের সহিত হজম করিতেছিল। হরি বলিয়া দিল, বনের খানিক পরেই সব আগুন,—সে আগুনের আলো নাই। খুব কাল আগুন, আর তার অসম্ভব তাপ। হিন্দু নহিলে কেহ সেখানে যাইতে পারে না। হিন্দুকেও দশ হাজার হরিনাম জপ করিতে করিতে যাইতে হয়। আগুনের পর একটা জায়গা—সেখানে সব সোণার বাড়ী, আর সেখানকার মানুষগুলো সব তালগাছের চেয়ে লম্বা, আর বটগাছের চেয়ে মোটা। তারা কিন্তু কেউ বাহিরে আসে না। যে মরদের কথা গাড়োয়ান এইমাত্র বলিল, সে ত তাদের কাছে শিশু। হরিদাস বিস্মিত, স্বেদসিক্ত গাড়োয়ানকে ইহাও জানাইল যে তাহারা ঠাকুরকে আর তাকে লোহার কলাই খাইতে দিয়াছিল—খাইতে না পারিলে তাহারা আর ফিরিয়া আসিতে পারিত না। হরিনামের জোরে লোহার কলাই কাঁচা ছোলা হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই তাহারা রক্ষা পাইয়া আসিয়াছে।

এই পরমঃ সত্য কাহিনী বিবৃত করিতে করিতে হরিদাস আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেছিল—তাহার মনের বিষম ভারটা লঘু হইয়া আসিল। তান্ত্রিকদের কাণ্ড কারখানা স্বচক্ষে যাহা দেখিয়া আসিয়াছিল, তার নিজের ধর্ম্মে সে সব কিছু নাই, ইহা ভাবিয়া তাহার বড় ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। অতএব হরি বৈষ্ণবধর্ম্মকে অনন্ত মহিমার উৎস করিয়া গাড়োয়ানের নিকট পরিচিত করিল।

কল্পনার অবগুণ্ঠন যদি একবার খুলিয়া গেল, তবে আর হরিদাসের মুখ বন্ধ করে কার সাধ্য? হরিদাস আশৈশব যত কিছু ভূত, পেত্নী, দানা, দৈত্যের গল্প শুনিয়াছিল, সকলেরই অবতারণা করিল এবং

প্রত্যেক গল্পের শেষে হরিনামের মাহাত্ম্য ও জয় ঘোষণা করিল। ইহার ফলে চাচার মন কিছু টলিয়া গেল। সে মনে মনে অনুতাপ করিল, কেন তার বাপ পিতামহ হেঁদু না হইয়া মুসলমান হইয়াছিল। গল্পের আর এক ফল এই হইল যে, আপনাদের অজ্ঞাতসারে তাহারা প্রায় গন্তব্য স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন রাত্রি প্রায় প্রভাত হয়। জ্যোৎস্নার সে নির্ম্মলতা মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

হরিদাস ভাবিয়াছিল বটে যে ঠাকুর নিদ্রিত হইয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। উদ্বেগ এবং ক্লান্তিতে বড় অবসন্ন হইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি গাড়ীর মধ্যে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বরাবর এই পথে গৃহে ফিরিয়া যান, গো-যান ভিন্ন অন্য সুবিধা নাই, কিন্তু জিনিসপত্র বহনের জন্যই গো-জান তাঁর প্রয়োজন—সে ৬।৭ ক্রোশ করিয়া পথ হাঁটিতে তখনকার দিনে ভদ্রলোকের কষ্ট হইত না, বরং গরুর গাড়ীতে উঠা তাঁহারা পাপ মনে করিতেন। তবে শরীর না চলিলে কিছুতেই প্রায় বাধে না—সে রাত্রের ঘটনা পরম্পরায় তিনি বড় অবসন্ন হইয়াছিলেন। অতএব প্রভুকে গো-যানশায়ী দেখিয়া হরিদাসও মনে কিছু করিল না। একবার তাহার মনে হইয়াছিল বটে যে জিনিসে গাড়ী পূর্ণ, প্রভু শয়ন করিবেন কোথায়? কিন্তু প্রভু স্বয়ং যখন তাহাতে অসুবিধা বোধ করিলেন না, তখন আর কথায় কাজ কি? জগন্নাথ শয্যাস্তূপের উপর গিয়া পড়িলেন। বন্ধন-রজ্জুর কঠোর গ্রন্থি তাঁহার পৃষ্ঠে সূচিবেধবৎ লাগিতেছিল—কিন্তু মনের তখনকার অবস্থায় সে দিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ ছিল না। গাড়ী চলিতে-

ছিল—কোঁ—কোঁ—কোঁ—আর মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রত্যক্ষ করিতেছিল। কথায় বলে, আকাশ পাতাল তফাৎ, কিন্তু পুণ্যপুঞ্জ ফলে যানের বাদশাহ গরুর গাড়ীকে সনাথীকৃত করা মধ্যে মধ্যে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যাঁহাদের ভাগ্যে অনিবার্য্য, অস্থিচর্ম্মের দেহে সে তফাৎ তাঁহারা বড় বুঝিয়া উঠিতে পারেন না।

সেই অবস্থায় জগন্নাথ চিন্তা করিতেছিলেন। চক্ষু মুদ্রিত, কিন্তু মানস নয়নে সকলই তিনি দেখিতেছিলেন। শক্তি-কাননের ব্যাপার হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল, কিন্তু এ সকলের সঙ্গে সন্ন্যাসীর শেষ কথাটা মনে হইয়া একটা বিভীষিকার ভীষণ মূর্ত্তি তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন। কল্যাণপুরের গৃহ যেন আজি আর শান্তিময় নহে। অন্ধকার—অন্ধকার—অন্ধকার দেশ।—অন্ধকারে জ্যোতির্ম্ময়! সিংহাসনে কই হাস্যনিরত গোপীনাথের সে প্রেমময় মূর্ত্তি নাই। তাহার পরিবর্ত্তে লোলজিহ্বা, রক্তকিঙ্কিনী, নৃমুণ্ড-মালিনী, পিশাচিনী—এ কি এ মূর্ত্তি! শত শত ছাগ, মহিষ, মনুষ্যের ছিন্ন মস্তক ভূমিতলে লুটাইতেছে,—ছিন্নদেহ হইতে অবিরল ধারায় শোণিতরাশি প্রবাহিত হইয়া রক্তের নদী সৃষ্টি করিতেছে! জগন্নাথ মানস চক্ষুও মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করিলেন। বৃথা চেষ্টা!

অনেক ক্ষণ পর জগন্নাথের মানসিক যন্ত্রণা কিছু কমিয়া আসিল। হরিদাসের সত্যবাদিতার পরিচয় প্রাপ্তির পূর্ব্বেই তাঁহার নিদ্রার আবেশ হইল।

নিশা শেষে নিদ্রা ভঙ্গ হইল। পৃষ্ঠে সেই রজ্জুগ্রন্থির দারুণ সংস্পর্শ, গাড়ির সেই উত্থান পতন আর কোঁ কোঁ শব্দের মাধুরী, যুগপৎ তাঁহার দর্শন ও স্পর্শ শক্তিকে আপ্যায়িত করিতে লাগিল। হরিদাস গরু শেষ করিয়া তামাকু খাইতেছিল—হুকার ডাক তাঁহার কানে গেল। ঠাকুর ডাকিলেন—

"বাপু হরি—তোমার বড় কষ্ট হইল। তুমি একটু শয়ন কর, আমি এখন হাঁটিয়া যাইব।"

হরি মনে মনে হাসিল।—ঠাকুরের সর্ব্বাঙ্গে বুঝি বেদনা হয়েছে! প্রকাশ্যে বলিল—"আজ্ঞে আমার কোন কষ্ট হয় নি? আর ঘুমবই বা কতটুকু—বালুচর ত এসেছি!—কেমন চাচা?"

চাচা সায় দিল—হরির কাছে কলিকা লইয়া সেও একবার প্রসাদী করিল এবং জগন্নাথকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"করতা, তামাক ইৎসা করুন।" কিন্তু "করতা" কলিকা গ্রহণের পরিবর্ত্তে বলিলেন, "বাপু গাড়োয়ান, গাড়ি একবার থামাও ত,—আমি হাঁটিয়া যাব।"

জগন্নাথ তখন হাঁটিয়া চলিলেন—শেষ রাত্রির হিমের ভয়ে মাথায় চাদর বাঁধিতে ভুলিলেন না। হরি সসম্ভ্রমে কলিকা ঢালিয়া ফেলিয়া নূতন করিয়া তামাকু সাজিয়া দিল। অনেক ক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না। শেষে আচার্য্য মুখ খুলিলেন,

"হরি—সন্ন্যাসীকে চেন?"

হরি একটু পিছাইয়া পড়িয়াছিল, সন্ন্যাসীর নাম শুনিয়া দ্রুতপদে গুরুদেবের নিকট আসিল এবং তাহার সকল গল্প ফাঁসিয়া যায় দেখিয়া অতি মৃদুস্বরে প্রভুর কানে কানে বলিয়া দিল,—গাড়োয়ানের সাক্ষাতে ও কথা কিছু যেন না বলেন। জগন্নাথের সন্দেহ হইল, অবশ্য ভিতরে কোন কথা আছে। কাজেই তিনি চুপ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন।

দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বদিক ফরসা হইয়া আসিল—তাঁহারাও গঙ্গার ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরি শুচি হইবার আশায় প্রফুল্ল হইল এবং সাষ্টাঙ্গে পতিতপাবনীকে বন্দনা করিল। জগন্নাথও প্রণত হইলেন। তিনি হরিকে বলিয়া দিলেন, "এখনই একখানি ভাল পানসি ভাড়া কর, ভাড়ার টানাটানি করিও না! কাল এক

সময়ে বাড়ী পৌঁছিতে না পারিলে সবই বৃথা হইবে।” অতএব হরি নৌকা ভাড়া করিতে গেল।

হরিদাস গরজ না বুঝে এমত নহে, তবে একটু চেষ্টা করিলে মনিবের যদি ছ’পয়সা বাঁচে, তাহা না করিবে কেন? যত সকাল রওনা হওয়া যায় ততই ভাল—ইহা সেও অনুভব করিতেছিল। অতএব নৌকা ভাল দেখিয়া আজ হরি ভাড়ার সম্বন্ধে মাঝির সঙ্গে বড় একটা বচসা করিল না। তবে প্রভু যেখানে এক টাকা ঠকিতেন, ভৃত্য সেখানে চারি আনা সুবিধা না করিয়া ছাড়িল না। ভাড়া স্থির করিবার পূর্ব্বে হরি নৌকায় উঠিয়া দাঁড়, ছই, পাটন উত্তম করিয়া পরীক্ষা করিল—কতক্ষণ অন্তর নৌকার জল ফেলিতে হয়, যে জল উঠিয়াছে তাহাই বা কয় দণ্ডের, এ সকল অবশ্য জ্ঞাতব্য কথা সে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লইল। শেষে কিছু গম্ভীর হইয়া বলিল, “রাত্রেই যদি আজ বাড়ী পৌঁছিয়া দিতে পারিস মাঝি, তবে ঠাকুরের কাছে ‘ইলেম’ মিলিবে।” বলা বাহুল্য, ইহারই মধ্যে হরিদাস মাঝিদের নাম ধাম এবং পরিবারবর্গের ষোল আনার খবর লইয়াছিল। তাহাদের গলায় তুলসীর কণ্ঠী দেখিয়া বড় খুসী হইল—বৈষ্ণবে কখন চোর ডাকাত হয় না! এক দণ্ডের মধ্যে নৌকা ঘাটে আনিয়া হরি গাড়োয়ান এবং মাঝিদের সাহায্যে জিনিস পত্র সব নৌকায় তুলিল, এবং কাজ করিতে করিতে অনেক বার চাচার সঙ্গে সঙ্গে মাঝিদিগকে হাসাইল।

গঙ্গাস্নান করিয়া নৌকা ছাড়ার পরামর্শ হইল। জগন্নাথ গাড়োয়ানকে খুসী করিয়া বিদায় দিলেন, তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া রাখিলেন। সে যে খুব বিশ্বাসী লোক ইহা হরিদাসেরও বিশ্বাস হইয়াছিল—অতএব আচার্য্য আট আনার জায়গায় তাহাকে যখন পাঁচসিকা দিলেন, হরি তখন অসন্তুষ্ট হইল না। প্রভু স্নানাদিতে

প্রবৃত্ত হইলে হরি একজন মাঝিকে সঙ্গে লইয়া একবার বাজারে গেল—আবশ্যক মত জলপান ও পাকের দ্রব্যাদি কিনিয়া আনিল। বেলা চারি দণ্ড হইতে না হইতে নৌকা বালুচর ত্যাগ করিল।

স্নান এবং জল খাওয়ার পর ঠাণ্ডা হইয়া হরিদাস প্রভুর পদতলে আসিয়া বসিল। সমস্ত অঙ্গে বেদনা, জগন্নাথ অর্দ্ধ শয়নাবস্থায় চক্ষু মুদিয়া আরাম করিতেছিলেন। হরি প্রভুর পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল এবং তখন পদসেবায় মন দিল। জগন্নাথ চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন,—"না হরি, এখন পদসেবা রাখ। সমস্ত রাত ঘুমাও নাই—আমি যা হোক্ একটু আধটু চক্ষু বুজিয়াছিলাম। তুমি ত একবারও বসিতেও পাও নাই। এখন একটু ঘুমাও গে!"

হরি। এখন ঘুমালে আজ আহারের দায়ে নিশ্চিন্ত—প্রসাদ পাইয়া ঘুমাব।

কাজেই জগন্নাথ হরির ভক্তি-স্রোতে বাধা দিলেন না। সেই অবস্থায় আবার তাঁহার চক্ষু বুজিয়া আসিল—কিন্তু নিদ্রাকর্ষণ হইল না। একটু পরে বলিলেন,—

"হরি, শেষ রাত্রে তোমায় সন্ন্যাসীর কথা বলিতেছিলাম, বারণ করিলে কেন? ব্যাপার খানা কি?"

অন্যত্র প্রয়োজন মতে মিছা কথা বলিতে হরি নারাজ নহে, কিন্তু প্রভুর কাছে তাহাতে তাহার বিশেষ আপত্তি। হরি একটু ভাবিয়া মন স্থির করিয়া লইল। বলিল,

"প্রভুর যেমন সকলকেই বিশ্বাস! জেতে যবন, তার সম্মুখে কি সব কথা বলা যায় গা?"

জগন্নাথ এ উত্তরে প্রসন্ন হইলেন না। বলিলেন—"ছি! ও কথা বলিতে নাই। তোমায় বারবার বারণ করেছি, কাহারও জাতির

উপর ঘৃণা করিও না। বৈষ্ণবের এ অনুচিত—ভক্তি থাকিলেই হইল। যবন হরিদাসের কথা কি শুন নাই ?"

হরি অপ্রতিভ হইয়া শুষ্ক হাসি হাসিল—তখন অকপটে বলিল "সন্ন্যাসীর গল্প করিয়া আমি গাড়োয়ানের কাছে অনেক বড়াই করিয়াছিলাম। আপনার কথায় সে সব মিছা ভাবিত।"

জগন্নাথ মৃদু হাসিলেন—ও কথা আর তুলিলেন না। পরে রাত্রের কথা আনিয়া ফেলিলেন, কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভৈরবের আনীত ফল মূল হরি খাইয়াছিল কি না? হরি এবার দুষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল—"আপনার কি বোধ হয় ?"

জগ। আমি জানিতাম, তুমি খাবে না। খাও নাই বুঝি ?

হরি। অমন আজ্ঞা করিবেন না। শাক্ত দুটোর ব্যাভার ভাল হলে কি হয়, ও দিকে ছুঁতে নাই! গঙ্গা স্নান করে বেঁচেছি!

জগন্নাথ দেখিলেন—হরির গোঁড়ামি যাইবার নহে। অতএব সে কথায় আর কিছু বলিলেন না। হাসিয়া উত্তর করিলেন—

"সন্ন্যাসীকে অত ঘৃণা করিতেছ, কিন্তু কে সে জান ?"

হরি মাথা নাড়িল—"না!"—ভাবিল যেই হোক সে, শাক্ত ত বটে।

জগ। সন্ন্যাসী প্রভার পিতা—তোমার কাছে সে গল্প কি করি নাই ?

এবার হরি বিস্মিত হইল। প্রভার বাপের গল্প ঠাকুরের কাছে সে অনেকবার শুনিয়াছিল। কিন্তু রাত্রে সে কথা আদবে তার মনে হয় নাই। কে যেন তার মনে আলো জ্বালিয়া দিল। দুঃখিত হইয়া বলিল,—

"প্রভো, রাত্রে সন্ন্যাসীর সাক্ষাতে সে কথা আমায় একবার বলিলেন না কেন ?"

জগ। (হাসিয়া) বলিলে কি হইত? তুমি কি করিতে?

হরি। তা হলে কি অত ভয় পাই? আর আমি একবার তাঁকে বাড়ী ফিরাইবার চেষ্টা করিতাম! আপনার যিনি এত আপনার লোক, তিনি সংসার ধর্ম্ম ছাড়িয়া বনে বনে এ ভাবে থাকেন, এ কি সওয়া যায় ঠাকুর? আর সন্ন্যাসী বৈরাগী হলেও যা হোক্—

হরি আবার শক্তি-ধর্ম্মের তীব্র সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছিল, কিন্তু গুরুদেব সময় মত বাধা দেওয়ায় মনের কথা মনেই রহিয়া গেল। জগন্নাথ বলিলেন—"সে সব অনেক কথা আমার সঙ্গে হইয়াছিল—গৃহে আর তিনি ফিরিবেন না!"

আচার্য্য নীরব হইলেন। হরি জিজ্ঞাসা করিল—"প্রভার কথা কি কি হইল?" জগন্নাথ অন্যমনস্ক ছিলেন, উত্তর দিলেন না। অনেকক্ষণ তিনি কথা কহিলেন না। হরি প্রভুর মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া কি ভাবিতেছিল। তাহার কৌতূহল অসহনীয় হইয়া উঠিতে-ছিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

কুলু কুলু রবে ভাগীরথী কল্যাণপুরের নীচে বহিয়া যাইতেছেন। সব দিন সমান যায় না। চৈত্রমাসের প্রথমে তাঁহার অস্থি পঞ্জর সার হইয়াছে, বুকের ভিতর সৈকতস্তর জাগাইয়া শেষ বয়সে ভাগী-রথী অনন্তে মিশিতে চলিয়াছেন—তবু সেই চিরপরিচিত রব কুলু কুলু কুলু! তীরে বড় বড় অশ্বথ বটের গাছ—একটু দূরে আঁব কাঁঠালের বাগান। আম্র মুকুলের সে নবীন অনাঘ্রাত শোভাটুকু আর নাই—কিন্তু মধু মক্ষিকার দল এখনও পরিমল লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই। সুদূরে—দূরবিস্তৃত রবিশস্যক্ষেত্রে সোনার রঙ

মাখিয়া বায়ু তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইতেছে। মাঝে মাঝে কণ্টক-সর্ব্বস্ব দীর্ঘ শিমুল গাছ লাল ফুল ফুটাইয়া জীবন সার্থক বোধ করিতেছে। তাহার ডালে বসিয়া বউ-কথা-কও আপনার মর্ম্ম কথা অবাধে গাহিয়া চলিয়াছে। কোথাও আঁব বাগানের ঝোঁপ হইতে কোকিলের গান পরদায় পরদায় উঠিতেছে।

আজ বাসন্তী পূর্ণিমা। গ্রামে বড় ধূম—জগন্নাথ আচার্য্যের গৃহে ফুলদোলের বড় ঘটা।

গত রাত্রি হইতে কল্যাণপুরে বড় ধূম পড়িয়া গিয়াছে। মহা আড়ম্বরে ঢাক ঢোল রসনচৌকীর বাদোদ্যমে এবং আতস বাজীর লীলা খেলার শব্দে ক্ষুদ্র গ্রাম খানি প্রায় কাল সমস্ত রাত্রি প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। গ্রামের সমস্ত লোক কাল রাত্রি হইতে নিদ্রার নিকট বিদায় লইয়া আচার্য্য বাড়ীকে কাক-সমাকুলিত বট বৃক্ষের মত করিয়া তুলিয়াছে! যার যে ভাল কাপড় খানি আছে, সে তাই পরিয়া আসিয়াছে—ছেলে বুড়া সবাই প্রায় সমান আনন্দিত। দুঃখ, শোক, দারিদ্র্য যে সংসারে আছে, এ কথাও বুঝি আজ কাহারও মনে নাই—কেবল এক পরিবারের গৃহ প্রাচীর ভেদ করিয়া মর্ম্মভেদী রোদনধ্বনি উঠিতেছিল। আর বছর এমনই দিনে তাহার হৃদয়ের শোণিত, অঞ্চলের নিধি, বার্দ্ধক্যের ভরসা সকলের মত নূতন কাপড় পরিয়া এমনই করিয়া আনন্দ স্রোতে ভাসিয়াছিল—আজ দুঃখিনী মাকে ভুলিয়া সে কোথায় রহিয়াছে! মাতা বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছে, কিন্তু জনস্রোতের আনন্দময় কোলাহলে সে ক্ষীণকণ্ঠ নিমজ্জিত হইতেছিল। কেহই তাহার দুঃখে দুঃখী নহে—সকলেই আপনার সুখ লইয়া বিব্রত। কেবল হৈমবতীর হৃদয় সে সৌভাগ্যের মুহূর্ত্তে আনন্দের উচ্ছ্বাসেও পুত্রশোকাতুরা অনাথিনী বিধবার জন্য কাঁদিতেছিল।

দুই দিন হইল জগন্নাথ বাড়ী আসিয়াছেন। অন্যান্য বার অনেক আগে আসেন, কাজেই উৎসবের উদ্যোগ ধীরে সুস্থে করিবার যথেষ্ট অবসর থাকে। এবার নিতান্ত অসময়ে বাড়ী আসিয়াছেন, কাজে কর্ম্মে হাঁফ্ ছাড়িবার সময় পাইতেছেন না। বর্ষে বর্ষে গ্রামে আসিয়া প্রত্যেকের বাড়ী যান এবং ছোট বড় সকলকেই আপ্যায়িত করেন। এবার সে সবের কিছুই হইয়া উঠে নাই—সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর মনের সে স্ফূর্ত্তিও নাই। অতএব আচার্য্য ঠাকুর প্রয়োজনবশত একবার বাহিরে আসিলে জনস্রোত তাঁহার দিকে ঝুঁকিতেছিল—সে নধর গৌরকান্ত দেহ, ভক্তিরসে সদাই অমৃতময় একবার দেখিয়া চক্ষু সাথক করিবে, সকলেরই এই চেষ্টা। জগন্নাথ সে ব্যস্ততার মধ্যেও হাসিয়া হাসিয়া যথাসম্ভব সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। ধবল কৌশিক বস্ত্র ও কৌশিক উত্তরীয়ে সে সুন্দর দেহ অধিকতর সুন্দর দেখাইতেছিল।

মৃণ্ময়ী ঠাকুরাণীও বড় ব্যস্ত, তবে তিনি পাকা গৃহিনী, জগন্নাথের আগমন প্রতীক্ষায় নিজের উপর যাহা নির্ভর করে এমন সব কাজ কিছুই ফেলিয়া রাখেন নাই। ব্যস্ততার মধ্যেও ধীরতার সহিত সব কাজ করিতেছিলেন—ঠাকুর-ঘর আর ভাণ্ডার-ঘর দণ্ডের মধ্যে সহস্রবার আসিয়া দেখিতে হইতেছিল, তাহাতে ক্লান্তিমাত্র নাই। সে ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁহার ভয়ে সকলে তটস্থ—সে গম্ভীর মূর্ত্তির সমক্ষে সকলেই সশঙ্কিত হইয়া কাজ করিতেছিল। জগন্নাথ বারংবার আসিয়া তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাইতেছিলেন। কেবল লোকনাথ আসিয়া মাঝে মাঝে তাঁহার গাম্ভীর্য্য টলাইয়া দিতেছিল।—একবার আসিয়া খাবার চায়, আবার আবীর চায়, কখন কুঙ্কুম লইয়া পলায়ন করে। আর নোঙড়া কাপড় লইয়া পিসিমার এত কাছে

আসিয়া দাঁড়ায় যে মৃণ্ময়ী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তিন হাত সরিয়া যাইতে বাধ্য হন। কাজেই লোকনাথ পিসিমার আদরের গালি ও তিরস্কার মুহুর্মুহু অঙ্গের ভূষণ করিয়া অভীষ্ট সামগ্রী লইয়া মহানন্দে অন্দর বাহিরে ছুটাছুটি করিতেছিল। বাহিরে আসিয়া কাহারও চোখে আবীর দেয়, কাহাকে কুঙ্কুম ফেলিয়া মারে, কাহারও কাপড়ে পিচকারী দেয়। পাঠশালার সকল ছেলেই উপস্থিত। তাহারা লোকনাথের অনুগ্রহ-নিগ্রহ আজ জীবনের প্রধান সুখ-দুঃখ জ্ঞান করিতেছিল। যার সঙ্গে লোকুর বড় ভাব, সে যথেষ্ট মিষ্টান্ন আবীর এবং কুঙ্কুম উপার্জ্জন করিতেছিল, আর যার সঙ্গে সে ভাবের অভাব সে পেটে কিছু থাক্ আর না থাক্, পিঠে কাপড়ে এবং চোখে অনেক সহিতেছিল।

হৈমবতী অন্দরেরও নিভৃতে বসিয়া ধীরে ধীরে ঠাকুরঝির আদেশ মত বধূজনোচিত কাজগুলি নিঃশব্দে সম্পন্ন করিতেছিলেন। কাছে বসিয়া প্রভাবতী তাহা দেখিতেছিল এবং সাধ্যমত মার সহায়তা করিতেছিল। কুটুম্ববাড়ীর একটী যুবতী বধূ আর একটী কিশোরী বালিকাও কাছে বসিয়াছিল। বধূটী আজ পিঞ্জরমুক্ত হইয়াছেন, কাজেই বাপের বাড়ীর মত প্রায় মাথার কাপড় ফেলিয়া দিয়া হাত মুখ নাড়িয়া, নানা গল্প করিতেছিলেন। হৈম কাজ করিতে করিতে হাসিয়া হাসিয়া তাহা শুনিতেছেন। ছাই-ভস্ম গল্প— পরনিন্দা এবং আত্ম-প্রশংসা ও অলঙ্কারের কথাই বেশী—সে দিকে তাঁর বড় মন ছিল না। বধূটীকে প্রীত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, অথচ ইহার মধ্যে কাজও করা চাই। কিশোরী বালিকা হাঁ করিয়া হৈমর মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার অনুপম মুখশ্রী দেখিতেছিল, বধূর গল্পও শুনিতেছিল। কাজে এবং আপ্যায়িতে হৈমর অর্দ্ধেক মন, আর অর্দ্ধেকটুকু সেই পুত্রশোকাতুরা অন্নার্থিনী বিধবার জন্য

কাঁদিতেছিল। অতএব থাকিয়া থাকিয়া তিনি প্রভাকে শিখাইয়া দিলেন যে, একবার তোর দাদাকে ডেকে আন।

দাদা তখন পিচকারীর রঙে পরিধেয় বস্ত্রখানি চিত্রবিচিত্র করিয়া মাথায় আবীর মাখিয়া রাঙ্গা ভূত সাজিয়া, সমবেশী সঙ্গী-দের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ সন্ধি প্রভৃতি রাজনীতি কার্য্যে পরিণত করিতে-ছিলেন। গ্রামের "ছোট লোকের" ছেলেপিলেরা ছোঠ্ ঠাকুরের সে মোহন বেশ দেখিয়া একমনে তাহারই কামনা করিতেছিল। পাঠশালার বীরপুরুষদের তখনকার বিক্রম ও গৌরবে তাহারা বিস্মিত হইতেছিল। এমন সময়ে কে আসিয়া লোকনাথকে বলিয়া দিল যে প্রভা তাহাকে ডাকিতেছে—বার বার দোর হইতে উঁকি মারিতেছে, কিন্তু ভয়ে এ গোলে আসিতে পারিতেছে না। অতএব দাদা কিছুক্ষণের জন্য খেলা ছাড়িয়া একবার বোনটীর কথা শুনিতে দৌড়িলেন।

বোনটী দ্বারের পাশে সঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইয়া এক একবার উঁকি মারিতেছিলেন—রৌদ্রে গাল লাল হইয়া উঠিয়াছিল, টুক্-টুকে ঠোঁট দু'খানি শুকাইয়া গিয়াছিল। দাদাকে দেখিয়া সেই রক্তিম গণ্ডে শুষ্ক ওষ্ঠের ক্ষীণ মধুর হাসিটুকু আপনি উছলিয়া উঠিল—প্রভা অতি ধীরে ধীরে ছোট ছোট কথায় বলিল, "দাদা, অমন রাঙ্গা মানুষ কেমন করে হলি ভাই?"

দাদা হাসিয়া বোনটীর মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন—আঁচলে আবীর ছিল, একমুঠা সংগ্রহ করিয়া বলিলেন—"তুই ও রাঙ্গা মানুষ হবি ভাই বোনটী?"

কিন্তু বোনটী দাদার হাতে আবীর দেখিয়া ভয়ে চক্ষু মুদিলেন—ছোট ছোট দু'টী হাতে বড় বড় চোক দু'টী ঢাকিয়া বলিলেন "না!" লোকনাথ উচ্চ হাসিয়া প্রভার মাথায় আবীর দিল,—চক্ষু

খুলিয়া দিল। পরে জিজ্ঞাসা করিল কেন তাহাকে ডাকিতেছে? প্রভা হাঁফাইয়া হাঁফাইয়া বলিল যে মা ডাকিতেছে। তখন ভাই বোনে হাত ধরাধরি করিয়া মার কাছে গেল।

লোকনাথের সে লালমূর্ত্তি দেখিয়া কুটুম্বিনী বালিকা ও বধূর সঙ্গে সঙ্গে হৈমবতীও হাসিয়া উঠিলেন। বধূটীর হাসি কক্ষে কক্ষে তরঙ্গায়িত হইল—তাহাতেও হৈম অপ্রতিভ, কেননা তাঁর হাসি "কদাচ অধর বিনে অন্য দিকে ধায় না।" তিনি লোকনাথকে ধরিয়া গামছা দিয়া মাথা ও সর্ব্বাঙ্গ মুছিয়া দিলেন। ছেলে মার সে বন্ধন হইতে পলাইবার জন্য নানা ফন্দি করিতে লাগিল। নাকি সুরে কাঁদিতে লাগিল—বলিল "মা বুঝি এই জন্যই তাকে ডাকিয়া এনেছে, আর মার কোন কথা শুনিবে না।" গা মুছাইয়া হৈম ছাড়িয়া দিলে লোক এক লাফে আঙ্গিনায় গিয়া দাঁড়াইল—সঙ্গে সঙ্গে মাও বারান্দায় আসিলেন। এবং ধীরে ধীরে আদর করিয়া ছেলেকে আবার কাছে ডাকিলেন। লোকনাথ অনেক আপত্তির পর আসিল—তখন বলিলেন,

"সোণা ছেলে আমার, একটী কথা বলি শোন।"

লোক। খেলা ছেড়ে এখন আমি কিছু শুন্‌তে পারব না।

হৈম। বাপ্ আমার—সমস্ত দিন ত খেল্‌ছ। একবার ফকীরের মাকে দেখে এস, আর আমি সিধা দিচ্চি কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেও। রাত থেকে কাঁদচে—তোমার কি মায়া হয় না?

মার ছেলে, কাজেই মনটা ভিজিয়া গেল। দুঃখিত হইয়া বলিল—"আমি যাব না মা! ফকীরের মার কান্না শুনিলে আমারও বড় কান্না পায়—ফকীরের সঙ্গে খেলা ধূলো সব মনে পড়ে!"

এবার হৈমর চক্ষে জল আসিল। চক্ষু মুছিয়া ছেলেকে বলিল—

"তবে তোমার হরি দাদাকে একবার আমার নাম করে ডেকে দাও—তা ত পারিবে লক্ষ্মী বাপ্ আমার?"

লোকনাথ ছুটিয়া বাহিরে গেল এবং যেখানে হরিদাস কাজের সাগরে ডুবিয়া হাবুডুবু খাইতেছে—কাহার ডাকে উত্তর দিবে ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিতেছে না—সেইখানে গিয়া হাজির হইল। অনেকেই ছোট্ ঠাকুরকে প্রণাম করিল। হরি লুচির ময়দা তৈয়ার করিয়া দিয়া এই মাত্র কাহার কলিকা কাড়িয়া লইয়া তাড়াতাড়ি একটা টান্ দিতেছিল—লোক একেবারে তাহার ঘাড়ে উঠিয়া বসিল। বলিল—"হরে দাদা, মা তোকে একবার ডাক্‌ছে।"

হরি। কেন রে ভাই! কাকে বুঝি খেতে দিতে হবে? ভিখারীর পাল বুঝি জুটেছে?

লোক। তা নয়—তুই একবার যা ত! দেরি করিস্ নে।

হরি। আচ্ছা—যাচ্চি, তোকে এমন রাঙ্গা ভূত সাজালে কে রে লোকাদাদা? চ'বাবাকে দেখিয়ে আনি!

"তুই এমনি সাজ্‌বি হরে দাদা"—এই বলিয়া লোকনাথ আঁচল হইতে মুষ্টি মুষ্টি আবীর লইয়া হরিদাসের মাথায় ছড়াইয়া দিল—আর দাঁড়াইল না।

মাথা ঝাড়িতে ঝাড়িতে হরিদাস অন্দরে প্রবেশ করিল এবং প্রভার অন্বেষণ করিতে লাগিল, কেননা মা ঠাকুরাণী তাহার সহিত কথা কন না,—সমুখে পর্য্যন্ত বাহির হন না। প্রভা ঘরের বাহির হইয়াই হরিকে ফাগুরঞ্জিত দেখিয়া হাসিল, ডাকিয়া বলিল "মা—দাদা হরে দাদাকেও রাঙ্গা করে দিয়েচে!"

হরি সোপানের নীচে মা ঠাকুরাণীর উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিল, বলিল—"পরভা দিদি, মা ডেকেছেন কেন?—দুঃখী কাঙ্গালী বুঝি জুটেচে?"

মা শিখাইয়া দিলেন যে বল তোর হরিদাদাকে একবার ফকীরের মাকে দেখিয়া আসিতে, বুঝাইয়া সুঝাইয়া তার কান্না যেন থামাইয়া আসে, আর ভাল করিয়া যেন একটা সিধা তাকে দেয়। প্রভা আধ আধ কথায় হাঁফাইয়া হাঁফাইয়া অনেক চেষ্টায় হরে দাদাকে এ কথা গুলি বলিল। ফরমায়েসটা যে এমনি কিছু রকমের হরি পূর্ব্বেই তাহা বুঝিয়াছিল। অতএব হাসিয়া বলিল—

"মার যত মায়া বাইরের লোককে—বাড়ীর ছেলেরা যে ক্ষিধেয় মরে তা একবার দেখা নাই!"

শুনিয়া হৈম বড় লজ্জিত হইল—লজ্জায় মুখ লাল হইয়া উঠিল। প্রভা মার শিক্ষামত বলিল—'হরে দাদা, তুমি কি খাবে মা সুধাচ্চে।"

"কেন ছাঁচ আর ফুটকড়াই?—ও বেলা সে সব হবে।" এই বলিয়া হাসি হাসি মুখে হরিদাস বাহিরে ফিরিতেছিল এমন সময়ে জগন্নাথ বাড়ীর ভিতর আসিলেন। হরিকে দেখিয়া স্মিতমুখে বলিলেন—"কি হরি, প্রভার সঙ্গে কি গল্প হইতেছিল?"

হরি নিতান্ত ভাল মানুষের মত বলিল—"মা ডেকেছিলেন একবার!"

জগ। কেন?

হরি। একবার ফকীরের মাকে দেখে আসৃতে!

জগ। কেন গা?—তার হয়েচে কি?

হরি। ফকীরটী যে মারা গ্যাছে—কেন আপনি শোনেন নি? আমরা তখন প্রবাসে! রাত থেকে মাগী কাঁদ্চে—আহা!

জগ। আমি তা জানতাম না—এমন নির্ঘাতও হয়! বিধাতা কখন কার কি করেন! তা যাও, একবার দেখে এস! আমাদের

নাম করে সান্ত্বনা করো—কাল আমি নিজে যাব! কিছু খাবার পাঠিয়ে দিও। একটু শীঘ্র ফিরিও—এদিকেও অনেক কাজ!

হরি চলিয়া যায়, এমন সময়ে প্রভু আবার ডাকিলেন। হরি আসিলে এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিয়া দিলেন যে "নাপিত বৌকেও কিছু খাবার যেন দেওয়া হয়। আহা, বেচারী আমার কাছে অনেক কাঁদিয়া গেছে—কিন্তু দিদি যেন কিছু জানিতে না পারেন।—বুঝলে ?" হরি সবটুকু বুঝিল না, কিন্তু সেই নিভৃত কক্ষে অবগুণ্ঠনের ভিতর সকলই বুঝিল—হৈমবতী। দর্পণবৎ উভয়ের হৃদয়—উভয়ে উভয় প্রতিবিম্বিত হইত।

ঊনবিংশতি পরিচ্ছেদ।

মহা ধূম ধামে হোলি উৎসব শেষ হইয়া গেল। "হোলি" বলিলে পশ্চিমে যাহা বুঝায়, বাঙ্গলায় তাহা বুঝায় না। জিনিস একই, কিন্তু যমুনার কূলে তার সেই উন্মত্ত প্রভাবের সঙ্গে ভাগীরথী তীরের কোন তুলনা হয় না। পশ্চিমের হিন্দু নরনারী যখন চক্ষু লজ্জার মাথা খাইয়া মদন-পূজার অশ্লীল গীতে রাজপথ পর্য্যন্ত কলঙ্কিত করেন, ক্ষীণ বঙ্গসমাজের তখন উচ্ছ্বাস মাত্র নাই—একদিনেই উৎসব শেষ হইয়া যায়। অথচ সর্ব্বত্রই সেই কিসলয় স্তবকে কুসুম রাশি ফুটিয়া উঠে, সর্ব্বত্রই পাখী গায়, চাঁদ হাসে। তুমি যাই ভাব, আমি কিন্তু সেই উদ্ভ্রান্ত আমোদ স্রোতের মধ্যে পশ্চিমের অন্তঃসলিলা জীবনীশক্তির মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করি—আর বাঙ্গলার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া অবসন্ন হই। আমোদেও যার নির্জ্জীবতা, তার বুঝি কোনই আশা নাই।

এক দিনে কল্যাণপুর আবার পূর্ব্ববৎ নীরব হইল—জীবন-স্রোত নিঃশব্দে আপন মনে বহিয়া যাইতে লাগিল।

দ্বিতীয়ার রাত্রি—একটু আগে চাঁদ উঠিয়াছে। গঙ্গাবক্ষে ঠিক্ যেন আর একখানা আকাশ—কিন্তু কিছু চঞ্চল। সেই চাঞ্চল্যের মধ্যে শত শত ক্ষুদ্র চাঁদ সহস্র রশ্মি ছুরিত করিতে করিতে অনন্ত ক্ষুদ্র উর্ম্মি রাশিতে মিশিয়া যাইতেছিল। ছাদের উপর তাকিয়া ঠেস্ দিয়া অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় জগন্নাথ আচার্য্য—কাছে বসিয়া লোকনাথ আর প্রভা। আর কিছু দূরে বসিয়া মৃণ্ময়ী ঠাকুরাণী হরিনামের মালা ফিরাইতেছিলেন।

লোকনাথ বলিতেছিল—"বাবা, তোমার সেই ধ্রুবর কথাটী আবার বল না, শুন্‌তে আমি বড় ভাল বাসি। এবার আমি প্রহ্লাদের কথাও শিখেছি।"

জগ। আচ্ছা, তুমি আগে প্রহ্লাদের কথা বল, তার পর আমি ধ্রুবর কথা বল্‌ব।

তখন লোকনাথ প্রহ্লাদের দীর্ঘ কবিতাটী আগা পোড়া আবৃত্তি করিল। ততক্ষণ প্রভা দাদার মুখ পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। আর জগন্নাথ প্রীত মনে পুত্রের মধুর আবৃত্তি শুনিতেছিলেন। পরে তিনিও ধ্রুবর কথা বলিয়া লোক ও প্রভার আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন, শুনিয়া লোক হাসিয়া বলিল—"বোন্‌টী বুঝেছিস্—সব মনে আছে?"

প্রভা চাঁদের আলোয় আধ ফুটন্ত গোলাপের মত মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

তখন লোক বাপের দিকে ফিরিল—"বল না বাবা, ধ্রুব ভাল না প্রহ্লাদ ভাল?

জগ। তুমি বল দেখি—দুটো কথাই ত এখন শিখেছ?

লোক। আমার মনে হয়—ধ্রুবই ভাল বাবা। প্রহ্লাদকে আমার অত ভালবাস্‌তে ইচ্ছে হয় না।

জাগ। কেন বল দেখি?

লোক। প্রহ্লাদটা বড় কাঁচুনে ছেলে—ক দেখেই ভ্যা করে কান্না! দেখ দেখি ধ্রুবর কেমন সাহস, আর কত জেদ! বনে গিয়ে বাঘের সামনেও ভয় নেই—প্রহ্লাদ হলে মরে যেত!

জগন্নাথ পুত্রের এ সমালোচনায় উচ্চহাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না—মৃণ্ময়ীও হরিনাম ভুলিয়া হাসিয়া উঠিলেন, কাজেই লোক বড় অপ্রতিভ হইল, দুই হাতে চক্ষু ঢাকিয়া বিছানায় মুখ লুকাইয়া শয়ন করিল। প্রভা সরিয়া আসিয়া দাদার মুখ দেখিতে বারংবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে দুজনেই ঘুমাইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে মৃণ্ময়ী জপ শেষ করিয়া ভ্রাতার নিকট আসিয়া বসিলেন। জগন্নাথ সন্ধ্যাদি শেষ করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন—প্রভা ও লোকুরও আজ্‌ কাচা কাপড়, অতএব অশুচির ভয় ছিল না। অন্যান্য কথার পর মৃণ্ময়ী ঠাকুরাণী নাপিতবৌর কথা তুলিলেন। জগন্নাথ এক আধ দিন পরে দিদিকে কোন রকমে তার জন্য অনুরোধ করিবেন, হৈমর সঙ্গে এরূপ পরামর্শ করিয়াছিলেন। হঠাৎ সে সুবিধা আপনা আপনি উপস্থিত হইল দেখিয়া মনে মনে একটু খুসী হইলেন। কিন্তু দিদিকে বড় ভয়—আগে তাঁর যা বলিবার থাকে না শুনিয়া কিছু বলা হইবে না।

দিদি বলিতেছেন, "মাগীকে এখনও আমি জবাব দিই নি—ভয়ে আপনিই আসে না। দুঃখও হয়—গরিব খাবে কি করে? কিন্তু মাগী দো ঠক্‌ঠকের শেষ। বাড়ীতে কাজকর্ম্ম গেল— তার মধ্যে একদিনও এলো না!"

জগন্নাথ হাসিয়া বলিলেন-"এসেছিল দিদি, তোমার ভয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে এসেছিল,—আমি দেখেছি!"

মৃণ্ময়ী।• তুমি বুঝি আশা ভরসা দিয়ে তার আস্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছ! এবার যদি আবার আসে, তবে কোন্ দিন বউর সঙ্গে আমার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দেবে।

জগন্নাথ দিদির ক্রোধোদ্দীপনের ভয়ে কথা কহিলেন না, দিদি পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিলেন, "গরিব বলে দয়া হয় বটে, কিন্তু তা বলে দুষ্ট লোককে আস্পর্দ্ধা দিতে নেই। এই জন্যে আমি ভেবেছিলাম, তুমি বাড়ী এলে আমি তাকে বিদায় দেব। রোজ রোজ ঠাকুরের প্রসাদ না হয় নিয়ে যাবে, কিন্তু বাড়ীতে আর ঠাঁই দেব না।"

জগন্নাথ তথাপি নীরব। দিদি চাহিয়া দেখিলেন ভাই অধোমুখে। মনে মনে হাসিলেন,—বউর বুঝি কিছু অনুরোধ আছে! প্রকাশ্যে বলিলেন—"তা তোমাদের মত হয়, তাকে কাল থেকে আবার ডাকাও—আমি আর কিছু বল্‌ব না।"

জগন্নাথ এবার ক্ষীণ হাসি হাসিলেন। বলিলেন,

"দিদি, আমার আবার মত কি? তুমি যা ভাল বুঝ্‌বে, তাই হবে! আমি যা বল্‌তে চেয়েছিলাম, তা ত তুমি নিজেই বললে। গরিব না খেয়ে মর্‌বে। তা সেই ভাল,—রোজ তাকে ঠাকুরের প্রসাদ দিও, অন্য লোক কাজ কর্‌বে।"

দিদি একটু নরম হইলেন, কিন্তু প্রভাকে কাঁদানর কথাটা তাঁহার মনে আসিল। ভাইকে সে কথা সব বলিলেন। শেষে বলিলেন, —"প্রাতে একবার নাপিতবৌকে ডাকাইও, সে যদি দিব্বি করে, আর কথনও ঠকামি কর্‌বে না, তবে তাকে রাখিব। এবার ঠকামি কর্‌লে কিন্তু ঝাঁটা মেরে তাড়াব—কারু কথা শুনব না।"

নাপিতবৌর মামলা শেষ হইলে মৃণ্ময়ী প্রভার বিবাহের কথা

তুলিলেন। বাঙ্গালীর মেয়ের জীবনের প্রধান সাধ আহ্লাদ, পুত্র-কন্যার বিবাহ, তা নিজেরই হউক আর ভাই বোনেরই হউক। তাহা না দেখিয়া মরিলে স্বর্গেও তাঁহাদের বুঝি সুখ নাই। এ সম্বন্ধে ভালবাসার অত্যাচারটুকু তাঁহাদের কিছু বেশী বেশী এবং ইহা অতিরিক্ত ভালবাসার ফল। মৃণ্ময়ী ভ্রাতাকে অশ্রুপূর্ণ লোচনে জানাইলেন তাঁহাকে ভালোয় ভালোয় রাখিয়া এবং লোকু আর প্রভার বিবাহ দেখিয়া মরিতে পারিলেই তাঁর সব সাধ পূর্ণ হয়।

অমনি জগদীশের কথা জগন্নাথের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল—এক কালে সহস্র বৃশ্চিক দংশনের বচনাতীত তীব্র যাতনা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন। ভাবিয়া দেখিলেন, দিদিকে সে অসুখের ভাগ দেওয়ায় কোন লাভ নাই—বরং কেবল মনোকষ্ট। ভবিতব্যে যা থাকে হইবে, ভরসা কেবল গোপীনাথের চরণ। অতএব জগন্নাথ সংক্ষেপে বনপথে সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাতের পরিচয় দিলেন—কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে জগদীশের মত এমন ঘুরাইয়া বলিলেন যে দৈবের কোন কথা মৃণ্ময়ীর মনেও উদয় হইল না। জগদীশের কথা শুনিয়া মৃণ্ময়ী আগ্রহে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন,—বাড়ী ফিরিতে তাঁহার প্রবৃত্তি নাই শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। স্বর্গগতা মা বোনকে মনে পড়িয়া গেল। অনেক দিনের অনেক বিস্মৃত কথা—সুখদুঃখের মধুর স্মৃতি—তাঁহারও হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ এই ভাবে গেলে—ভাই বোন কাহারও মন ভাল ছিল না। মৃণ্ময়ী উঠিলেন—উঠিবার সময় জগন্নাথকে বলিয়া গেলেন, বউ আসিলে লোকুকে উঠাইয়া যেন তাঁহার বিছানায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়! ভ্রাতা নীরবে ঘাড় নাড়িলেন।

মৃণ্ময়ী উঠিয়া গেলে হৈম নিঃশব্দে আসিয়া স্বামীর পার্শ্বে বসিল। আধহাত ঘোমটা কমিয়া কপোল পর্য্যন্ত উঠিল, কিন্তু মাথা ছাড়িয়া

নাবিল না—কখনই প্রায় নাবিত না। মুখের হাসিটুকু নথের নোলকে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। জগন্নাথ সে লজ্জা প্রেম সরলতার হাসিমাখা মুখ খানি দেখিতে দেখিতে মর্ম্মযাতনা বিস্মৃত হইতে-ছিলেন।

স্বামীর কাছেও হৈম সেই ব্রীড়া-বিনতা লজ্জাবতীর ফুল। তত লজ্জার কিছু বয়স ছিল না, কিন্তু হৈম আজিও আপনার অধিকার বুঝিয়া লইতে পারে নাই। আগে একেবারে মুখ .ফুটিতে পারিত না, এখন ততটা কমিয়াছে। জগন্নাথের তাহাতে আপত্তি ছিল না—সেই লাজ ভরা সঙ্কোচের হাসি হাসি মুখ খানিতে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতেন।

লোকনাথ আর প্রভা পাশাপাশি ঘুমাইতেছিল—চন্দ্রালোকে সে সুন্দর মুখ দু'খানি আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। যেন এক বৃন্তে দু'টী ফুল। দেখিয়া হৈমবতী চক্ষু সার্থক করিলেন—স্বামীর হাত ধরিয়া বলিলেন—"দেখ কি সুন্দর!"

জগন্নাথ দেখিয়া হাসিলেন, কিছু বলিলেন না। হাসিটুকু তাঁর বিষাদ ভরা। হৈম অত বুঝিতে পারিল না। আবার আমোদ করিয়া বলিল,—

"বিধাতা কেমন মিলাইয়াছেন! আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, প্রভাকে বউ করে জীবন সার্থক করি। বিয়ে কি হয় না?"

এ কথার উত্তর জগন্নাথের তখনকার মনের অবস্থায়—দীর্ঘনিশ্বাস। তাঁহারও আগে মনে হইত, বিধাতার যদি তাহাই ইচ্ছা, তবে লালন পালন করিয়া আদরের মেয়েটীকে কোথায় আর বিলাইয়া দিব? পুত্রবধূ করিয়া জীবন সার্থক করিব। কিন্তু জগদীশের কথায় সে সব সাধ ভাসিয়া গিয়াছিল। বড় মর্ম্মযাতনা, হৈমর কথায় শত

গুণে তাহা বাড়িয়া উঠিল। অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া জগন্নাথ হাসিমুখে বলিলেন—

"ভাই বোনে বিয়ে? তোমাদের বুঝি হয়?"

হৈম অপ্রতিভ হইল। দেখিয়া জগন্নাথ তাঁহার চিবুক স্পর্শ করিয়া আদর করিলেন। দারুণ মর্ম্মযাতনার কোন কথা তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর সমক্ষে ব্যক্ত করেন নাই। জীবনের সুখ-দুঃখের যিনি প্রধানসঙ্গিনী—ধর্ম্মাধর্ম্মের যিনি তুল্যাংশভাগিনী, তাঁহাকেও সে কথা বলিলেন না। বলিলে হয় ত তাঁহার নিজের যন্ত্রণার কিছু উপশম হইত— কিন্তু হিন্দু-হৃদয়ের রহস্য ঐ টুকু। সংসারের যা কিছু মহৎ, পবিত্র, সুন্দর, গৃহ-লক্ষ্মীকে তাহার ভাগ দিতে তাঁহারা মুক্তহস্ত—যত কার্পণ্য, কঠোরতা এবং পাপের বেলায়; কেননা সে ভাগ সবটুকু নিজের। তাহাতেই হিন্দুর শুদ্ধান্তপুর এ কলিকালেও তপোবন। বুঝিয়া দেখিও—অনেক শান্তি পাইবে।

কিন্তু দর্পণে দর্পণে কি লুকোচুরি চলে গা? আসল কথা না বুঝুক, কিন্তু হৈম একটু পরেই বুঝিল, স্বামীর মনটা তেমন ভাল নাই। বড় উৎকণ্ঠিতা হইল—শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল,

"এমন চাঁদের আলোয়, মনটা ভার ভার কেন?"

জগন্নাথ মনের সহিত হাসিলেন—"কেন বল দেখি, চাঁদের আলোয় কি হাসিতেই হবে এমন কথা আছে?"

হৈম। আমার মনে হয়, এমন সুন্দর রাত্রি শুধু আমোদ-আহ্লাদ ভালবাসারই জন্যে। আঁধার রেতে কেউ কাঁদিলে মনে হয়, কাঁদিবারই রাত্রি।"

জগন্নাথ মনোকষ্ট ভুলিয়া গেলেন। সে হাসিতে প্রফুল্ল, লজ্জায় মাখা অনন্ত সৌন্দর্য্যময় মুখখানি আদরে ধরিয়া বার বার চুম্বন করিলেন। তখন শয়নাগারে উঠিয়া গেলেন।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে মৃণ্ময়া ঠাকুরাণী নাপিতবৌকে ডাকাইলেন। ডাকের কথা শুনিয়াই মনুষ্য-শৃগালের এই সুযোগ গৃহিণী ব্যাপার খানা বুঝিয়া লইল এবং সোহাগীর মার সমক্ষে আসিয়া কথায় কথায় তাহাকে মর্ম্মপীড়িতা করিয়া তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিল। সোহাগীর মার উপর তার বড় রাগ—দুঃখ অপমানের দিনে সে যে আর তেমন ভয় করিয়া চলিত না, এই তার বড় অপরাধ। নাপিতবৌর মতে সে দোষে পাড়া প্রতিবেশিনী অনেকেই দোষী,—অতএব সু-খবর তার কর্ণগোচর হইবামাত্র বিধুমণি নাপিতানী মনে মনে একটা মতলব ঠাওরাইয়া লইল,—আজ মনিববাড়ী থেকে ফিরিয়া কি কি ছলে কার কার সঙ্গে ঝগড়া করিতে হবে! সমস্ত রাস্তা প্রায় এই চিন্তাতেই কাটাইল—মনে বড় খুসী, মুখে সুতরাং সেয়ানতমির হাসি ফুটিতেছিল। কিন্তু মনিববাড়ীর কাছে আসিয়া নাপিতবৌ জোর করিয়া হাসি খুসীকে মনের ঘরে পুরিয়া রাখিল—বাহিরে মুখ বিষাদভরা। মৃন্ময়ী ঠাকুরাণীকে আসিয়া যখন প্রণাম করিল, তখন তার চক্ষু ছল ছল করিতেছিল—দুই এক ফোঁটা জলও পড়িল।

মৃণ্ময়ী অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"তা আর কাঁদিস্ নে নাপিতবৌ, আগেকার মত কাজ কর্ম্ম কর্। আমি যা দেখ্‌তে পারি নে, এমন কাজ করিস্ নে। জানিস্ ত আমার বেশী রাগ!"

সেই দিন মধ্যাহ্নে পাড়া-প্রতিবেশিনীরা কম্পিত দেহে জানিল যে ভগ্নদন্তা সর্পিণীর দাঁত আবার উঠিয়াছে—মৃণ ঠাকুরাণী নাপিতবৌকে ডাকাইয়া কাজ দিয়াছেন। স্নানের ঘাটে যাহাকে দেখিল, বিধুমণি তাহারই সঙ্গে কোন না কোন ছলে কোন্দল বাধাইল। অতএব ডুব দিবার আগে তাহার মনটা অনেক পরিমাণে হালকা হইয়া গেল।

কিন্তু মনিব-বাড়ীতে এবার নাপিতবৌর বড় পসার—আর যেন সে

নাপিতবৌই নয়! কাজ কর্ম্ম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মুখে কথাটী নাই, যে যা বলে নিরুত্তরে অথচ হাসি মুখে তাহা পালন করে। আগে প্রভা তার কাছে বড় ঘেঁসিত না, কিন্তু নাপিতবৌর এবারকার যত্নে সেও বশীভূত হইল। কাজেই মৃণ্ময়ী ঠাকুরাণী তাহাকে বড় অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন। হৈমর কিছুতেই আপত্তি নাই। তবে নাপিতবৌর এমন পরিবর্ত্তন দেখিয়া মনে মনে তিনি বড় খুসী হইলেন।

পাড়ায় কিন্তু অতি গোপনে একটু আধটু কানাঘুষো উঠিল—অতি গোপনে, কেননা বিধুমণির মুখের জ্বালা বড় জ্বালা, কোন্দলে অত পারদর্শিতা এবং বাগ্মিতা গ্রামে আর কারও ছিল না। অতি গোপনে মধ্যাহ্নে আহার করিতে করিতে, কোথাও বা আহারের পর সেই জের রক্ষার্থ পা ছড়াইয়া উকুন দেখিতে দেখিতে আলুলায়িতকুন্তলা বৃদ্ধা, মধ্যবয়স্কা এবং যুবতীর দল জুরির বিচারে অনুপস্থিত আসামী শ্রীমতী বিধুমণি ওরফে নাপিতবৌকে অতি গুরুতর অপরাধে অভিযুক্তা ও অপরাধিনী স্থির করিতে লাগিলেন। বিচারান্তে প্রত্যেকে প্রত্যেককে মাথার দিব্য দিয়া অতি গোপনে নিষেধ করিয়া দিলেন, কথা যেন প্রকাশ না হয়। গরবীর মা সকলকেই বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিল—কেননা তিনি সোহাগীর মার "মনের কথা" কথাটা হজম করিতে পারেন নাই। শ্রোত্রীবর্গের মধ্যে যাঁহারা কিছু না শুনিয়া না বুঝিয়াই নাপিত-বৌকে দারুণ পাপীয়সী ঠাওরাইয়াছিলেন, তাঁহারা পুনশ্চ গরবীর মাকে কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় নিক্ষেপ করিলেন। প্রকাশ হইল যে, সোহাগীর মা দুই দিন গভীর রাত্রে উঠিয়া দেখিয়াছে যে নাপিতবৌর ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, এক দিন দাড়ী জটাওয়ালা একটা মানুষ—মাগো! বলিতে গরবীর মার এবং শুনিতে শ্রোত্রীবর্গের গায় কাঁটা দিল—একটা মানুষ, (সোহাগীর মার দেখে না কি মূর্চ্ছা হইয়াছিল!) নাপিতবৌর ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল! কাজেই তখন সে পরছিদ্রান্বেষণ-সর্ব্বস্ব

মহিলাসমাজে অবিসম্বাদিত রূপে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া গেল যে, কুঁদুলী মাগীটার বুড়া বয়সে ধেড়ে রোগ হইয়াছে!

এদিকে প্রভাবতী দিনে দিনে নাপিতবৌর বড়ই অনুগত হইয়া উঠিল। নাপিতবৌকে সে আগে ডাকিত "নাপিতবৌ" বলিয়া, এখন বলে "নাপিত দিদি!" কাজে কর্ম্মে একটু অবকাশ পাইলেই নাপিতবৌ প্রভাকে লইয়া খেলা করে, নানা রকমে তার বালিকাসুলভ কৌতূহল ও ক্রীড়াবৃত্তিকে উত্তেজিত এবং পরিতুষ্ট করে। তাহার যে অতি গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল, এ কথা কেহই বুঝিতে পারিল না। ঊর্ণনাভ যেমন ধীরে ধীরে অতর্কিত ভাবে জাল বিস্তার করে, তেমনই এ মায়াবিনী দিনে দিনে মায়াজাল পাতিতে লাগিল। মৃণ্ময়ী ভাবেন, তাঁর শাসনের এ ফল। ভাইকে এবং বউকে সময়ে সময়ে বলিতেন—"দেখ দেখি তোমারা কাউকে কিছু বল না, নাপিতবৌকে আমি কেমন সুধরাইয়া দিলাম!" সবাই এখন নাপিতবৌর উপর সন্তুষ্ট, কেবল একটু যা অসন্তুষ্ট লোকনাথ।—কেন সে বোনটীকে অমন ভুলাইয়া রাখে? বোনটী ত আর তেমন সারাদিন সঙ্গে সঙ্গে ফিরে না!

সন্ধ্যার পর মা পিসী ঘুম পাড়াইলে প্রভার এখন আর ঘুম হয় না—দাদার খেলাধূলোর গল্প আর ভাল লাগে না; নাপিত দিদি "রূপ-কথা" না বলিলে প্রভা ঘুমাইতে পারে না। শেষে এমন হইল যে প্রভা দুই এক দিন জেদ ধরিত—"আজ্ নাপিত দিদির বাড়ীতে শোব!" পরে প্রকাশ পাইয়াছিল যে জেদ্ করিতে নাপিতবৌ তাহাকে শিখাইয়া দিত। হৈম এবং জগন্নাথ আদর করিয়া ভুলাইতেন, লোকনাথ বোনটীকে রাগাইত—মৃণ্ময়ী গর্জ্জন করিতেন, "কি! মেয়ের এত বাড়!" নাপিতবৌর ঘরে অন্য লোক নাই, অতএব সে কিছু রাত্রে বাড়ী ফেলিয়া মনিববাড়ীতে শুইতে আসিতে পারে না। কাজেই জেদের দিন সে কান্না থামাইবার জন্য সন্ধ্যার

সময় প্রভাকে বাড়ী লইয়া গিয়া ঘুম পাড়াইয়া আবার রাখিয়া যাইত। এ বন্দোবস্তে মৃণ্ময়ী নারাজ ছিলেন না।

এই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। কেবল ভাদ্র মাসে হরিদাস মাতৃহীন হইল। পূজার পর আবার কার্ত্তিক মাস আসিল—জগন্নাথ হরিদাসকে লইয়া যথারীতি প্রবাসে বাহির হইলেন। তাঁহার গৃহত্যাগের সপ্তাহ পরে বাড়ীতে বড় বিপদ ঘটিল। বিপদের বীজ কয়মাস পূর্ব্বেই উপ্ত হইয়াছিল। নাপিতবৌকে অতটা বিশ্বাস করা ভাল হয় নাই।

অমাবস্যার রাত্রি,—সন্ধ্যা হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে অন্ধকার আসিয়া পল্লীগ্রামের হৈমন্তিক শ্যামল শস্যক্ষেত্র, তালতরু-রাজি-বেষ্টিত পুষ্করিণী এবং গৃহস্থ বাড়ীর গৃহের চূড়া হইতে গৃহ-প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত সকলই ছাইয়া ফেলিল। সোহাগীর মা এই মাত্র কম্পিত কলেবরে পুকুরঘাট হইতে আসিয়া কাপড় নিঙ্গড়াইতেছিল, সোহাগী একটু আগে প্রদীপ জ্বালিয়া দাওয়ায় বসিয়া ছিল।

মা বলিল—"সোয়াগী, সাঁঝের বেলা কোথাও আর বেরুস্‌নে মা!—আমি আজ্‌ পুকুরে গিয়ে ডরিয়ে এয়েছি।"

সোহাগী। তুই যেন দিন দিন খুঁকী হচ্ছিস্‌ মা! অত যদি ভয়, একলা যাস্‌ কেন সন্ধ্যে বেলায় পুকুর ঘাটে?

মা। সেই লো সেই—সেই জটাওয়ালা দেড়ে মিন্‌সে! বল্লে তুই পেত্তয় যাস্‌নে বাছা, দেখি কি পুকুর পাড়ে অশথগাছের তলায় লুকিয়ে বসে আছে! কি হবে গাঁয়ে একটা অমঙ্গল কিছু ঘট্‌বে দেখ্‌চি!

সোহাগী। থাম্‌ থাম্‌, আর বকিস্‌ নে। পেটে কথা থাকে না, এ দিকে ভয়েই মরিস্‌! যত কিছু কি তোরই চক্ষে পড়ে ছাই? খুড়ীর কানে কথা উঠ্‌লে তোর লাঞ্ছনার কিছু বাকী থাক্‌বে না

গরবীর মাকে আমার মাথা খেতে বলেছিলি, সে গাঁময় রাষ্ট করেচে! কাপড় কাচ্তে গিয়ে আমি আর মুখ পাইনে!

* * * *

এদিকে আচার্য্য-বাড়ী গোপীনাথের আরতি শেষ হইয়া গিয়াছে। আরতির সময় লোকনাথ কাঁসর বাজাইতেছিল, প্রভা নাপিত দিদির কোলে উঠিয়া আরতি দেখিতেছিল। আরতি দেখিতে প্রভার বড় আনন্দ। প্রভা এক মনে পুরোহিত ঠাকুরের করধৃত উজ্জল পঞ্চপ্রদীপের বিচিত্র সঞ্চালন-ক্রিয়া লক্ষ্য করিতেছিল— কাঁসর ঘণ্টার মিশ্রিত রবের মধ্যে নাপিতবৌ কানে কানে বলিল,

"প্রভা, আজ আমার বাড়ী শুতে যাবি?

প্রভা—(কানে কানে) কেন নাপিত দিদি!

নাপিতবৌ। অনেক রূপ কথা বল্‌ব এখন। আর এক মজার জিনিস দেব খেতে। কিন্তু আমি শিখিয়ে দিচ্চি, এ কথা কাউকে বলিস্‌নে—কেমন? বাড়ী গিয়েই কান্না ধর্‌বি, কিছুতে ভুলিস্‌নে বুঝ্‌লি! আমিও বক্‌ব, কিন্তু তা শুনিস্‌নে!

প্রভা। তুই আবার বক্‌বি কেন দিদি?

নাপিতবৌ। নইলে তোর পিসিমা বল্‌বে এখন আমি শিখিয়ে দিয়েচি।

প্রভা সম্মত হইল। নাপিতবৌ এই শিশুর কোমল মনটুকু দিন দিন আপনার ছাঁচে গড়িয়া লইতেছিল। কুসংসর্গ সকলের পক্ষেই দোষের। মনুষ্য-হৃদয়ের লীলাখেলা সর্ব্বত্র একই রূপ। পূর্ণবয়স্কের যে অনুভব শক্তি এবং কার্য্যকারিণী বৃত্তি শিশুতে তাহার স্ফূর্ত্তি সম্ভবে না বটে, কিন্তু যে টুকু স্ফূর্ত্তি লাভ করে তাহার কার্য্য প্রায় একরূপ। ভাল মন্দ চিন্তা মাত্রেই আমাদের শারীরিক যন্ত্র সকল কিয়ৎ পরি-

মাণে উত্তেজিত হয়। বয়স্কে এবং শিশুতে প্রভেদ কেবল মাত্রায়। কাজেই নাপিতবৌর কপটতা প্রভাতে ধীরে ধীরে সংক্রামিত হইতেছিল।

বাড়ীতে প্রবেশ করিতে না করিতে প্রভা সুর ধরিল—"আ-মি না-পি-ত-দি-দি-র বাড়ী শোব।" ধুয়া বাড়িয়াই চলিল। প্রথমে নাকি সুর, তার পর কান্না, কাজেই চক্ষের জল; মৃণ্ময়ী ঠাকুরাণী মালা জপিতে জপিতে ছাদ হইতে প্রভার কান্না এবং সঙ্গে সঙ্গে নাপিতবৌর ভৎসনা শুনিতে পাইলেন। "এমন মেয়ে কখনও দেখিনি—বাপ্‌রে। কি হবে শুয়ে আমার বাড়ী? মশা ছারপোকার দৌরাত্মে আমারই ঘুম হয় না, তুই ঘুমুবি কেমন করে?"

মৃণ্ময়ী মালা রাখিয়া ছাদ হইতে বলিলেন—"তা যা নিয়ে আজ্‌কে। ফের কোন দিন কাঁদ্‌লে আর পাঠাব না।" মেয়ের এত বাড়্‌! কাল বাদে পরস্থ বিয়ে হবে! তোর কথা যখন শোনে, তোরও উচিত ওকে বুঝান নাপিতবৌ। চিরদিন কিছু তোর কোলে কোলে ফির্‌লে চল্‌বে না! তরিবৎ হওয়া ত চাই!"

নাপিতবৌ এ অবকাশ ছাড়িবার পাত্রী নহে। কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "আমি কি কর্‌ব পিশিমা—আমায় যে ছাড়ে না! তা ভদ্দর নোকের ছেলে মেয়ের তরিবৎ করা কি আমাদের কাজ গা? তোমরা হয় ত ভাব, আমিই বা কাঁদ্‌তে শিখিয়ে দিই!"

এই বলিয়া বিধুমণি প্রভার গা টিপিল এবং তাহাকে কোল হইতে নাবাইয়া দিল, এবার প্রভা দ্বিগুণ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কেননা ঘুমাইবার আগে নাপিত দিদির ক্রোড়ের বিরহজনিত যে রোদন, তাতে তার খল কপট ছিল না। হৈমও পাকশালা ত্যাগ করিয়া আসিলেন। কাজেই প্রভা নির্ব্বিবাদে আবার নাপিত দিদির কোলে চড়িয়া তাহার বাড়ী চলিয়া গেল।

কিন্তু অন্য দিনের মত সে রাত্রে নাপিতবৌ প্রভাকে ঘুম পাড়াইয়া ত রাখিয়া গেল না! মৃণ্ময়ী উৎকণ্ঠিত হইলেন,—হৈম তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন হয় ত নাপিতবৌ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। উভয়ে ভাবিলেন—"তা থাক্ না কেন প্রভা তার বাড়ী এক রাত্রি।" সেই বিশ্বাসই হইল অনর্থের মূল, কেননা তখন খোঁজ খবর হইলে বুঝি এতটা বিপদ ঘটিতে পারিত না।

পরদিন প্রাতেও নাপিতবৌ যথাসময়ে মনিববাড়ী আসিল না। বেলা হইল দেখিয়া মৃণ্ময়ী রাগিয়া উঠিলেন—"মাগীর আক্কেল কেমন? মেয়ে নিয়ে গিয়েছে রাত্রে, এখনও এলো না—আজ্ তাকে দুটো কথা শুনাইয়া দিব।" কিন্তু লোকের উপর লোক পাঠাইয়াও নাপিতবৌর দেখা পাওয়া গেল না। প্রকাশ হইল যে রাত্রেই সে প্রভাকে লইয়া কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। মুহূর্ত্তে গ্রামের ঘরে ঘরে খবর রাষ্ট্র হইল। অনেকে আসিয়া সোহাগীর মার প্রচারিত গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিল। তখন আচার্য্য বাড়ীতে রোদনের রোল উঠিয়া গেল। রাগে দুঃখে শোকে মৃণ্ময়ী ঠাকুরাণীর মূর্চ্ছার উপর মূর্চ্ছা হইতে লাগিল।

এ বিপদে হৈমবতী বুদ্ধি স্থির রাখিলেন। কোথা হইতে মনে তাঁহার অভূতপূর্ব্ব বলের সঞ্চার হইল। অবগুণ্ঠনের মাত্রা কমাইয়া আজ তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি গৃহিণী সাজিয়াছেন। মূর্চ্ছিতা ননদের শুশ্রূষার ভার হরির বৌ সোহাগীর হাতে দিয়া লোকনাথকে মাঝখানে রাখিয়া তিনি শিষ্য এবং অন্যান্য লোকজনকে সময়োচিত আদেশ দিতে লাগিলেন। একজন শিষ্য তখনই জগন্নাথের কাছে ছুটিল। হৈম আপনার অলঙ্কার পত্রের রাশি বাহির করিয়া সকলের সমুখে রাখিয়াছিলেন—বলিতেছিলেন "যে প্রভাকে আনিয়া দিবে, এ সব তার!" কাজেই চারিদিকে লোক ছুটিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

একবিংশ পরিচ্ছেদ

রাজমহল অঞ্চলে বিস্তৃত শালবন। দক্ষিণ দিকে শ্যামল শৈল-শ্রেণীর প্রাচীর, যেন বিক্ষুব্ধ মৃৎসিন্ধুর তরঙ্গরাজি। উত্তরে ভাগীরথী প্রবাহিতা। কার্ত্তিক মাস, কাজেই যৌবন-বর্ষার সে টলমল উদ্দাম বেগ কমিয়া আসিয়াছে। অতি ধীরে ধীরে শালবনের ভিতর দিয়া অজগরের ক্ষুদ্র শিশুবৎ শৈলসম্ভূতা ক্ষুদ্র নদী বেড়িয়া বেড়িয়া ভাগীরথী-স্রোতে আসিয়া মিশিয়াছে। সেই শৈল তলে শালবনের ভিতর অন্যতর শক্তিকানন।

কার্ত্তিক মাস—প্রভাত হইয়াছে। গাছে গাছে পাখীরা কেহ গান কেহ কোলাহল করিতেছিল। শৈলসুতা ক্ষীণ নদীর কুলু কুলু রবও বড় ক্ষীণ—যেখানে প্রস্তর খণ্ডে গতিরোধ হইতেছিল, সেই খানেই একটু স্পষ্ট শ্রুত কল কল—অন্যত্র প্রবাহ যেন আপনার বিষাদে আপনি ভোর। দূরে কেবল প্রস্রবণের ঝর ঝর শব্দ। শষ্পশয্যার উপর দাঁড়াইয়া ইষ্টকরচিত দেবীমন্দির সে কাননের শান্তি রক্ষা করিতেছে। আর তাহারই প্রাঙ্গণে শেফালিকা ফুলের রাশি তৃণশয্যার হরিৎ শোভা আবৃত করিয়া দেবোদ্দেশে আপনাদের পরিমলটুকু উৎসর্গ করিতেছে। দূরে তিন খানি মৃণ্ময় কুটীর। সেইখানে অশ্বত্থ-তরু মূলে বসিয়া দুই জন মনুষ্য কথোপকথনে নিযুক্ত ছিলেন। প্রভাতের স্নিগ্ধ মারুত হিল্লোলে একজনের দীর্ঘ কেশরাশি ঈষৎ কম্পিত হইতেছে।

তিনিই জগদীশ সন্ন্যাসী, আর কাছে বসিয়া ভৈরব। সন্ন্যাসী বলিতেছিলেন—

"ভৈরব স্বপ্নের কথা ত শুনিলে এখন তুমিই বল কি করা উচিত।"

মিতভাষী ভৈরবের কণ্ঠ আজ উন্মুক্ত হইয়াছে—চক্ষের জ্যোতিতেও যেন বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল। কেননা ভৈরব আজ গুরুদেবের সংসর্গচ্যুত হইতে বসিয়াছে। ঘটনাধীনে মনুষ্য-জীবনে সকলই সম্ভব। জগদীশ এই বীরাকৃতি নীরবপ্রকৃতি শিষ্যের মূর্ত্তিতে নূতন সৌন্দর্য্য দেখিতেছিলেন।

ভৈরব ধীরে ধীরে প্রভুর দিকে চক্ষু উঠাইল। "প্রভু, ভবানীর স্বপ্নাদেশ শিরোধার্য্য, কিন্তু অনেক সময় আমরা নিজের হৃদয় বুঝিতে পারি না—সকল সময়ে স্বপ্ন দেবাদিষ্ট না হইতে পারে।"

জগদীশ। বৎস, তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি না। কোন্ বিষয়ে তোমার পরামর্শ না লই? যা বলিবার থাকে স্পষ্ট করিয়া বল।

ভৈরব। অপরাধ লইবেন না প্রভু—আমার সকলই আপনি। আপনিই শিখাইয়াছেন, সত্যই সকল ধর্ম্মের উপর ধর্ম্ম—মা ভবানী অসত্যের পূজা গ্রহণ করেন না।

জগদীশ। কতবার তোমায় এক কথা বলিব? নিঃসঙ্কোচে যা বলিবার থাকে বল। আজ এত ক্ষুণ্ণ কেন ভৈরব?

বাস্তবিক ভৈরবের প্রত্যেক গতি এবং বাক্যে ক্ষোভ প্রকাশ পাইতেছিল—নহিলে স্পষ্ট কথা ভিন্ন যে জানে না, সহজ ভাবে স্পষ্টবাদিতার জন্য সে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিবে কেন? জগদীশ তাহা লক্ষ্য করিলেন। ভৈরব বলিল,

"গুরুদেব, কৈশোর হইতে আপনার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছি, কখন ত এমন ভাবান্তর দেখি নাই? আপনি আমার দেবতা; আমায় আর আঁধারে রাখিবেন না প্রভু। পক্ষ গত হয়, কথা আর গোপন করিলে চলিতেছে না।"

সন্ন্যাসী অতিশয় বিস্মিত হইলেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। ভৈরব বলিতে লাগিল,

"এই এক পক্ষ দেখিতেছি প্রভু. গভীর রাত্রে নিদ্রাবস্থায় আপনি কাহার সঙ্গে কথা কন,—কে যেন আপনাকে ভয় দেখাইতে আসে, অতি সঙ্কোচে, নিতান্ত অপরাধীর মত তাহার কথার উত্তর দেন। শেষে সেই অবস্থায় সভয়ে তার অনুগমন করেন।" ইহার অর্থ কি গুরুদেব? আমি এই পক্ষকাল সর্ব্বদার জন্য আপনার প্রত্যেক গতি লক্ষ্য করিতেছি—রাত্রে নিদ্রা নাই। ঘোর নিদ্রাবস্থায় আপনি শয্যা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, বাধা বিপত্তি কিছুই মানেন না, শেষে আমি ফিরাইয়া কুটীরে লইয়া আসি। গত রাত্রে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, আমি সঙ্গে না থাকিলে গঙ্গাগর্ভেই যাইতেন। আমি বুঝিতে পারি, সকলই আপনার অজ্ঞানাবস্থায় গাঢ় নিদ্রার ঘোরে ঘটে! ইহার অর্থ কি?"

জগদীশের বিস্ময় সীমাতিক্রম করিল, অন্য কাহারও মুখে এ সব কথা শুনিলে তিনি বিশ্বাস করিতেন না, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড লয় হইবে তবু ভৈরব মিথ্যা বলিবে না, ইহা তাঁহার জানা ছিল। তখন অনির্ব্বচনীয় ভয় ও অবসাদ আসিয়া তাঁহাকে অধিকার করিল—সেই দৃঢ় বলিষ্ঠগঠন বেতসপত্রের মত কাঁপিতে লাগিল। প্রাতঃ সূর্য্যের কোমল কিরণ সম্পাতে দেখিতে দেখিতে কাননতল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—সে শোভা সন্ন্যাসীর চক্ষে সহিতেছিল না, তিনি সূর্য্য-করে কেবল নরকের অগ্নি প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। প্রভুভক্ত কুক্কুর যেমন নীরবে প্রভুর গতি লক্ষ্য করে, ভৈরব তেমনি গুরুদেবের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিল।

মুখের দর্পণে মনের যন্ত্রণা প্রকাশ পাইতেছিল। অনেক ক্ষণ পর সন্ন্যাসী ভৈরবের সঙ্গে কথা কহিলেন,—

"বৎস, তোমার মুখে শুনিলাম বলিয়াই এ কথা বিশ্বাস হইতেছে—আমি নিজে কিছুই জানি না। যাহা হোক, এখন সকলই বুঝিতে পারিতেছি। আমি নরাধম পাপী, এ সব আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত!—"

জগদীশ আর বলিতে পারিলেন না। গুরু শিষ্যে অনেকক্ষণ নীরবে রহিলেন। আনন্দময় শক্তি-কাননে এত অশান্তি আর কোন দিন তাঁহারা অনুভব করেন নাই। সন্ন্যাসী ধৈর্য্য সংগ্রহ করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,

"এতদিন তোমায় যাহা বলি নাই—কেননা বলা প্রয়োজনীয় মনে করি নাই, আজ তাহা বলিব বৎস! তোমায় প্রবঞ্চনা করিব না। আমি বড় পাপী, আমায় পাপ হইতে রক্ষা করিয়া গুরুদেব আমার নবজীবন দিয়াছেন। কিন্তু কেমন পাপস্মৃতি, এক পাপে জীবন চিরদিনের তরে কলুষিত হইয়া রহিল, কখন শান্তি পাইতেছি না। বড় যাতনা—নরক নরক—ঐ দেখ নরকের আগুন এখনও মনে জ্বলিতেছে। আমায় বিদায় দাও ভৈরব! তোমায় শিষ্য করিয়া আমি পাপের ভার বৃদ্ধি করিয়াছি—আমি তোমার অযোগ্য গুরু। তুমি দীক্ষান্তর গ্রহণ কর। এ শক্তি-কানন তোমার—আমায় বিদায় দাও।"

সন্ন্যাসীর কণ্ঠে এত কারুণ্য, এত তীব্র অনুতাপ প্রকাশ পাইতেছিল যে ভৈরব অস্থির হইয়া উঠিল। ভৈরব বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন সাষ্টাঙ্গে গুরুর চরণে প্রণত হইয়া বাষ্পগদগদ স্বরে বলিতে লাগিল,—

"প্রভু, এ সব কথা আমার অশ্রাব্য। আপনি যাই হউন, আমার দেবতা। কৈশোর হইতে ঐ দেবমূর্ত্তি দেখিয়া জীবন ধারণ করিয়া আসিতেছি, পিতামাতার যত্ন স্নেহ, গুরুদেবের শিক্ষা সকলই আমার আপনা হইতে। তার আগে জীবনে আপনার কি পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, জানিয়া আমার কাজ কি? আমায় ত্যাগ করিবেন্ না গুরুদেব।"

জগদীশ স্থিরভাবে বলিলেন, "তুমি এত অধীর হইবে, ইহা আমি ভাবি নাই ভৈরব! কিন্তু এ জীবন আমি আর ধারণ করিতে পারি না। অন্ততঃ কিছু দিন আমায় বিদায় দাও। একবার পরমহংসের চরণ দর্শন করিলে যদি শান্তি পাই।"

ভৈরব সেই ভাবে থাকিয়া প্রভুর দিকে চাহিল। সজল দীন চক্ষু, আর কখন ভৈরবের এত ভাবান্তর দেখিয়াছেন সন্ন্যাসীর এমত স্মরণ হইল না। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,

"আর কি উপায় আছে ভৈরব? আমি ত আর কিছু ভাবিয়া পাই না।"

"উপায় আছে প্রভু! আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করুন। আপনিই শিখাইয়াছেন, পরার্থে স্বার্থ নিমজ্জিত করিতে হইবে। চলুন, কিছু দিনের জন্য এ শক্তি-কানন ছাড়িয়া পরের কাজে জীবন সমর্পণ করি। পরের ভাবনায় আপনার ভাবনা লুপ্ত হইবে। শান্তি আপনিই আসিবে।"

ধীরে ধীরে জগদীশ শিষ্যের বাহুযুগল ধরিয়া সযত্নে চরণতল হইতে তাহাকে উঠাইলেন। তখন আশীর্ব্বাদ করিয়া নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভৈরব বুঝিল, প্রার্থনা গ্রাহ্য হইয়াছে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

শক্তি-কানন ছাড়িয়া জগদীশ সন্ন্যাসী পরদিন পাহাড় অঞ্চলে চলিলেন—সঙ্গে ছায়ার ন্যায় ভৈরব। নিকটস্থ পাহাড়িয়াদের কাছে তাঁহাদের বড় পসার—সময়ে দল বাঁধিয়া তাহারা স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া শক্তি-কাননে আসিত এবং ভবানী-মূর্ত্তি দর্শন ও প্রদক্ষিণ করিয়া

"বস্তি"তে ফিরিয়া যাইত। সন্ন্যাসী যথাসাধ্য আহারাদি করাইতেন এবং আবশ্যকমত ঔষধপত্র দিতেন। অতএব আপনাদের গৃহে সন্ন্যাসী ঠাকুর আর তাঁহার ভীমাকৃতি সহচরকে পাইয়া প্রকৃতির এই শিশুদের আমোদের সীমা ছিল না। যাকে ভালবাসি, তাহাকে দেখিলে কার্ না আমোদ হয়? কিন্তু যত আনন্দ বালকবালিকার, তত কি তোমার আমার? অমনি পাহাড় বস্তিতে মাদল বাজিয়া উঠিল—পার্শ্ববর্ত্তী বস্তির পাহাড়িয়ারা পর্য্যন্ত আসিয়া জুটিল। সন্ন্যাসীর আগমনে মহোৎসব বাধিয়া গেল।

ইহাতে সন্ন্যাসীর নিজেরও উপকার হইল। যে আত্ম-বিস্মৃতি লাভের জন্য তিনি লালায়িত, দেখিলেন এই ভাবে তাহার কতক আমোদের আয়ত্তাধীন। যেখানেই তিনি যান, আর্ত্তের উপকার তাঁহার উদ্দেশ্য। অনেক গাছগাছড়া, অন্যের অজানিত ঔষধ তিনি শিখিয়াছিলেন—রোগার্ত্ত আসিলে আরোগ্য বিধান করিলেন। শোকার্ত্ত আসিলে শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া সান্ত্বনার অমৃত তাহাকে অর্পণ করিলেন। দরিদ্রকে যথাসাধ্য দান করিতে লাগিলেন। মন থাকিলে সংসারে পরোপকার করার ভাবনা কি? আর দুঃখ—তা সংসারের কোথায় বা নাই!

ভৈরবের আনন্দের সীমা নাই। সর্ব্ব কার্য্যে সে প্রভুর সহায়। দুই চারি দিন এই ভাবে গেল—উভয়ে বস্তিতে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে জগদীশ জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভৈরব, দেখিতেছি তুমি বড় আনন্দিত—চক্ষে তোমার আনন্দ-জ্যোতি ফুটিতেছে। কি মঙ্গল অনুভব করিতেছ?"

ভৈরব মৃদু হাসিল। ধীরে উত্তর করিল—"প্রভুর মঙ্গলেই মঙ্গল। আজ তিন দিন লক্ষ্য করিতেছি, দুঃস্বপ্নে প্রভু আর বিচলিত হন না।

জগদীশ সম্মতি-সূচক শিরঃ সঞ্চালন করিলেন। কিছুক্ষণ দুজনেই নীরবে পথ অতিবাহিত করিয়া চলিলেন। সন্ন্যাসী প্রথমে কথা তুলিলেন—

"দেখ ভৈরব, যথার্থই নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানে হৃদয় বড় শুষ্ক হয়। কর্ম্ম ভিন্ন বৃথা ধর্ম্ম, আর কর্ম্ম করিতে হইলেই ভক্তি চাই। আমার জীবনে প্রতিপদে আমি এই সত্যই পরীক্ষা করিতেছি। যখন কোন ধর্ম্মই মানিতাম না, তখনও মানিতাম যে অনুরাগ ভিন্ন কর্ম্ম হয় না। কিন্তু বুঝিতে পারিতাম না, অনুরাগই ভক্তি।"

ভৈরবের আয়ত চক্ষু দুটি আনন্দে আয়ততর হইল—গুরুদেবের উপদেশ শুনিতে তার যত সুখ, বিশ্বসংসারে এত আর কিছুতে নহে। সংসার তখন তাহার চক্ষে বড় সুন্দর দেখাইত। আজি এই পাহাড়ের পথে অনন্ত নীলাকাশতলে গুরূপদেশ শুনিতে শুনিতে ভৈরব স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতেছিল।

সন্ন্যাসী আবার বলিতে লাগিলেন,—"প্রথমবার কর্ম্ম এবং ভক্তির মাহাত্ম্য পরমহংস বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, দ্বিতীয়বার তুমি বুঝাইলে ভৈরব। গুরুকে শিষ্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে হইল—কথায় বলে, বুড়া বাপ ছেলের ছেলে! এ কয়দিন আমি অনেকটা শান্তি অনুভব করিতেছি।"

ভৈরব আত্ম-প্রশংসা শুনিয়া মুখ নত করিল—অনেক ক্ষণ গুরুদেবের দিকে চাহিতে পারিল না। দেখিয়া জগদীশ মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন।

কোন বস্তিতে পৌছিলে উভয়ে আপনাদের সম্বন্ধে আলাপাদির বড় সময় পাইতেন না—সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে আর্ত্তের ত্রাণার্থ নিযুক্ত থাকিতে হইত। বলা বাহুল্য, উভয়ের বাঞ্ছনীয়ও তাই। পথ হাঁটিবার সময় কথাবার্ত্তা হইত। অধিকাংশ কথা অবশ্য সন্ন্যাসী

বলিতেন—ভৈরব যাহা না বলিলে নহে, তাই বলিত। জগদীশ একদিন হাসিয়া বলিলেন,—

"ভৈরব, তোমার পরামর্শে দিনে দিনে শান্তি লাভ করিতেছি বটে, কিন্তু তথাপি ইচ্ছা হইতেছে কিছু দিন তোমায় ছাড়িয়া একবার গুরুদেবের দর্শনে যাই।"

ভৈরব সশঙ্কিত হইল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মৃদু স্বরে বলিল—"কেন প্রভু?"

জগদীশ হাসিয়া উঠিলেন।—"আমার যাওয়ার কথা শুনিলেই তোমার কণ্ঠে সরস্বতীর আবির্ভাব হয়—সর্ব্বাঙ্গে যেন বাক্যস্ফূর্ত্তি হয়। দেখিতে আমার বড় আনন্দ। নহিলে ত আর কথা শুনিবার যো নাই।"

ভৈরব মুক্তার মত দন্তশ্রেণী বাহির করিয়া ঈষৎ হাসিল, আর কিছু বলিল না। গুরু-শিষ্যে এমনই ভাব বরাবর। বলা বাহুল্য, ইহা জগদীশ সন্ন্যাসীর নিজের সৃষ্টি। গভীর জ্ঞানে তিনি তন্ত্রের প্রচলিত বিকট ধর্ম্ম কোমলতর করিয়া লইয়াছিলেন—তান্ত্রিকের কঠোর গুরু-শিষ্যসম্বন্ধও তাঁহার কাছে মাধুর্য্য লাভ করিয়াছিল।

একটু পরে সন্ন্যাসী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "বৎস, সত্যই একবার পরমহংসের চরণ দর্শনের প্রয়োজন হইয়াছে। যত দিন পাপ-স্মৃতি লুপ্ত না হয়, ততদিন আমার মনে প্রকৃত শান্তি নাই। আধ্যাত্মিক বিপদ পদে পদে। গুরুদেবের শেষ আদেশ এই যে, যদি কখন আধ্যাত্মিক বিপদে পড়ি, তবে যেন তাঁর শরণাপন্ন হই। কাজেই কিছু দিন তোমায় ছাড়িয়া থাকিতে হইবে।"

ভৈরবের হর্ষোৎফুল্ল মূর্ত্তি নিমেষে ম্লান হইয়া গেল। কথা বলিতে তাহার ওষ্ঠাধর কম্পিত হইল। বলিল,

"প্রভু, যাওয়াই যদি স্থির, ভৃত্যকে ছাড়িয়া কেন যাইবেন?"

কিন্তু প্রভু অন্যমনস্ক হইলেন, কোন উত্তর করিলেন না।

এইরূপে পক্ষ গত হইল। এক দিন এক বস্তিতে উপস্থিত হইয়া উভয়ে শুনিলেন, তথায় ডাকাইতের বড় ভয়। প্রায় দুই.চারি দিন অন্তর গভীর রাত্রে একদল ডাকাইত আসিয়া বড় অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে—অধিবাসীরা সশঙ্কিত ভাবে বাস করিতেছে। কয় ঘর উঠিয়া অন্য বস্তিতে গিয়াছে। ছাগ, মহিষ; সুবিধা পাইলে কখনও বা মনুষ্য পর্য্যন্ত তাহারা হরণ করিয়া লইয়া যায়। শুনিয়া জগদীশ চিন্তিত হইলেন—ভৈরব উত্তেজিত হইয়া উঠিল। পরপীড়নের কাহিনী উভয়েরই অসহনীয়—তবে ভৈরবের তরল শোণিত বড় উষ্ণ হইয়া উঠিত।

জগদীশ ভৈরবের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। এই আর্ত্তদিগের পরিত্রাণ আবশ্যক। কি উপায়ে তাহা সিদ্ধ হইবে? ভৈরব প্রভুকে জানাইল, এখানে বাহুবলের প্রয়োজন—পাহাড়িয়াদিগকে সহায় করিয়া সে একাই শত্রুদমন করিবে। সন্ন্যাসী সম্মত হইলেন,—কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধার না করিলে চলে না। তিনি তন্ত্রের বৈজ্ঞানিক, আহুতি সহায়ে অগ্নির দমন করা তাঁহার মতে অকর্ত্তব্য নহে। কিন্তু ভৈরবকে তিনি বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়া দিলেন, জীবহত্যা যেন না হয়।

ভৈরব পাহাড়িয়াদের ভিতর হইতে একদল বলবান যুবক বাছিয়া লইল এবং প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহাদিগকে যুদ্ধ-কৌশল শিখাইতে লাগিল। গুরূপদেশ শ্রবণ ভিন্ন আর দুই বিষয়ে ভৈরবের বড় আনন্দ—পরোপকারে, আর তাহাই সাধনার্থ বাহুবলের প্রয়োগে। বিধাতা বৃথায় সে বরাবয়ব সৃষ্টি করেন নাই।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

গভীর রাত্রে একদিন বস্তিতে বড় হৈ চৈ পড়িয়া গেল—কেননা দূরে কয়টা আলোক দেখা যাইতেছিল। ডাকাইতেরা আলো লইয়া ডাকাইতি করিতে আসিত। ভৈরবের নিদ্রা নাই। প্রভু রাত্রে যেখানে বিশ্রাম করিতেন, তাহারই সন্নিকটে সে শয়ন করিত। সেই বলিষ্ঠ পাহাড়িয়া যুবক কয়জন—সংখ্যায় বিশজন মাত্র—কাছে কাছে থাকিত। ভৈরবের শাসনে তাহারাও জাগ্রত—নিদ্রা যাইবে কখন? যখন তখন সর্দ্দার—ভৈরব এখন তাহাদের সর্দ্দার—শিঙ্গা বাদন করে। শিঙ্গার রব শুনিলে তাহাদের শয্যায় থাকিবার হুকুম নাই,—একেবারে ডাকাইত তাড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রফুল্ল চিত্তে প্রতিপদে তাহারা ভৈরুবের আদেশ পালন করে। সে বীর মূর্ত্তি দেখিলেই তাহাদের ভক্তি হইত—কেননা প্রকৃতির এই শিশুরাই শক্তির প্রকৃত উপাসক। প্রাচীন ভাষা সমূহের অঙ্গে আজিও যে সূর্য্য চন্দ্র ইন্দ্র বরুণোপাসনায় চন্দন পুষ্পের চিহ্ন দেখিতে পাও, সে সব সেই শৈশবে শক্তিসাধনার পরিচয় মাত্র।

ভৈরব অতি অল্প দিন মধ্যে তাহাদের সুন্দর তরিবৎ করিয়াছে, এরূপ যুদ্ধ-কৌশল শিখাইয়াছে যে দশজনে অনায়াসে শত জন অশিক্ষিত লোককে পরাভূত করিতে পারিবে। এ দিকে তাহাদের উপর কোন বিষয়ে তাহার নিরর্থক প্রভুত্ব নাই—শিক্ষাদানের সময় ভিন্ন সর্ব্বদাই তাহাদিগকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করে। বালক বালিকারা পর্য্যন্ত ভৈরবকে পাইলে আর কারও সঙ্গে খেলা করে না—দিনের বেলায়, সময়ে অসময়ে সকল সময়ে, কেহ কাঁধে, কেহ মাথায়, কেহ বাহুতে কেহ বা কোলে আশ্রয় লইয়া তাহাকে ষষ্ঠী ঠাকুর করিয়া তোলে। পাহাড়িয়া সিমন্তিনীগণ চক্ষু ভরিয়া এই বীর পুরুষের

মোহন মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়া মুগ্ধ হয়, আর তাহার কোমল পবিত্র স্বভাবের জন্য সকলেই তাহাকে ভক্তি করে। সন্ন্যাসী এবং ভৈরবে তাহারা একটু তফাৎ করিত। সন্ন্যাসীকে দেখিলে একটু তটস্থ হইত—সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত টুকুতে ভয় ভক্তির মধ্যে মাত্রা কার বেশী, বুঝিয়া উঠা সহজ নহে। ভৈরব তাহাদের সহচর, আত্মীয় গুরুজনের মত কেবল সম্ভ্রমের পাত্র।

শিঙ্গা বাজাইয়া আপনার ক্ষুদ্র সেনাদলকে প্রস্তুত করিয়া ভৈরব প্রভুর পর্ণশয্যা পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। কুটীরের এক কোণে আগুন জ্বলিতেছিল, তাহার ক্ষীণালোকে দেখিল, সন্ন্যাসী তখনও নিদ্রিত। ললাটে কিন্তু শান্তির প্রসন্নতা নাই—কি যেন দারুণ যাতনার সঙ্কোচ-রেখায় মুখের সবটা ব্যাপ্ত হইয়াছে। স্বপ্নের ঘোরে ভীতিবিহ্বল জগদীশ একবার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন, অমনি আর্ত্তস্বরে কথা ফুটিল—"ঐ—ঐ—আবার রক্তের নদী! কত কাল এ নরক দেখিব? উদ্ধব তুই শাস্তি দিবার কে?—তুই—ও!। তোর চখের কি জ্বালা!!!" আরও এরূপ চলিত বোধ হয়, কিন্তু ভৈরব তাহাতে বাধা দিয়া প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ করিল। তাঁহার হৃদয়ে পুনরায় অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে ভাবিয়া বড় ক্ষুন্ন হইল। কিন্তু তখন বড় ব্যস্ত—সে দিকে মন দিবার সময় ছিল না।

জগদীশ চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। ভৈরব তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। "প্রভু, ডাকাত আসিতেছে! অনুমতি করুন, তাহাদিগকে আক্রমণ করি।"

জগ। যাও—তোমার মনোরথ সিদ্ধ হউক! কিন্তু দেখিও ভৈরব, প্রাণী হত্যা যেন না হয়।—চল আমিও সঙ্গে যাই, দূর হইতে তোমার বীরত্ব দেখিব।

* * * *

দেখিতে দেখিতে সেই দূরের আলো নিকটবর্ত্তী হইল—আর অগ্রসর হয় না। ভৈরব বুঝিল ডাকাইতেরা আলোক দেখিয়া চিন্তিত হইয়াছে। কিন্তু তখন আর পিছু হটিবার সময় নাই—হটিলেও রক্ষা নাই। কাজেই ডাকাইতেরা দ্রুততর বেগে আসিতে লাগিল। তখন উভয় দলের আলোকে পাহাড়তল দিনের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—গাত্রলোম পর্য্যন্ত দেখা যায়। দেখা গেল, ডাকাইতদলে জন সংখ্যা ত্রিশ জনের বেশী নহে।

তাহাদের সঙ্গে দুইটী মাত্র আলোক—সম্মুখে ও পশ্চাতে। সম্মুখের আলোকধারীর কাপালিক বেশ, দেহ মধ্যমাকৃতি বটে, কিন্তু ভয়ানক বেশ। সে মূর্ত্তি দেখিয়া দূর হইতেই জগদীশ সন্ন্যাসী কাঁপিতেছিলেন—তাঁহার কণ্ঠস্বরে ভৈরব চমকিয়া উঠিল।

"পাপের শাস্তি—নরক—নরক—তুই শাস্তি দিবার—কে ?"

আর কাহারও জগদীশের প্রতি লক্ষ্য ছিল না—কিন্তু ভৈরব বিদ্যুৎবেগে আসিয়া তাঁহাকে ধরিল, কেননা তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া শিলাতলে পড়িতেছিলেন। ভৈরবের ইঙ্গিতে দুইজন পাহাড়িয়া যুবক সন্ন্যাসীকে লইয়া চলিয়া গেল। ভৈরব ক্ষুব্ধ মনে পলকের মধ্যে স্বস্থান গ্রহণ করিল।

এখন, ডাকাইতের দল যতবার পাহাড় বস্তিতে ডাকাইতি করিয়াছে, কখন কোন বাধা পায় নাই। লোভে লোভে তাহারা উপযুক্ত অস্ত্রাদি পর্য্যন্ত সঙ্গে লইতে এখন ঘৃণা বোধ করিত। সুতরাং আজিকার এরূপ শস্ত্রপাণি সেনা সমাবেশ এবং ভৈরবের মত ভীম-মূর্ত্তি সর্দ্দার দেখিয়া তাহারা ভয় পাইয়া গেল। দূর হইতে আলো দেখিয়া একটু সন্দেহ করিয়াছিল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা যে এত গুরুতর তাহা তাহাদের আদবে ধারণা হয় নাই। অতএব পাহাড়িয়াদের প্রথম আক্রমণেই তাহারা বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। ভৈরব

তাহাদিগকে নিশ্বাস ফেলিবার সময় দিল না—বাহুতে এখন তাহার শত যোদ্ধার বল—কণ্ঠে রুদ্ররস মূর্ত্তিমান। পাহাড়িয়াদিগকে উৎসাহিত করিতেছিল—"মা ভবানী সহায়—ডাকাইত তাড়াইয়া স্বর্গের পথ পরিষ্কার কর।" অপেক্ষাকৃত মৃদু স্বরে সাবধান করিতেছিল—"কিন্তু কাহাকেও প্রাণে মারিও না!"

ডাকাইতেরা পিছু হটিতে লাগিল—তাহাদের চেষ্টা কেবল আত্ম-রক্ষার দিকে। ভৈরবও কৌশলাবলম্বন করিল—পাহাড়িয়ারা হঠাৎ নিবৃত্ত হইল। অমনি ডাকাইতেরা যে যে দিকে পারিল, ছুটিয়া পলাইল। একজন কেবল তেমন কাপুরুষের কার্য্য করিল না। সে-ই কাপালিকবেশী। তাহার বামহস্তে মশাল, দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ যষ্টি।

ভৈরবের বুঝিতে বাকী রহিল না যে সেই ব্যক্তি সর্দ্দার। অতএব প্রাণে না মারিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিলে ভবিষ্যতে পাহাড় বস্তি এক কালে নিরুপদ্রব হইবে, ইহা তাহার ধারণা হইল। তখন ভৈরব, গম্ভীর স্বরে, কাপালিককে বলিল—

— "কেন প্রাণে মরিবি, লাঠি ত্যাগ কর্।"

কাপালিক কোন উত্তর না দিয়া ঘৃণার হাসি হাসিল এবং লাঠি ঘুরাইয়া ভৈরবের দিকে অগ্রসর হইল।

তখন আর ভৈরবের ধৈর্য্য রহিল না—পাহাড়িয়ারা দেখিতে দেখিতে দেখিল, কাপালিকের লাঠি কোথায় উড়িয়া গিয়াছে—বাম হস্তের মশাল খসিয়া পড়িয়াছে। আর ভৈরব তাহার বুকে বসিয়া তাহার কণ্ঠে তরবারি স্থাপন করিয়াছে।

ভৈরবের চক্ষে অগ্নি জ্বলিতেছিল, বলিল—"কেমন, এখনি ত প্রাণে মারিতে পারি।"

কাপালিকের চক্ষে পৃথিবী ঘুরিতেছিল। প্রাণের মায়া বড় মায়া—বিশেষ না ভাবিয়া লইল যে কঠোর সাধনা করিয়া করিয়া

সিদ্ধি লাভ যখন ঘনাইয়া আসিয়াছে, তখন এ ভাবে মরাটা বড়ই কষ্টকর! কাপালিক ভৈরবের কাছে করযোড়ে প্রাণ ভিক্ষা করিল।

ভৈরব কাপালিককে ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, বলিল, "প্রাণ ভিক্ষা দিব, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তুই যত জীব হরণ করেছিস্ সকলই ফিরাইয়া দিতে হবে।"

কাপালিক তখনও ভূতলশায়ী। করযোড়ে বলিল—"কেমন ক'রে ফিরাইয়া দিব? সকলই যে ভৈরবীর কাছে বলী দিয়েছি!"

শুনিয়া ভৈরব শিহরিয়া উঠিল, ধীরে ধীরে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"কি! মানুষ পর্য্যন্ত?"

কাপালিক এতক্ষণে উঠিয়া বসিল—বলিল "নর-বলী যে প্রধান বলী, তা কি জান না?

ভৈরবের সে রুদ্র ভাব লুপ্ত হইয়াছিল. করুণায় চক্ষের পাতা কাঁপিতেছিল চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অতি মৃদু কণ্ঠে বলিল.

"কেন, এমন দুষ্কার্য্য করিলে?"

তখন কাপালিক উঠিয়া দাঁড়াইল—গর্জ্জন করিয়া ভৈরবকে মারিতে আসিল—"কি মা ভবানীর বলী দিয়ে দুষ্কার্য্য করেছি! পাষণ্ড—নরাধম! তুই না হয় প্রাণে মারবি.—অমন কথা ফের যদি মুখে আন্‌বি, এই দণ্ডে তোর মুণ্ডপাত করিব!"

পাহাড়িয়ারা রাগিয়া উঠিল, কেহ কেহ কাপালিকের দিকে ঝুঁকিল—কিন্তু ভৈরব রাগের উপর রাগ করিল না। তাহার চক্ষু শূন্যে করুণাময়ী ভবানীমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতেছিল, অর্দ্ধস্ফুট গদ্‌-গদ বাক্যে বলিতেছিল "মা গো অনন্ত দয়াময়ি, তোমার নামে এত পাপ কেন হয় মা?"

কাপালিকের পরুষ কণ্ঠে ভৈরবের চেতনা হইল—তখন

পাহাড়িয়ারা তাহার দিকে ঝুঁকিয়াছে। ভৈরবের ইঙ্গিত মাত্রে তাহারা নিরস্ত হইল। ধীরে ধীরে ভৈরব সুধাইল—

"তোমার নাম কি সন্ন্যাসী ?"

সন্ন্যাসী দাঁত বাহির করিয়া হাসিল—নির্লজ্জের হাসি, তাহাতে কোমলতার নাম মাত্র নাই। এমনি করিয়া পিশাচেরা বুঝি মানুষের হাসি ভ্যাঙ্গাইয়া থাকে !

"তাও জান না ছাই—অত বড় জোয়ানটা—কে আমায় না চেনে ? আমি উদ্ধব কাপালিক !"

ভৈরব শিহরিল। প্রভু তবে স্বপ্নের ঘোরে এই উদ্ধবেরই নাম গ্রহণ করেন—ইহাকে দেখিয়াই আতঙ্কে আজ্‌ তাঁর মূর্চ্ছা হইয়াছিল ! ঘোর আঁধারে মন আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল—কিছুই আর মনে রহিল না। ভৈরব ব্যাকুল চিত্তে প্রভুর কাছে চলিল। মন্ত্রমুগ্ধ সর্পবৎ ক্ষুদ্র সেনাদল তাহার অনুগমন করিল।

উদ্ধব তখন ভাবিল, তাহার নামের গুণে আজ্‌ সে পরিত্রাণ পাইয়া গেল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, পাহাড়ে আর ডাকাইতি করিতে আসিবে না। তখন এদিক ওদিক চাহিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পাহাড় হইতে অবতরণ করিল। সঙ্গীদের অনেকের সঙ্গে পথে দেখা হইল।—উদ্ধব তাহাদিগকে গালি দিয়া আপনার শৌর্য্য-বীর্য্যের অনেক পরিচয় দিল। অম্লান বদনে বলিল, একাই সে সেই রাক্ষসের মত জোয়ানটা আর তার সঙ্গীগুলাকে কাত করিয়া এসেছে ! ভৈরব প্রাণ দিয়াছে বলিয়া মনের কোণেও একবার কৃতজ্ঞতার তরঙ্গ উঠিল না। মূর্খ তান্ত্রিকেরা সযত্নে হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলিকে উৎপাটিত করিয়া ফেলিত। পৃথিবীতে আর কখন কোন সম্প্রদায় বোধ হয় হৃদয়ের উপর এত জোর জবরদস্তি করে নাই। তন্ত্র-শাস্ত্রের এই পৃষ্ঠা দেখিয়া কেহ তাহার বিচার করিও না।

তৃতীয় খণ্ড।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভাবিলে জ্ঞান থাকে না। কোন্ বিচিত্র ধ্যান-ধারণার অতীত নৈতিক নিয়ম বলে প্রকৃতি একজনের পাপে শত শত নিরপরাধীর প্রতি দণ্ড বিধান করেন? রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট, কর্ত্তার দোষে গৃহস্থ নষ্ট—তা কি দৈহিক, কি মানসিক—এ ব্যবস্থা কেন? যথার্থই ভাবিলে জ্ঞান থাকে না। দৈহিক পাপের একটা সীমা আছে—শোণিতের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু মানসিক পাপ? কে কবে তার সীমা নির্দ্ধারণ করিতে পারিয়াছে? তোমরা বল, মানুষের সমাজ ঠিক প্রকৃতির অনুকরণ এবং তাহারই সার্থকতার অনুপাতে আদর্শ সমাজ স্থির হইয়া থাকে। ইহাই যদি সত্য হয়, তবে কেন আজিকার সভ্যতম সমাজ-প্রকৃতির এই অনমুলঙ্ঘনীয় আইনকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া বিধান করিয়াছে, শত জনের মধ্যে নিরনব্বই জন অপরাধী হইয়াও যদি শাস্তি না পায়, ক্ষতি নাই; কিন্তু নিরপরাধীর দণ্ড যেন না হয়! আমি ভগবৎ নিয়মের রহস্য ভেদ করিতে বসি নাই—কেবল কাতর কণ্ঠে সুধাইতেছি, দুর্ব্বল আমরা জীব, কেন বিধাতঃ কঠোর অনন্ত শক্তি নিয়ম চক্রের তলে আমাদের স্থান দিয়াছ?

কি কুক্ষণে জগদীশের পদস্খলন হইয়াছিল; যার সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছেন, তাঁহার পাপপ্রবাহে সকলকেই ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। দুধের মেয়েটা প্রভা—আহা তার কপালে কত দুঃখও ছিল! নিজের মনে নরকের আগুন-রাবণের চিতার মত ত অবিশ্রান্ত জ্বলিতেছে! সন্তান—আত্মজ আত্মজা যাদের নাম—যাদের স্বরূপ আপনারই রূপান্তর মাত্র—তারা বাপ মার পাপে কষ্ট পায়,

এ বিধান কঠোর হইলেও অনিবার্য্য, তা এক প্রকার বুঝিতে পারি, কিন্তু যাহারা আত্মীয় বন্ধু, হিত চিন্তাই যাদের এক মাত্র অপরাধ—মনে করুন, সপরিবারে জগন্নাথ আচার্য্য—এই পাপের ঢেউ তাঁহাকেও স্পর্শ করিয়াছে।

জগন্নাথ প্রভাবতীর হরণ-বৃত্তান্ত যখন শুনিলেন, তখন তিনি ঢাকা অঞ্চলে সবে মাত্র পৌঁছিয়াছেন—ঘটনার পর প্রায় একমাস অতীত হইয়াছে। আজিকার এই রেলগাড়ি এবং তারের খবরের দিনে আমরা ভাবিয়া উঠিতে পারি না যে কাটোয়া হইতে ঢাকার পথ পদব্রজে এত ভয়ানক দীর্ঘ। শুধু পথ দীর্ঘ হইলেও ক্ষতি ছিল না—পথিকের বিপদ পদে পদে। আচার্য্য চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে আবার গৃহে ফিরিলেন। বাটী হইতে যাত্রা করার সময় জগদীশের অস্পষ্ট এবং অমঙ্গল-জনক ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার মনে জাগিয়াছিল—বিপদের সম্বাদে আবার তাহা শতগুণ বলে ফুটিয়া উঠিল। জগন্নাথ চিরদিনের মত সুখ শান্তির আশা বিসর্জ্জন দিলেন। কিন্তু সে সব কোন কথা হরিদাসকে বলিলেন না।

নাপিতবৌর বিশ্বাসঘাতকতার কথা শুনিয়া হরিদাস প্রথমত স্তম্ভিত হইয়াছিল—পরে যে কিছুক্ষণ শিষ্য-বাড়ীতে ছিল, সয়তান মাগীটার সম্বন্ধে অভিধানোক্ত এবং অভিধানবহির্ভূত নানা কথার আলোচনা ছাড়া আর কোন কাজেই মন দিতে পারে নাই। এমনই তাহার মুখ ছুটিয়া গিয়াছিল যে গুরুদেবের বিপদ সম্বাদে অভিভূত হইয়াও শিষ্যেরা সপরিবারে কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। যুবক রামমাণিক্য ছাড়া হরিদাসের রাঢ়দেশের ছাঁকা বুলি আর কেহ বড় বুঝে নাই, কিন্তু রামমাণিক্য ২।৪ বার গুরুগৃহে গিয়াছিল, সে আসিয়া হরিদাসের কানে কানে বলিল—"বাবাজি, একটু চুপ দ্যান্!" স্বয়ং আচার্য্যও কিঞ্চিৎ অধীর হইলেন, বিরক্ত হইয়া

বলিলেন "ও কি ও-ছি! একটু সাবধানে কথাবার্ত্তা কও, মাগীকে গালি দিয়া লাভটা কি?"

হরিদাস রাগিয়া গেল।—"গালি দিয়া লাভ কি? প্রভুই ত আদর দিয়া সয়তানীটার এত আস্পর্দ্ধা বাড়িয়েছেন! নইলে পিসিমা ত তাকে দূরই করে দিয়েছিলেন! আবার বলেন গাল্ দিয়ে লাভ কি? কাজটা কি আশীর্ব্বাদের মত করেছে ঠাকুর?"

জগন্নাথ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"হরি, গালি দিয়া লাভ নাই! সকলই গোপীনাথের ইচ্ছা! চল, বাড়ী ফিরিয়া মেয়েটার যথাসাধ্য অনুসন্ধান করি,—তার পর যা হয় করিব। আমার বোধ হয়, উদ্ধব এর তলায় তলায় আছে! নাপিতবৌকে অত বিশ্বাস করাটা ভাল হয়নি!"

অতএব গালির খরস্রোত কিঞ্চিৎ মন্দীভূত করিয়া আনিয়া হরিদাস আপনার দীর্ঘ শিখা ধীরে ধীরে স্পর্শ করিতে করিতে কথাটা তলাইয়া বুঝিতে লাগিল। কে যেন তার মনের আঁধারে প্রদীপ জ্বালিয়া দিল। সে ইদানীং নাপিতবৌর অনেক আচরণের কোন কারণ ঠিক্ করিতে পারিত না—এক্ষণে সকলই পরিষ্কার বুঝিতে পারিল। কাজেই দুই প্রহর বেলায় যখন নৌকা ছাড়া হইল, তখন হইতে এক প্রহর অবিরাম সে প্রভুর কাছে বসিয়া বসিয়া সয়তান মাগীটার—নাপিতবৌ নামটা মুখে আনিতে হরি এখন বড়ই নারাজ—সয়তান মাগীটার আধুনিক কপটাচরণের খুঁটি-নাটি গল্প ও মধ্যে মধ্যে তৎসম্বন্ধে অতি তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতে-ছিল। আচার্য্য কতক শুনিতেছিলেন কতক বা শুনিতেছিলেন না, কিন্তু কল্যাণপুর হইতে নবাগত কৈবর্ত্তদাস শ্রীমান ষষ্ঠীরাম হাঁ করিয়া হরির গল্পামৃত পান করিতেছিলেন। অতএব হরি প্রভুর অন্য-মনস্কতায় ভগ্নোৎসাহ না হইয়া সহৃদয় শ্রোতা মহাশয়ের কাছে ঘনাইয়া

বসিল। তখন "যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ" মহাকাব্যের সার্থকতা প্রত্যক্ষীভূত হইল।

তখন নৌকা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। প্রতি বৎসর, জগন্নাথ আচার্য্য জল পথে ঢাকা হইতে রাজসাহী আসিতেন। বাটী হইতে ঢাকা আসিবার সময় কতক পথ নৌকায় কতক বা ডাঙ্গা পথে অতিবাহিত হইত। কিন্তু এবার আচার্য্য আরও সোজা পথ খুঁজিলেন—স্থির করিলেন, অধিকাংশ পথ পদব্রজে কাটাইবেন। নহিলে নৌকা পথের বিলম্ব সহ্য হয় না। হরিদাসের সঙ্গে সেই পরামর্শই ঠিক্ করিলেন। কিন্তু মানুষ গড়ে, দেবতায় ভাঙ্গে। বুড়ীগঙ্গা ছাড়াইয়া ধলেশ্বরীর মোহানায় পড়িতে একদিন কাটিয়া গেল। বড় ডাকাইতের ভয়—দুনো ভাড়া কবুল করিয়াও হরি মাঝিদিগকে রাত্রে নৌকা চালাইতে সম্মত করিতে পারিল না। কবিকঙ্কণের সময় বাঙ্গাল মাঝিরা জীবনের চেয়ে "অলদি গুড়ার" বেশী আদর করিয়াছিল, কিন্তু জগন্নাথের দুর্ভাগ্যবশতঃ রজত খণ্ডের চাকচিক্যেও তাহারা ভুলিল না।

স্বরূপগঞ্জের কাছাকাছি আসিয়া দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার সময় মাঝিরা নৌকা বাঁধিল। ঘোর অন্ধকার রাত্রি—কেবল আকাশে বসিয়া নক্ষত্র সুন্দরীরা ধলেশ্বরীর স্বচ্ছ জলে মুখ দেখিতেছিলেন। জগন্নাথের মনেও বড় আঁধার—আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া তিনি ঝুলি হাতে হরিনামে বসিয়া গিয়াছেন। কেননা অনেক কাকুতি মিনতি করিয়াও তিনি মাঝিদিগকে স্বরূপগঞ্জ পর্য্যন্ত নৌকা লইয়া যাইতে স্বীকৃত করাইতে পারেন নাই। হরি বড় রাগিয়া প্রথমত মাঝিদিগকে তাহাদের দেশী ভাষায় গালি দিয়াছিল—এখন রাঢ়ের ভাষায় গজ গজ করিতেছিল।

এমনি করিয়া প্রহর রাত্রি উত্তীর্ণ হইল। তখন সেই নৈশান্ধ-

কারের নীরবতা ভেদ করিয়া শৃগালেরা চীৎকার করিয়া উঠিল—দিক্ দিগন্তে প্রতিধ্বনি সে রবে প্রহত হইল। তখন জগন্নাথ হরিনাম শেষ করিয়া বিশ্রামের উদ্যোগ করিলেন। মাঝি তিন জনের মধ্যে যুবক দুই জন এবং কৈবর্ত্ত-কুলতিলক ষষ্ঠীরামের তখন অর্দ্ধেক রাত্রি। বুড়া মাঝি ঘুমায় নাই কিন্তু ঢুলিতেছিল, মাঝে মাঝে তামাকু সাজিয়া হরিদাসকে খাওয়াইতেছিল। প্রভু শয়ন করিলেন দেখিয়া হরি মাথুর গাহিতে আরম্ভ করিল। তাহার নিজের ইচ্ছা, এই ভাবে অনিদ্রায় রাত্রি কাটাইবে, প্রভুকেও ঘুমাইতে দিবে না। কেননা তাহার মনে বলিতেছিল. রাত্রিটা ভালোয় ভালোয় যাবে না।

কাজেই হরি আত্ম-বিস্মৃত হইয়া গাহিতে পারিতেছিল না। কিন্তু বিপদের আশঙ্কায় তাহার সহজ সুকণ্ঠে মর্ম্মভেদী করুণ রস উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। সেই ঘোর অমানিশি—বিষাদময়ী প্রকৃতি সুন্দরী, ব্রজেশ্বর বিরহে আনন্দময় ব্রজধামেরই অনুরূপ! হায় ভক্তের হৃদয়! জগন্নাথ বিহ্বল হইয়া উঠিয়া বসিলেন। অন্ধকারে কেহ দেখিতে পাইল না, তাঁহার গণ্ড বহিয়া দরদরিত অশ্রুধারা পড়িতেছিল।

এমন সময়ে দূরে শত শত দাঁড় পতনের শব্দ হইতে লাগিল। বুড়া মাঝি উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, এক বাঁক মাত্র তফাতের শব্দ, ডাকাইতের নৌকা সন্দেহ নাই। তখন হরি কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া বুড়া মাঝির সঙ্গে চকিতে পরামর্শ করিল, নৌকা খুলিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য, ছোট নৌকা অনায়াসে দেখিতে দেখিতে এক বাঁক ফিরিয়া স্বরূপগঞ্জের অনেকটা কাছাকাছি হইতে পারিবে—তখন পদব্রজে পলাইয়া গেলেও রক্ষা আছে। মাঝিকে হাল ধরিতে বলিয়াই হরি এক লাফে ঘুমন্ত তিনটা মানুষের উপর পড়িয়া মনের সাধে তাহা-দিগকে একচোট মারিয়া লইল। তাঁহারা হাঁউমাউ করিয়া উঠিয়া বসিলে হরি সময়োচিত সংক্ষেপে বিপদের বার্ত্তা জানাইয়া প্রাণপণে

তাহাদিগকে দাঁড় টানিতে বলিয়া প্রভুর কাছে গেল। এ সব কাজ চক্ষের পলকে সম্পন্ন হইল।

হরি যাহা ভাবিয়াছিল, আসিয়া দেখিল তাহাই হইয়াছে। প্রভু দশার ভাবে মত্ত হইয়াছেন—বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই। তখন কপালে করাঘাত করিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে সযত্নে তাঁহাকে শয়ন করাইল। গদ গদ স্বরে পদধূলি লইয়া বলিল—"ঠাকুর সার্থক ভক্তি তোমার! কিন্তু তোমায় আমি বাঁচাইব! আমি দাস বাঁচিয়া থাকিতে তোমার গায় কাঁটাও ফুটিবে না।" উৎসাহে তাহার শরীরে দ্বিগুণ বলের সঞ্চার হইল। বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ হরি মাঝির কাছে আসিয়া বসিল। নৌকা বেগে ছুটিতেছিল।

কিন্তু সেই শত দাঁড়ের যুগপৎ শব্দ নিকট হইতে নিকটতর হইতেছিল। মাঝি হাল ছাড়িয়া দিল। ডাকিয়া বলিল, "আর বওয়া অনর্থক। নৌকা তীরে বাঁধিয়া পলাইলে প্রাণ বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে।" কিন্তু হরি তাহাতে সম্মত হয় না। তখন মাঝিদের সঙ্গে তাহার বড় কোন্দল বাঁধিয়া গেল। ওদিকে ডাকাইতেরা হাল্লা করিয়া উঠিল। বেগতিক দেখিয়া ষষ্ঠীরাম "বাপরে!" বলিয়া নদী-হৃদয়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

হরির কথা কেহ শুনিল না। ক্ষোভে রোষে তাহার চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতেছিল। দেখিতে দেখিতে নৌকা তীরে লাগিল। যুবক দুইজন সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া তীরে দাঁড়াইল—এবং বুড়া মাঝিকে ভৎর্সনা করিল। কেননা তখন সে জিনিস পত্র গোছাইতে ব্যস্ত হইতেছিল। হরি স্পষ্ট স্বরে বলিল, "মাঝি, আমার এক কথা শোন। কথা না শুনিলে প্রাণে বাঁচিতে পারবে না। আমি ডাকাইতদের বলে দিব, তোমরা আমার প্রভুর যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে এইমাত্র পলাইলে!"

মাঝিরা বড় বিপদে পড়িয়া গেল। ডাকাইতদের নৌকা এত নিকটে আসিয়াছে যে তাহাদের কথাবার্ত্তা স্পষ্ট শুনা যাইতেছিল। প্রাণ রক্ষা হয় না—এ আবার কি বিপদ! বুড়া হরির কথা শুনিতে সম্মত হইল। হরি বলিল,

"প্রভুর আমার মূর্চ্ছা হয়েছে! তোমরা তিন জন ওঁকে ধরাধরি করে ডাঙ্গায় নিয়ে যাও, একটু দূরে শোয়াইয়া রাখিয়া আপনারা পলাইও আমার আপত্তি নেই। তার পর কাল সেই পশু ষষ্ঠীরামটাকে খুঁজে সঙ্গে দিও।"

মাঝি বিস্মিত হইল—"তোমার দশা কি হবে?" হরি পূর্ব্ববৎ স্থির ভাবে বলিল—"যা হয় হবে! আমিও যদি নৌকা ছেড়ে তোমাদের সঙ্গে পলাই, তা হলে প্রভুর প্রাণ রক্ষা হয় না; নৌকায় জনপ্রাণী না দেখিলে ডাকাইতেরা ডাঙ্গায় গিয়ে সকলকে ধরবে। আমরা পলাইয়া বাঁচিতে পারি, প্রভু কিন্তু বাঁচিবেন না। কাজ কি এমন প্রাণে?"

কথা বলিতে হরির শরীর রোমাঞ্চ হইতেছিল। আপনার প্রাণের জন্য তার একবারও ভাবনা হয় নাই। মাঝিরা জগন্নাথকে ধরিয়া তীরে উঠাইল। হরি অলক্ষ্যে প্রভুর গাঁইট স্পর্শ করিয়া দেখিল, টাকাগুলি আছে কি না। মনে বড় আনন্দ হইল, অন্য জিনিস পত্র ডাকাইতে লুটিলেও রাহা খরচের জন্য গুরুদেবকে কষ্ট পাইতে হবে না।

তখন জগন্নাথকে একটু দূরে মাঠের মাঝে গাছ তলায় রাখিয়া মাঝিরা যে যে দিকে পারিল ছুটিয়া পলাইল। এদিকে ডাকাইতের নৌকা আসিয়া পৌঁছিল।

হরিদাস তাহাদের হস্তে বন্দী হইল। নৌকায় জিনিস পত্র যা ছিল, লুটিয়া তাহারা হরিকে মাঝি এবং আর আর চড়নদারের

সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিল। হরি নীরব—কোন কথার উত্তর দেয় না। অনেক প্রহার এবং কটূক্তি নিঃশব্দে সহ্য করিল। একবার কেবল একজন ডাকাইতকে এক চপেটাঘাত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না—কেননা সে গলার কণ্ঠী ছিঁড়িয়া দিয়াছিল!

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

গভীর রাত্রে জগন্নাথ আচার্য্য প্রকৃতিস্থ হইলেন। বিস্মিত বিহ্বল হইয়া দেখিলেন, গাছের গুঁড়ি তাঁহার উপাধান, মাথার উপরে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের জটাজূট সকল ঝুলিতেছে। ঘোর আঁধারে বটবৃক্ষকে ভীম রাক্ষস বলিয়া মনে হইতেছে—তিনি যেন রাক্ষসের কোলে শয়ন করিয়া আছেন। একটা শৃগাল এই মাত্র তাঁহার অঙ্গ আঘ্রাণ করিতেছিল, তিনি চমকিত হইলে লাফাইয়া পলাইল—বৃক্ষতলে পতিত পত্ররাশি পলায়নপরের পদশব্দে মর্ম্মরিত হইল। নিশীথ শীতল বায়ু জগন্নাথের শরীরে আসিয়া লাগিতেছিল। সেই অগ্রহায়ণ মাসের আঁধার রাত্রে আপনাকে এরূপ অভাবনীয় অবস্থায় দেখিয়া জগন্নাথ স্তম্ভিত ও ভীত হইলেন।

প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পরিধানে একমাত্র বস্ত্র—কোঁচার কাপড় খুলিয়া মস্তক ও পৃষ্ঠ আবৃত করিলেন—শীতের কষ্ট কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইল। গাঁইট স্পর্শ করিয়া দেখিলেন সঞ্চিত অর্থ যথাস্থানে আছে—অপহৃত হয় নাই। কিছুই অনুমান করিতে পারিতে-ছিলেন না—কাণ্ডটা ভৌতিক বলিয়াই মনে হইতেছিল। জগদীশের অস্পৃষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী মূর্ত্তিমতী হইয়া চক্ষের সমক্ষে ভাসিতেছিল। হঠাৎ মনে হইল, আজি নৌকায় হরির মাথুর কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে

তিনি বিহ্বল হইতেছিলেন। কিন্তু আর কোন কথা স্মরণ করিতে পারিলেন না।

আচার্য্য শেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে, ধলেশ্বরী নদী অবশ্য নিকটেই আছে—দূরে নদীস্রোতের অস্ফুট কুলু কুলু শব্দ রহিয়া রহিয়া শুনা যাইতেছিল। সৈকত সাধারণ কুশ এবং ক্ষুদ্র বন্য ঝাউর অস্তিত্ব প্রতি পদে অনুভূত হইতেছিল। অতএব তিনি শব্দ লক্ষ্য করিয়া নৌকার অনুসন্ধানে নদীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বাধা পদে পদে—এখানে গর্ত্ত, ওখানে কণ্টক বৃক্ষ। কষ্টের সীমা ছিল না। কষ্ট শারীরিক এবং মানসিক। জ্ঞাতসারে ত কখন কোন পাপ করেন নাই, তবে এ প্রায়শ্চিত্ত কেন? ভক্তের হৃদয় এইখানে অমনি পূর্ব্বজন্মের কল্পনা করে। ভক্তিতেই কবিত্ব। ভক্তিতেই পূর্ব্বলোক এবং পরলোকের জন্ম। ভক্ত জগন্নাথের প্রতীতি হইয়াছিল, এত দিনে তাঁহার পূর্ব্বজন্মকৃত পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে।

হঠাৎ জগন্নাথের শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল—তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। কুশ বনের মধ্যে কিসের উপর তিনি পা দিয়াছেন? আর্দ্র বস্ত্রবৎ—অথচ নড়িয়া উঠিল! তার পর—তার পর সেই দলিত জঙ্গম পদার্থ হইতে মনুষ্যের ক্ষীণ কাতরোক্তি তিনি স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। অমনি মনে হইল, হরিদাস বা নৌকার আর কেহ হয় ত তাঁহারই মত বিপদগ্রস্ত হইয়া সেখানে পড়িয়া আছে। জগন্নাথ ডাকিলেন—"কে এখানে পড়ে গা—হরি না ষষ্ঠীরাম?"

ষষ্ঠীরাম দাঁড়াইয়া উঠিল। ফোঁফাইতে ফোঁফাইতে বলিল, "ঠাকুর এখানে? আমি ভেবেছিলাম ডাকাইতেরা আপনাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।"

ব্যাপার খানা বুঝিতে জগন্নাথের আর বড় বাকী রহিল না। বুঝিলেন, তাঁহার দশার ঘোরে নৌকায় ডাকাইত পড়িয়াছিল—ষষ্ঠীরাম পলাইয়া বাঁচিয়াছে। কিন্তু কে তাঁহাকে গাছতলায় রাখিয়া গেল, হরিদাস এবং মাঝিদের দশা কি হইল, এ সব ষষ্ঠী কিছুই জানে না, কিছুই বলিতে পারিল না। আচার্য্য তাহাদের জন্য বড় উৎকণ্ঠিত হইয়া দ্রুত চলিলেন নৌকার যদি সন্ধান পান। হরি হরি! নক্ষত্রালোকে যতদূর দৃষ্টি চলে, চাহিয়া চাহিয়া কেবল দেখিলেন, ধলেশ্বরীর আঁধার আলোকে মিশামিশি অনন্ত সলিল রাশি, কোথাও নৌকার চিহ্ন মাত্র নাই। তখন জগন্নাথ কাতর অথচ উচ্চ কণ্ঠে বারম্বার হরিদাস, হরিদাস বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কেহ উত্তর দিল না—নদী-হৃদয়ে সে উচ্চরব প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

হতাশ হইয়া জগন্নাথ নদীসৈকতে বসিয়া পড়িলেন—ষষ্ঠীরাম সঙ্কুচিত হইয়া দূরে বসিল। তখন ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে কি উপায়ে পলাইয়াছে।

ষষ্ঠীরাম প্রাণপণে তিনটা ঢোক গিলিল—সঙ্গে সঙ্গে স্থির করিল, সত্য কথা বলা হবে না। তাহার ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছিল, মাঝি তিন জন এবং হরি ডাকাইতের হাতে পড়িয়াছে, অতএব সে মিছা বলিলে ধরা পড়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। ষষ্ঠীরাম সাফ্ বলিল যে বিশ জন ডাকাইত যখন লাফাইয়া নৌকায় পড়িয়াছিল, তখনই সে জলে পড়িয়া গিয়া সাঁতার দিয়া ডাঙ্গায় উঠিয়া পলাইয়াছে। ঠাকুর তার ভিজাকাপড় স্পর্শ করিয়াছেন, অতএব ষষ্ঠীরাম সাফাইয়ের জন্ত বিশেষ ব্যস্ত হইল না। জানিত যে ঠাকুরের কিছুতেই অবিশ্বাস নাই।

এতক্ষণে জগন্নাথের মনে হইল এই অগ্রহায়ণ মাসের শীত, বেচারী ষষ্ঠী ভিজা কাপড়ে কত কষ্টই না পাইতেছে! অন্যমনস্ক

হইয়া সে কথা একবারও ভাবেন নাই বলিয়া মনে মনে বড় লজ্জিত হইলেন। তাহাকে সিক্ত বস্ত্র ত্যাগ করিতে উপদেশ করিলেন। তখন আপনার পরিধেয় বস্ত্রের অর্দ্ধখণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

"করেন কি—করেন কি ঠাকুর" বলিয়া ষষ্ঠীরাম বস্ত্র ছেদনে বাধা দিতে আসিতেছিল, কিন্তু তখন তাহা দ্বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। ষষ্ঠী নিতান্ত অপ্রসন্ন হইল না। আচার্য্য হাসিয়া বলিলেন—"ষষ্ঠী এখন ত তুমি প্রাণে বাঁচ, কাল না হয় ঐ আধখান কাপড়ে উত্তরীয় করিব। বৈরাগীর ত বেশই তাই। এখন কাপড় পরিয়া তুমি আপন মনে একটু ছুটাছুটি কর দেখি, শীত ভাঙ্গিয়া যাবে। আহা! বড় কষ্টই তোমার হয়েচে!"

ষষ্ঠী তাহাই করিল—আর গুরুদেব সেই অগ্রহায়ণের শীতের রাত্রে জলের শীতল বাতাসে কাঁপিতে কাঁপিতে আপনার ভাগ্য আলোচনা করিতেছিলেন। পরিণাম বড় ভয়ানক বলিয়া তাঁহার মনে হইতেছিল।

রাত্রি প্রভাত হইল। কোথায় নৌকা বাঁধা ছিল—কে বলিয়া দিবে? নৌকার চিহ্ন মাত্র নাই। এক স্থানে সিক্ত সৈকতের উপর কেবল কতকগুলি পদ-চিহ্ন দেখা গেল। প্রায় মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত সেইখানে অপেক্ষা করিয়া বিষণ্ণ চিত্তে জগন্নাথ স্বরূপগঞ্জের দিকে চলিলেন। ষষ্ঠীরাম অনুসরণ করিল। ক্ষুধায় তাহার নাড়ী জ্বলিয়া যাইতেছিল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বরূপগঞ্জের বাজারে বড়, গোল—গত রাত্রে সেখানেও ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। ফাঁড়িদার জবরদস্ত খাঁ নামেও যা, কাজেও তা—ফাঁড়ি বাজারের কাছে হইলে কি হয়, শত ডাকাইতের চীৎকার এবং বাজারের লোকের হাহাকার তাঁহার এবং তদীয় সুযোগ্য সহচরবৃন্দের ঘুমন্ত কর্ণে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। সুসভ্য এবং সুশাসিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনেও ফাঁড়ির বংশধর কুম্ভকর্ণগণ নির্ব্বিঘ্নে পরম আরামে নিদ্রা যাইতেছেন—তখনকার বাদসাহী আমলের অপরাধটা কি? প্রভেদের মধ্যে তখন লোকে ভাবিয়া সান্ত্বনা লাভ করিত যে নবাবেরা যেমন সক্ করিয়া আল্‌সে পোষেন, তেমন এই নিদ্রাসিংহ অত্যাচারীর দলকেও প্রতিপালন করা তাঁহাদের নবাবী মর্জ্জী বিশেষ;—এখনকার লোকে বিপরীত বুঝিয়া কেবল অরণ্যে রোদন সার করিয়াছে। তা যেমনই হউক, ভিতরকার খবর এই যে জবরদস্ত খাঁ বাস্তবিক তখনও নিদ্রা যান নাই, তবে "বেতমিজ্ ডাকু লোক" তাঁহার মর্ত্ত্য সুরা ও সাকী ভোগের বড় ব্যাঘাত জন্মাইয়াছিল—কাজেই বিরক্ত হইয়া (ভয়ে নহে) তিনি সদলে প্রায় দুই ক্রোশ পথ সেই শীতকালের নিশীথে পাঁওদলে বড়ই তাড়াতাড়ি হাটিয়া গিয়া হাঁফ্ ছাড়েন। অতএব ভোর হইতে না হইতে ফাঁড়িতে যখন তাঁহার শুভ প্রত্যাগমন হইল, তখন ফাঁড়িদার মহাশয়ের স্বাভাবিক রক্তিম চক্ষু অধিকতর লাল হইয়া উঠিয়া এতালাকারী বীরপুরুষ চৌকিদারবর্গের বিষম ভীতির কারণ হইয়াছিল।

নড়িতে চড়িতে, হেলিতে দুলিতে জবরদস্ত খাঁ যখন ডাকাইতির সুরতহাল করিবার জন্য বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন

বেলা প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বাজারের লোক কম্পিত-কলেবর—ফাঁড়িদার মহাশয়ের প্রথম সম্ভাষণেই বুঝা গেল, কম্পটা নিতান্ত নিষ্কারণ নহে। কেননা নিতাই সরকার, বাজারের প্রধান দোকানী, ডাকাইতেরা যাহার সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়াছে, সে যেমন কাঁদ কাঁদ ভাবে ফাঁড়িদার সাহেবের প্রসাদ-লাভাকাঙ্ক্ষায় দেড়গজি সেলাম করিতেছিল, অমনি তিনি চক্ষু রাঙ্গাইয়া তিরস্কার করিলেন যে এই কাফেরের গোস্তাকির জন্যই বাজারে ডাকাইতি হইয়াছে—ফৌজদার সাহেবের কাছে তিনি আরজ করিবেন, কাফের দোকানদার বাজারে আর স্থান না পায়।

অমনি তাঁহার দুইজন অনুচর নিতাই সরকারকে ধরিয়া পিছমোড়া করিয়া বাঁধিতে যাইতেছিল, জবরদস্ত খাঁ নিষেধ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা আবি রহনে দেও—গারদমে ভেজনে হোগা !"

নিতাই কাঁদিয়া করযোড়ে বলিল—"কি অপরাধ আমার হুজুর ? সর্ব্বস্ব গেল, তার উপর হাজত, মিনি দোষে পেঁয়াজ পয়জার কেন ধর্ম্মাবতার ?"

হুজুর জবা চক্ষু এবং দাড়ি ঘুরাইয়া তাড়া দিলেন—"চুপরও হারামজাদ।" অমনি তাঁহার কারপর্দ্দাজ মহলে 'চুপরও, চুপরও,' রব দশগুণ প্রতিধ্বনিত হইল।

তখন সাক্ষী গ্রহণ আরম্ভ হইল। মুসলমান সাক্ষীরা প্রায় এক বাক্যে বলিল, ডাকাইত পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু নিতাই সরকার তৎপূর্ব্বে খবর পাইয়া টাকাকড়ি সরাইয়া ফেলিয়াছিল। হিন্দু দুই চারিজন মাত্র—খাঁজি সে সাক্ষী লইতেও নারাজ—কেননা কাফেরেরা বড় ঝুঠ বলে এই রকম তাঁহার সংস্কার ছিল। তার উপর এ ক্ষেত্রে তাহারা সকলেই বলিল যে, নিতাই সরকারের এক পয়সাও রক্ষা হয় নাই—অতি কষ্টে পলাইয়া বেচারি প্রাণ বাঁচাইয়াছে, তাও এক বাবাজীর দয়ায়। বাবাজীকে ডাকাইতেরা না কি ধরিয়া

আনিয়াছিল। এই শেষ কয়টা সাক্ষীর জোবানবন্দী লইতে লইতে জবরদস্ত খাঁ অনেকবার আল্লার নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কাফেরদের দুর্নীতিতে রাগান্ধ হইয়া বামহস্তে আপনার অনেকগুলি শ্মশ্রুও না কি উৎপাটিত করেন!

ইহার পর নিতাই সরকারকে একবার গারদঘরে পূরিয়া তাহার অগাধ ধনের কিঞ্চিৎ অংশ গ্রহণের চিন্তায় জবরদস্ত খাঁ মগ্ন হইতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার দুইজন কারপরদাজ তিনটা আসামী আনিয়া হাজির করিল। ইহারা জগন্নাথ আচার্য্যের সেই মাঝি তিন জন। কিন্তু ফাঁড়িদারের সম্মুখে তাহারা ডাকাইত দলের লোক বলিয়া কারপরদাজ মহাশয়দের দ্বারা পরিচিত হইল।

তখন জবরদস্ত খাঁ হুকুম জারি করিলেন যে, উহাদের বুক বাঁশ দিয়া ডল—নহিলে কিছুই কবুল করিবে না। সকলেই ফাঁড়িদারকে খুসী করিতে উদ্যত,—কেহ বাঁশ আনিতে গেল, কেহ কেহ ধাক্কা দিয়া তিন জনকেই মাটীতে ফেলিতে ব্যস্ত হইল, কেহ বা কিল চাপড়ের অজস্র বর্ষণ করিল। বুড়া মাঝি কাতর অথচ উচ্চকণ্ঠে বলিল, "ধর্ম্মাবতার আমরা নিরীহ মাঝি,—ডাকাইতের আমরা সহায়তা করিব কি, আমাদের নৌকাই কাল রাত্রে তাহারা মারিয়া লইয়াছে। দোহাই ধর্ম্মের, আমাদের সুবিচার করুন।" কিন্তু ধর্ম্মাবতারের রাগ তাহাতে আরও বাড়িয়া যাইতেছিল, পার্শ্বচর এবং দর্শকবৃন্দ বুড়া ডাকাত বেটার ভণ্ডামি সহিতে পারিতেছিলেন না। কেবল আর্দ্র নিতাই এই আর্ত্তদের দুঃখ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিল এমন সময়ে সেই জনতার পশ্চাৎ হইতে কে বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিল—

"উহারা নিরপরাধী—ডাকাইত নহে। ধর্ম্মের নামে এমন অবিচার অধর্ম্ম করিও না।"

সকলেই সসম্ভ্রমে চাহিয়া দেখিল, বক্তার বৈরাগীর বেশ—পুষ্ট

নধর গৌরকান্তি, মুখে এবং প্রশস্ত ললাটে পুণ্যের জ্যোতি স্ফুরিত হইতেছে। বিস্মিত মাঝি তিন জন চিনিল, স্বয়ং জগন্নাথ আচার্য্য—ষষ্ঠীরাম সঙ্কুচিত ভাবে তাঁহার পশ্চাতে। জবরদস্ত খাঁ প্রথমে সে বজ্রগম্ভীর স্বর শুনিয়াই কিঞ্চিৎ বিহ্বল হইয়াছিলেন—এক্ষণে বক্তার প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিয়া আপনার অজ্ঞাতসারে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কেমনতর একটা গাম্ভীর্য্য এবং আশঙ্কার ভাব মুহূর্ত্তে সে জনস্রোত শাসিত করিল।

গোঁসাই অগ্রসর হইয়া জবরদস্ত খাঁকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দারোগা সাহেব, ইহারা নিরপরাধী—আমার মাঝি—ডাকাত নহে। ইহাদিগকে পীড়ন করিতেছ কেন?"

হিন্দুর দল এতক্ষণ নীরবে সকল অপমান সহিতেছিল, হঠাৎ জগন্নাথ আচার্য্যকে দেখিয়া তাহাদের সাহস বাড়িয়া গেল। ফাঁড়িদারকে দেখিয়া যাহারা পলাইয়াছিল, তাহারাও আসিয়া জুটিল। আচার্য্যকে তাহারা মহাপুরুষ ভাবিয়া লইল—মহাপুরুষ মুসলমান-দৈত্যের হাত হইতে আর্ত্তদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য তদ্দণ্ডে সেখানে আবির্ভূত হইয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে জগন্নাথকে ঘিরিয়া ৩। ৪ শত হিন্দু দাঁড়াইয়া গেল—কারো হাতে দোকানের বাঁশ, কারো হাতে লাঠি। সঙ্গে সঙ্গে "মার মার" শব্দ উত্থিত হইল—বেগতিক দেখিয়া মুসলমানদল ভাগিতে লাগিল! জবরদস্ত খাঁর পলক ফেলিবার সময় ছিল না। নিতাই সরকার পার্শ্ববর্ত্তী দোকানদারের হাত হইতে বাঁশ কাড়িয়া লইয়া খাঁ সাহেবের মাথায় মারিয়া বসিল। "তোবা তোবা" বলিতে বলিতে ফাঁড়িদার সেই জনস্রোতের পদতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

এই ঘটনা এমত আকস্মিক এবং এত শীঘ্র ঘটিল যে, জগন্নাথের ইহাতে কোনই হাত ছিল না। খাঁ সাহেবকে তিনি মিষ্ট কথায়

পরপীড়ন হইতে নিবৃত্ত করিবেন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য, কিন্তু তাঁহার অনুরোধ শেষ হইতে না হইতে জবরদস্ত খাঁ মস্তকে আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন। নিতাই সরকার আবার বাঁশ উচকাইয়াছিল, আরও দুখানা বাঁশ, দু একগাছ লাঠি মূর্চ্ছিত ফাঁড়িদারের দিকে পড়িবে পড়িবে করিতেছিল। জনস্রোত হইতে গগনভেদী "হরিনাম" উঠিতেছিল। জগন্নাথ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চকিতে সেই বিপন্ন যবনের পার্শ্বে বসিয়া আত্ম-শরীরের দ্বারা তাহার শরীর আবৃত করিলেন। হাতের বাঁশ হাতেই রহিয়া গেল—চিত্রার্পিত মূর্ত্তিবৎ সহসা সেই জনকল্লোল গোঁসাই ঠাকুরের আচরণ লক্ষ্য করিতে লাগিল।

বুড়া মাঝি আপনার উত্তরীয় দিল, ষষ্ঠীরাম কাছের দোকান হইতে তাড়াতাড়ি এক ঘটি জল আনিল। তখন জগন্নাথ সযত্নে জবরদস্ত খাঁর মাথা বাঁধিয়া দিয়া রক্তস্রোত বন্ধ করিলেন। চারজন চৌকিদার গোঁসাই ঠাকুরের হুকুমে মূর্চ্ছিত ফাঁড়িদারকে ধরাধরি করিয়া গৃহে লইয়া গেল। সে ক্ষেত্রে সর্ব্বময় প্রভু—গোঁসাই ঠাকুর, সকলেই তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে উৎসুক। এক একটা মানুষের এমনই প্রভাব!

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

খাঁ সাহেবের গতি করিয়া গোঁসাই ঠাকুর তাঁহার অপরিচিত আকস্মিক পরমভক্তমণ্ডলীর দিকে ফিরিলেন। দেখিতে দেখিতে দল পাতলা হইয়া আসিয়াছিল—কেননা কাজ বড় সঙ্গীন হইয়া গেছে! যে সে নয়, নবাবের শান্তিরক্ষক স্বয়ং ফাঁড়িদার জখম হইয়া-

ছেন! সাময়িক উত্তেজনার ঘোরে হিন্দু দোকানদারদের মধ্যে যে যে বাঁশ এবং লাঠি হাতে করিয়াছিল, ফাঁড়িদারকে ভূমিশায়ী হইতে দেখিয়া পরক্ষণেই তাদের অনেকেরই দোকানী হিসাবি বুদ্ধি পরামর্শ দিল—য পলায়তি স জীবতি! অতএব জগন্নাথ আচার্য্য দেখিলেন তাঁহার কাছে জন ১০।১৫ মাত্র লোক দাঁড়াইয়া আছে, তার মধ্যে আমাদের খাঁ সাহেবের পীড়িত এবং পীড়াদায়ক নিতাই সরকার একজন, এখন শূন্য অস্ত্রপাণি—কেননা বাঁশখানির মহাজন, পাছে সেই নির্জ্জীব উদ্ভিদ্ খণ্ড তাঁহার কপালগুণে প্রাণ লাভ করিয়া আজিকার পাপের সহায়কারী বলিয়া তাঁহাকে সনাক্ত করিয়া দেয়, এই ভয়ে বা বিস্ময়ে রণজয়ী বীর পুরুষকে নিরস্ত্র করিতে দ্বিধা জ্ঞান করেন নাই। জগন্নাথ গম্ভীর মুখে সকলের দিকে চাহিতেছিলেন, এমন সময় বুড়া মাঝি আসিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল।

ষষ্ঠীরামের পিত্ত পড়িয়া গিয়াছিল—কোথায় বাজারে গিয়া আহার এবং শয়ন, না কোথায় দাঙ্গা হাঙ্গামা! তার উপর বুড়া মাঝি যখন প্রভুর কাছে আসিল, তখন সব ভুরই ত ভাঙ্গিয়া যায়! ষষ্ঠী মনে মনে দেবতাদিগকে ডাকিতে লাগিল—"হে ঠাকুর, এখনি এখানে একটা নদী আনিয়া দাও, আমি কাল রাত্রের মত ঝাঁপ দিয়া পড়ি!" ঠাকুরের কানে সে কথা পৌছিয়াছিল বোধ হয়—কেননা তিনি বুদ্ধিমান ভক্তের প্রার্থনাটুকু অক্ষরে অক্ষরে গ্রাহ্য করিতে না পারুন, বুড়া মাঝিকে বেশী কথা বলিতে দিলেন না। অতি সংক্ষেপে দুটো বা কথায় দুটো বা ইশারায় বুড়া গোঁসাই ঠাকুরকে রাত্রের স্থুল কথা বুঝাইয়া দিল। তখন ঠাকুর নিতাই সরকারকে কাছে ডাকিলেন।

নিতাই নিতান্ত মরিয়া হইয়াছিল,—সে জানিত, যে কাজ সে আজ করেছে, মুসলমানের রাজ্যে তার শাস্তি বড় ভয়াকন

জবরদস্ত খাঁর পতনের অবসরে সে যে প্রাণ বাঁচাইবার একটা উপায় দেখে নাই, তার এক মাত্র কারণ গোঁসাই ঠাকুরের উপস্থিতি। তাহার ধ্রুব জ্ঞান হইয়াছিল যে, এই মহাপুরুষের শরণাপন্ন হইলে বিপদ থাকিবে না। সুতরাং জগন্নাথের আহ্বানে কৃতার্থ হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিল।

আচার্য্য মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমারই ঘরে কাল ডাকাতি হয়েছে?"

"আজ্ঞে দেবতা," বলিয়া নিতাই সভয়ে গোস্বামী এবং পাশের লোকেদের দিকে চাহিল। জগন্নাথ বুঝিলেন, এত লোকের সাক্ষাতে তাহাকে বেশী কথা সুধান, ইহা তাহার ইচ্ছা নহে। নিতাই পুনশ্চ বলিল, "এত দয়াই যদি করলেন দেবতা, তবে আমার দোকানে একবার পায় ধূলো দেন।—আমার সোণার দোকান, ডাকাতরা ছারখার করে গেছে ঠাকুর।"

কথা বলিতে নিতাইএর চোখে জল আসিল। জগন্নাথ কোন কথা কহিলেন না—দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্থির স্বরে ডাকিলেন, "গোপীনাথ!" সে কণ্ঠস্বর শুনিয়া নিতাই চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। আচার্য্য তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন—মাঝি তিন জন এবং ষষ্ঠীরামও চলিল। এতক্ষণে ষষ্ঠী নৈরাশ্য-সাগরে কূলকিনারা দেখিতে পাইতেছিল।

* * * *

পর দিন প্রভাতে গোস্বামী ষষ্ঠীরামকে নিকটে ডাকিলেন। নিতাই সরকার কাছেই বসিয়া ছিল। ঠাকুরের ভার ভার মুখখানা দেখিয়াই ষষ্ঠীর প্রাণ উড়িয়া গেল। বুঝিল, মাঝিরা বিদায় হইবার সময় সব কথা তাঁহাকে বলিয়া গিয়াছে। জগন্নাথ কঠোর কণ্ঠে বলিলেন, "ষষ্ঠী! তুমি প্রাণের ভয়ে নৌকা হইতে ঝাঁপ দিয়া

পড়িয়াছিলে, সে কথা গোপন করিয়া আমার কাছে মিছা বলিয়াছ কেন ?"

ষষ্ঠী নিরুত্তর।

জগন্নাথ আবার বলিলেন, "আর হরিদাস আমার প্রাণ বাঁচাইবার জন্য নিজে ডাকাইতের হাতে বন্দী হয়েছে! তোমার ভক্তি নাই—প্রাণের এত ভয়! আমি আর তোমার মুখ দেখিব না। বাড়ী ফিরে যাও, হরিদাসকে না লইয়া আমি গৃহে যাব না। এই খরচপত্র লও।"

এই বলিয়া ঠাকুর অর্থে পূর্ণ গেঁজেটী ষষ্ঠীর দিকে ফেলিয়া দিলেন। গুরুদেব চির দিনের জন্য ত্যাগ করিলেন বলিয়া ষষ্ঠী অবশ্য অতিশয় দুঃখিত হইল, চক্ষু ছল ছল করিতেছিল, কিন্তু টাকার গেঁজে ঝনাৎ করিয়া কাছে আসিয়া পড়াতে দুঃখের মাত্রা তৎক্ষণাৎ কমিয়া গেল। ষষ্ঠীরাম মুহূর্ত্তে মনে মনে ভাবিয়া লইল—"যা হোক্ অদেষ্টটা ভাল! আপনি বাঁচলে বাপের নাম, হরিকে ধরে নিয়ে গেল, আমি ত বেঁচে এলাম। তার পর রাতে যখন শীতে মরি, তখন ঠাকুর আধখানা কাপড় ছিড়ে দিলেন। এখন ঠাকুর রাগ করচেন বটে, কিন্তু অত গুলা টাকা বেশী, না রাগ বেশী!" ইহার উপরও কথা ছিল। ষষ্ঠী ইহাও ভাবিল যে ঠাকুর এখন ত্যাগ করিলেন, বাড়ী গিয়ে মা-ঠাকুরাণীদিগকে বলে কয়ে তাঁর গোসা দূর করাব। কিন্তু কৈবর্ত্ত-কুলতিলক নিজের মতই বিচারটা করিলেন, তাঁহার জানার সম্ভাবনা ছিল না যে তাঁর মাটীর মানুষ গুরুদেবে কঠোরতার অভাব ছিল না। কালিদাস রঘুবংশের রাজার গুণ বর্ণনায় বলিয়াছেন—ভীমকান্ত! চৈতন্যদেবও তাহাই ছিলেন। জগন্নাথ তাঁহার আদর্শ দেবের ছোট হরিদাস বর্জ্জন মনুষ্যজীবনে অবশ্যম্ভাবী এবং অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য জ্ঞান করিতেন।

ষষ্ঠী প্রভুর কোন কথার উত্তর দিতে সাহস করিল না, কিন্তু নিতাই সরকার তাহার হইয়া গোঁসাই ঠাকুরের দিকে দুই চারিবার ভীত অথচ সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। বুঝিয়া জগন্নাথ বলিলেন, "নিতাই, আমার শিষ্যদের মধ্যে এমত কাপুরুষ কেহ আছে আমি জানিতাম না। এখন দেখিতেছি, আমার শিক্ষা-দীক্ষায় ধিক্। বিপদের সময় যে আপনা লইয়াই শুধু ব্যস্ত তার ভক্তিমাত্র নাই। নিজের ছেলে হইলেও আমি এমন পাষণ্ডের মুখ দেখি না।" ক্ষোভে রোষে গোস্বামীর চক্ষে অগ্নি জ্বলিতেছিল।

সেই দিন মধ্যাহ্নে নিতাই সরকার জগন্নাথ আচার্য্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। অপরাহ্নে তাহাকে সঙ্গে করিয়া তিনি ফাঁড়িদারকে দেখিতে গেলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সমস্ত রাত্রি ফাঁড়িদার মহাশয় অজ্ঞানাবস্থায় ছিলেন, প্রভাতালোকের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। ক্ষীণ জ্যোতির মত যখন জ্ঞানের প্রথম সঞ্চার হইতেছিল, তখন তাঁহার মনে জগন্নাথ আচার্য্যের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল। সে মূর্ত্তি প্রকৃতমূর্ত্তির চেয়ে কিছু ভিন্ন—সেই হাস্যে গাম্ভীর্য্যে মাথামাখি নধর গৌরকান্ত পুরুষই বটে, তবে ইহাঁর শিরোদেশ হইতে একটা অলৌকিক আলো বিকীর্ণ হইতেছিল। জবরদস্ত খাঁ এখন বড় ক্ষীণ, শরীর মন উভয়ই বড় দুর্ব্বল। এ অবস্থায় প্রাণের ভয় কিছু গুরুতর হইয়া উঠে। খাঁ জি মনে মনে পীর প্যাকম্বরগণকে সসম্ভ্রমে বিদায় দিয়া হৃদয়-মন্দিরে গোস্বামীর মূর্ত্তিখানি স্থাপিত করিলেন। অতএব

তাঁহার খানসামা পথ্যের সময় যখন হিন্দুর অখাদ্য সকল তাঁহার সমক্ষে আনিয়া উপস্থিত করিল, তখন তিনি লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু বারম্বার শিরসঞ্চালন করিলেন। পরে চৌকীদারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গোঁসাই ঠাকুর চলিয়া গিয়াছেন, কি আছেন? আছেন শুনিয়া জবরদস্ত খাঁ তাঁহার দোস্ত রহিম সেখকে—ইনি এক পেয়ালার ইয়ার—ডাকিয়া তাহার কানে কানে বলিলেন—"হেঁদু হলেই বা, গোঁসাইকে একবার দেখে এস না। খাতিরের ত্রুটি করো না। যদি একবার আমার কাছে আন্‌তে পার, সে ফিকিরও দেখ।" অতএব জগন্নাথ অপরাহ্নে স্নিগ্ধ বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে সেই যবন রোগীর শয্যা পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন।

খাঁ জির আনন্দের সীমা ছিল না। স্বাগত কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর তিনি গোস্বামীকে করযোড়ে বলিলেন,

"গোঁসাই জি, কাল আপনা হ'তেই অপঘাত মৃত্যুর হাত এড়ায়েছি। আপনি সাক্ষাৎ দেবতা, আপনাকে দেখে আমার হেঁদুর উপর শ্রদ্ধা হয়েচে। আমার একটা সদ্গতি কর্‌তে পারেন?"

জগ। কি সদ্গতি বাপু! আপনার ধর্ম্মে থেকে ভক্তি কর্‌তে শেখ, আর এই সব অত্যাচার ছাড়, আল্লা তোমার সদ্গতি কর্‌বেন।

খাঁ জি। (ঢোক গিলিয়া) সে ত সাচবাৎ ঠাকুর! আমি বল্‌চি কি, আপনি কেন আমায় চেলা করুন না। আপনি ফকীর, ফকীরের ত এ রীত আছে। হেঁদুর কি নেই?

জগ। আছে বাপু! আমরা মুসলমানকেও শিষ্য করে থাকি। তোমার জেতের শিরোমণি যবন হরিদাসকে মহাপ্রভু পরম ভক্তি করতেন। কিন্তু তুমি প্রাণীহিংসার লোভ সাম্‌লাতে পার্‌বে?

খাঁ জি। পার্‌ব না কেন গোঁসাই জি। কোন্ কাম দুনিয়ায় না পারি? কিন্তু প্রাণীহিংসেটা কি?

জগ। এই গোস্ত খাওয়া। জবাই আমাদের মতে বড় দুষ্য। জীব সব সমান। সবাইকে প্রেমের চখে দেখতে হবে। পারবে তা ?

খাঁ জি। ওহো—তা—তা ঠাকুর, তুমি যা হকুম করবে সকলই পারব। মনস্থির করেছি! চখে চখে কেবল তোমার রূপ দেখ্‌চি—তুমি আমার সদ্গতি কর। প্যাঁজ গোস্তে আর রুচি নেই।

জগ। নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন। এই সদ্বুদ্ধি দিবেন বলেই তিনি তোমায় আহত করে বিপন্ন করেছিলেন। আচ্ছা, তোমায় মন্ত্র দিব। কিন্তু আজ না, সাত দিন পরে। এ সাত দিন আমি আমার ভৃত্য হরিদাসের অনুসন্ধানে নিযুক্ত থাকব। কাল ডাকাইতেরা তাহাকে ধরে নিয়ে গেছে। এ কয়দিন তুমি পরম সংযমী হয়ে বাস করবে। তাতে তোমার শরীরও ভাল হবে। বাহ্যে জীবহিংসা করবে না—অন্তরেও না। পরম শক্রকেও বিনীত ভাবে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করবে। আমাদের মধ্যে দন্তে তৃণ ধারণ করার রীতি আছে! বিনয় এতদূরই হওয়া চাই।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় আচার্য্য স্বরূপগঞ্জ ত্যাগ করিলেন। নিতাই সঙ্গে যাইতে চাহিল, কিন্তু তিনি নিষেধ করিলেন। নিতাই গোপনে তাঁহাকে বলিয়াছিল যে ডাকাইতেরা যাহা লুটিয়াছে, তাহা তাহার ধনের সামান্যাংশ মাত্র—গৃহে তাহার অপ্রতুল নাই। অতএব আচার্য্য তাহাকে কিছু দিনের জন্য গৃহে বাস করিতে আদেশ করিয়া গেলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই অগ্রহায়ণ মাসের সন্ধ্যাকালে এক বস্ত্রে গোস্বামী স্বরূপগঞ্জ ত্যাগ করিলেন, হস্তে কপর্দ্দক মাত্র সম্বল নাই। নিতাই একবার সাহস করিয়া গাত্রবস্ত্র কিনিয়া দিতে গিয়াছিল, কিন্তু প্রভুর অধরোষ্ঠের কুঞ্চিত ভাব দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল। ততক্ষণ জগন্নাথ হরির পরিণাম ভাবিয়া অধীর হইতেছিলেন। গোপীনাথ এ দুদিন তাঁহার আহার যোজনা করিলেন, কিন্তু ডাকাইত হস্তে হরির কি হইতেছে? ভক্তবৎসল কি ভক্তের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন না? ভগবানের উপর পূর্ণ নির্ভর সত্ত্বেও আচার্য্য বিচলিত হইলেন। আপনাকে ঘোর স্বার্থপর ভাবিয়া তিনি আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইতেছিলেন।

"এ দুদিনে ডাকাতেরা না জানি হরিকে কতদূরে লইয়া গিয়াছে—হয় ত প্রাণে মারিয়া ফেলিয়াছে। সব কাজ ফেলিয়া কি অনুসন্ধান করিলে এ দুদিনে হরিকে উদ্ধার করিতে পারিতাম না? কিন্তু এ দিকেও আর্ত্তের ত্রাণ—আমি কি করিব? ভক্তবৎসল কি ভক্তের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন না?"

অন্ধকারে অজানা পথে হরিনাম জপ করিতে করিতে জগন্নাথ মাঝে মাঝে এইরূপ ভাবিয়া ক্ষীণ আশায় বুক বাঁধিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারই প্রাণরক্ষার জন্য হরি যে আপনার প্রাণ বলি দিয়াছে, সর্ব্বোপরি এই চিন্তা ক্ষণমাত্র মনে উদয় হইলেই তিনি অধীর হইতেছিলেন। রাশি রাশি অন্ধকার আসিয়া সন্ধ্যার আঁধার ঘনতর করিয়া তুলিল—ক্রমে রাত্রি অনেক হইয়া উঠিল! আলোকের মধ্যে আকাশ-সুন্দরীর তারকারাজির স্তিমিত জ্যোতি, আর আঁধার

পৃথিবীর গায় চঞ্চল খদ্যোৎদের ক্ষীণ আলো। গোস্বামী ক্রমে পথ ভুলিয়া বিপথে চলিলেন। রাত্রি প্রহর উত্তীর্ণ হয় হয়,—শৃগালেরা কোলাহল করিয়া জানাইয়া দিল। তখন এক প্রকাণ্ড বৃক্ষবাটিকায় তাঁহার গতি রোধ হইল।

ভ্রম বুঝিতে পারিলেন বটে, কিন্তু সংশোধনের উপায় ছিল না। এ আঁধারে কোথায় পথ, কেমন করিয়া জানা যাইবে—কে বলিয়া দিবে? ফিরিতে প্রবৃত্তি হয় না। তখন স্থির করিলেন, বৃক্ষতলে বসিয়া হরিনাম করিয়া রাত্রি কাটাইবেন—প্রভাতালোকের সঙ্গে সঙ্গে আবার হরিদাসের অনুসন্ধানে যাত্রা করিবেন।

এই স্থির করিয়া গোঁসাই আঁধারে বৃক্ষকাণ্ড স্পর্শ করিয়া রাক্ষস-বেশী অশ্বত্থ গাছের মূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং অবিরাম হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন। শীতে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু হৃদয়ের উষ্ণত্ব যার অনির্ব্বাপ্য, বাহিরের শীতে তাহাকে কত অভিভূত করিবে? ক্রমে এমনি করিয়া দুই প্রহর রাত্রি উত্তীর্ণ হইয়া গেল। তখন উত্তর দিকে বহুদূরে একটা ক্ষীণ আলো দেখা গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে অস্পষ্ট গানের সুপরিচিত স্বর-লহরী ক্রমে স্পষ্টতর হইয়া সেই বনরাজি কম্পিত করিয়া তুলিল। হরিনাম ভুলিয়া উৎকর্ণ হইয়া ভক্ত জগন্নাথ সে গান শুনিতে লাগিলেন। গায়ক স্বয়ং হরিদাস।

দুঃখের যত দুঃখই থাক, তার একটা অতলস্পর্শী গাম্ভীর্য্য আছে, কিন্তু সুখের একটা মর্ম্মগত চাপল্য আছে, যাহা স্বয়ং চাণক্যকেও অধীর করিয়া তুলে। এ সংসারে সুখের চেয়ে দুঃখের প্রভাবটাই যে বেশী, এ সত্যের অন্ততর অর্থ বুঝিতে পারি না। আজি এই নিশীথে অগ্রহায়ণ মাসের নবীন শীতে অনাবৃতদেহ, বৃক্ষতলবাসী আচার্য্যের, বলিতে গেলে, দুঃখের সীমা ছিল না। ভক্ত ভাবুক সন্ন্যাসী বৈষ্ণবে

কথা যাই বল, তোমার আমার কাছে এর চেয়ে বেশী দুঃখ আর কি হইতে পারে? কিন্তু হরির চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর জগন্নাথের কর্ণে প্রবিষ্ট হইতে না হইতে আনন্দে তিনি অধীর হইলেন। প্রথম উচ্ছ্বাসে এমনি অসংযত হইলেন যে ইচ্ছা ছুটিয়া গিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করেন, কিন্তু পর মুহূর্ত্তে বুঝিয়া আপনি ক্ষান্ত হইলেন। তখন কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই আলোর দিকে চাহিয়া চাহিয়া হরিদাসের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সে যে আজ বিপন্নাবস্থায় নহে, গানেই তাঁহার প্রতীতি হইল। দেখিতে দেখিতে আলো নিকটবর্ত্তী হইল। দেখা গেল, লোক দুইজন মাত্র, মশাল-বাহককে গোঁসাই চিনিতে পারিলেন না, কিন্তু হরির সেই ব্যস্তবাগীশ ভাব, সেই চারিদিকে সজাগ দৃষ্টি গানের ভিতরও তাহাকে ত্যাগ করে নাই। ক্রমে তাহারা সেই অশ্বত্থ গাছের কাছে আসিল, আঁধারে বৃক্ষপত্র সব প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিল—কিন্তু বৃক্ষের অন্য পার্শ্ব বেড়িয়া তাহারা ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া চলিল।

কাজেই গোঁসাই ঠাকুরকে সাড়া দিতে হইল। প্রথমে গলাথ আওয়াজ—কে তা শোনে? হরির গান পঞ্চমে চড়িয়া আর সব শব্দ ডুবাইয়া দিয়াছিল। কাজেই ঠাকুর গদগদ কণ্ঠে ডাকিলেন—"হরি, ও হরি, আমি এখানে!"

হরির গান থামিয়া গেল, সে চমকিয়া দাঁড়াইল। বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত্ত অতীত হইলে সে মশালধারীর গা টিপিল—তখনও এই মাত্র শ্রুত গম্ভীর কণ্ঠের প্রতিধ্বনির শেষটুকু তাহার কানে বাজিতেছিল। হরি এদিক ওদিক আশঙ্কার চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, তাহার ভূতের ভয় আঠার আনা জাগিয়া উঠিল। মশালের আলোয় তাহার মুখের ভাব সবটুকু দেখা যাইতেছিল—গুরুদেব উচ্চহাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

মশালধারীতে আর হরিতে অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টির দান প্রতিদান চলিতে লাগিল—গোঁসাই সেটা লক্ষ্য করিয়া কথঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইলেন। তাহাদের তখনকার যে রকম, তাহাতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলায়ন অসম্ভব নহে। কাজেই উপর্য্যুপরি আরো দুইবার হরিকে ডাকার পর তাঁহাকে বলিতে হইল যে তিনি জগন্নাথ আচার্য্যই বটেন, ভূত নহে! তখন আর ভ্রম রহিল না।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

তখন প্রভু-ভৃত্যে গুরু-শিষ্যে "ভুজে ভুজে নিবিড় বন্ধনের" পালা! আমাদের চক্ষে এ বেয়াদবির মাপ নাই, কিন্তু এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও বৈকুণ্ঠ বৈষ্ণবেরা ইহার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। হরির সেই লাঠির মাথায় তলপী, তার চেয়ে একটু যেন আকারে বড়, ডাইন কাঁধের উপর তেমনি ভাবে রক্ষিত, আর অনাবৃত দেহ সৌম্যমূর্ত্তি গুরুদেবের গণ্ডে অশ্রুর অজস্র ধারা—দুই দেহ একত্র—"ভুজে ভুজে নিবিড় বন্ধন!" আর এই সব দেখিয়া সেই বিস্মিত মশালধারীর মুখেও একটা আনন্দের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার সবে নূতন প্রেমোচ্ছ্বাস, তারও গণ্ডে অশ্রু-প্রবাহ! সে মশাল ধরিয়া চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়াইয়া! মশালের আলো তার বাম প্রকোষ্ঠে আর বাম ওষ্ঠ ও ললাটে পড়িয়া তাহার আনন্দ জ্যোতি পূর্ণ বিকশিত করিতেছিল! হরির পিঠের দক্ষিণ দিক আর তলপীর মাথায় আলো পড়িয়াছিল,—আর জগন্নাথের প্রসন্ন আননের উপর সবটা পড়িয়া আলো আপনার জন্ম সার্থক

জ্ঞান করিতেছিল। গাছেরা সব নীরবে বিষণ্ণ প্রেতভাব ছাড়িয়া পত্রে পত্রে আনন্দ জ্যোতি মাখিয়া এ দৃশ্য দেখিতেছিল। আমার বলিতে লজ্জা নাই যে, চিত্রকর হইলে আমি আমার সুসভ্য শিক্ষিত বন্ধুদের হাসি তামাসার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া ইহার একটা চিত্র আঁকিয়া লইতাম!

কোলাকুলি শেষ হইলেই হরি তাড়াতাড়ি তলপী খুলিয়া ফেলিল। এই দুদিনেই সে এক নূতন বনাত উপহার সংগ্রহ করিয়াছিল, নিজের মোটা চাদর গায়ে দিয়া সে ময়লা হওয়ার ভয়ে লাল টুকটুকে বনাতখানি পাঁচ পরদা কাপড়ে সযত্নে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। গুরুদেবকে বস্ত্রবিহীন দেখিয়া সে তাহাই তাঁহার গায়ে দিয়া দিল—তাঁহাকে কথা কহিবার অবকাশ দিল না। তখন প্রভু শিষ্যের দিকে স্মিত মুখে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অপর লোকটী কে?

মশালধারী সেই বৃক্ষমূলে মশাল রাখিয়া গোঁসাইর পদে লুটিতে লাগিল—প্রাণের পূর্ণ ব্যাকুলতা প্রকাশের যোগ্য এমন ভাষা আর নাই! হরি বলিল "প্রভো, সবই তোমার কৃপা! ইহার নাম হরিশ বাগ্দী—এ দেশের ডাকাতদের প্রধান সর্দ্দার এ! আমাদের নৌকা এর দলই লুট করেছিল। আজ তোমার আশীর্ব্বাদ আর কৃপায় হরিশ ভক্ত বৈষ্ণব, আমায় তোমার চরণে ফিরাইয়া দিতে যাইতেছিল।"

গোঁসাইর চক্ষে আবার নূতন করিয়া ধারা ছুটিল। একটু পরে অশ্রু সম্বরণ করিয়া প্রভু গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "হরি, ধন্য আমি তোমার মন্ত্রদাতা, আমার গুরুগিরি এতদিনে সার্থক হইল। তুমি এই হরিশকে ভক্তিবলে নূতন জীবন দিয়াছ!

হরিও না কাঁদিবে কেন? সেও বাষ্প গদগদ স্বরে বলিল "প্রভো!

হরিশ কাঁদিয়া আকুল, ওকে পাপ মুক্ত কর প্রভো! ওর পাপ আমায় দাও, আমি বহন করিব। ওকে উদ্ধার কর তুমি!”

গুরু বলিলেন “হরি, একদিন ভক্তপ্রধান বাসুদেব মহাপ্রভুকে এই রকম কথা বলেছিলেন। সে মহাবাক্য মনে হলে আমি অভি-ভূত হই! বাসুদেব বলিলেন,—প্রভো, সকল জীবের পাপ আমার মাথায় দাও, তাদের ভবরোগ দূর কর, তাদের পাপ গ্রহণ করে আমি নরক ভোগ করি! মহাপ্রভু উত্তর করেছিলেন,—ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ করাই কৃষ্ণের কাম্য, তা ছাড়া তাঁর অন্য কাজ নাই। তোমার উপর তাঁর সম্পূর্ণ প্রসাদ—তোমার ভিক্ষা তিনি সত্য করেছেন। তুমি ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীবের উদ্ধার কামনা করিলে, বিনা পাপ ভোগে সবার উদ্ধার হবে! তিনি সর্ব্ব বলে বলী, তোমায় পাপ ভোগ করিতে হবে কেন?” কথা বলিতে জগন্নাথের শরীরে রোমাঞ্চ হইল, তিনি বাষ্প ভরে নীরব হইলেন!

প্রভু আবার বলিতে লাগিলেন—“হরি, তোমার ভিক্ষা কৃষ্ণচরণে পৌঁছিয়াছে—তুমি ভক্তপ্রধান! হরিশের প্রেমের সীমা নাই, সে উদ্ধার হয়েছে! সার্থক ভক্তি তোমার—আমি তোমার অযোগ্য গুরু! আমার হৃদয় এত প্রশস্ত আজও হলো না—এমন মহাবাক্য আমার কণ্ঠে কখন উদয় হয় নাই। ধন্য আমি তোমার মন্ত্রদাতা!” তখন জগন্নাথ সেই ধূলিবিহারী, পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত বাগদী হরিশকে সযত্নে তুলিয়া প্রেমভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

বলা বাহুল্য, সেই নীরব কাননতলে দেখিতে দেখিতে সেই সুখের রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল!

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ইহার পর হইতে একুশ দিনের দিন একদিন অপরাহ্ণে কল্যাণপুরের জাহ্নবীবক্ষে ক্ষুদ্র একখানি পান্সী পাইলের পক্ষে ভর করিয়া গ্রামাভিমুখে উড়িয়া আসিতেছিল, আর নৌকা যত গ্রামের কাছাকাছি হইতেছিল, আরোহী দুই জনের চিত্ত অনির্ব্বচনীয় আশঙ্কায় তত উদ্বেলিত হইতেছিল। হরি জিনিস পত্র গুছাইতে গুছাইতে প্রতি পদে দেখাইতেছিল যে, তাহার স্বাভাবিক ব্যস্তভাব পূর্ণ জোয়ার লাভ করিয়াছে। সে বোঁচকা বাঁধিতে গিয়া বোঁচকার কাপড় ছিঁড়িয়া ফেলিল, নৌকার ছাদ থেকে শুক্‌নো কাপড় খানা তুলিতে গিয়া তাহাকে জলে ভিজাইল, পদচাপে কলিকাটা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। গম্ভীরপ্রকৃতি জগন্নাথ আরও গম্ভীর হইয়া বসিলেন, তাঁহার ক্লিষ্ট তথচ প্রসন্নমূর্ত্তি বিষাদময়ী হইল। চেষ্টা করিয়াও তিনি আত্ম-সংযম করিতে পারিলেন না। তখন ভাবিলেন—কেন এরূপ ভাবান্তর হইতেছে? হয় ত প্রভার হরণ জন্য এ বিষাদ—কিন্তু শুধুই কি তাই? গোস্বামী গোপীনাথ স্মরণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার বাঁধা ঘাট, তাঁহার গৃহ-সৌধশিরে অস্তগামী সূর্য্যের স্তিমিত হেমাভ কর এ সবই নয়নগোচর হইল। কিন্তু প্রবাসীর হৃদয়ে সে ভূমানন্দ কই? জগন্নাথ চক্ষু মুদিলেন।

বাঁধা ঘাটে নৌকা লাগিবামাত্র হরি লাফ দিয়া ডাঙ্গায় উঠিল এবং পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল। ঘাটে সোহাগীর মা কাপড় কাচিতেছিল, হরি প্রথমেই কতক ইঙ্গিতে কতক কথায় তাহাকে গুরু গৃহের খবর সুধাইল, সে কিছু না বলিয়া তাড়াতাড়ি কাচা কাপড় মাথায় টানিয়া দিল এবং হরিকে চোক্ টিপিল, গোস্বামী স্পষ্ট দেখিলেন। ঘাটের ধারে নৌকা দেখিবার জন্য দেশের নিষ্কর্ম্মা

ছেলের দল জমায়েৎ হইয়াছে, বউ ঝি সব কাপড় কাচিয়া উঠিয়া হাঁ করিয়া দেখিতেছিল বটে, কিন্তু ঠাকুরকে দেখিয়া পলাইয়া গেল—ছেলেরা মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিল। প্রাচীন ভবশঙ্কর মিত্র হুঁকা হস্তে ঘাটের উপর দণ্ডায়মান, গ্রাম সম্বন্ধে গোঁসাই তাঁকে দাদা বলিতেন। তাঁহাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন গো মিত্তির দাদা—আর সব ভাল ত?" মিত্র মহাশয় সে কথার উত্তর না দিয়া ব্যস্তভাবে হাত যোড় করিয়া প্রণাম এবং প্রতি প্রশ্ন করিলেন "ঠাকুর, এত দেরি যে!" "দেরি" কথাটার উপর মিত্রজ এতখানি জোর দিলেন যে, জগন্নাথের আবছায়া আশঙ্কা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি আর কাহারও দিকে লক্ষ্য না করিয়া দ্রুত গৃহাভিমুখে চলিলেন।

কে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার উভয় জানু বেষ্টন করিল এবং মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল! জগন্নাথ চমকিয়া দেখিলেন লোকনাথ, সে প্রসন্ন অনিন্দ্য মুখকান্তি এই একমাসে এত মলিন হইয়া গিয়াছে যে, প্রথমে তিনিও চিনিতে পারেন নাই। সেই সুখের নিশীথে চন্দ্রালোকে শয়ান প্রফুল্ল এক বৃন্তে দুটি ফুলের কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল—চক্ষু ছল ছল হইল। জগন্নাথ পুত্রকে বুকে তুলিয়া লইয়া গৃহদ্বারে প্রবেশ করিলেন।

প্রথমেই গোপীনাথ মন্দিরে প্রণামার্থ যাওয়ার কথা—লোক চক্ষু মুছিয়া মনস্থির করিয়া বলিল—"ওদিকে যেও না—গিয়ে কাজ নেই বাবা!"

জগ। সে কি! কেন বাবা, গোপীনাথকে প্রণাম না করে কি কোথাও যাওয়া যায়? এ কথা কেন লোকু?

লোক আবার চোক মুছিয়া স্ফুরিতাধরে বাপের বুকে মুখ লুকাইল। "যেও না বাবা, গোপীনাথ আমাদের ছেড়ে গেছেন

বাবা, কে তাঁকে চুরি করে ঠাকুর ঘর পুড়িয়ে দে গেছে, গিন্নী কাজ নেই বাবা!"

তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অন্ধকারমাত্রাত্মক দেখিয়া গোস্বামী সেই-খানে বসিয়া পড়িলেন, মূর্চ্ছা হইল না, হইলে বুঝি ছিল ভাল! লোকনাথ পিতার সে অবস্থা দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং কোল হইতে নামিয়া তাঁহাকে বেড়িয়া ধরিল। যন্ত্রণার প্রথম কয় মুহূর্ত্ত অতীত হইলে তিনি বুঝিলেন, এও সেই উদ্ধব নাপিতের কাজ!

বাপকে একটু সুস্থ দেখিয়া লোক আবার কোলে আসিয়া বসিল। তখনও তাহার চোখের জল শুকায় নাই। জগন্নাথ উর্দ্ধমুখে কম্পিত কণ্ঠে যোড় হাতে ডাকিলেন "ছেড়ে গেলে প্রভো! এই কি তোমার ভক্তবাৎসল্য! কিন্তু আমার কি অপরাধ বলে দাও! তুমি আপনি না ছাড়িলে কে তোমায় নিয়ে যেতে পারে? গেলে যাও, আমিও তোমার অনুসন্ধানে যাব, এ শ্মশানে আর বাস করব না!"

হরি বলিল, "ঠাকুর এখন সুস্থ হোন! এখনও বিপদের শেষ হয়নি! পিসি মা অন্তিম শয্যায়! গোপীনাথমূর্ত্তি রক্ষা করবার জন্য তিনি আগুনে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, জানতেন না যে পূর্ব্বেই দেবতা আমাদের ছেড়েচেন!"

ভবশঙ্কর মিত্র আর হরিতে একরকম ধরাধরি করিয়া জগন্নাথকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল। তখন সন্ধ্যা হয় নাই, অথচ সন্ধ্যার তরল ছায়া প্রকৃতির মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। সেই মুহূর্ত্তে গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র অস্পষ্টালোকে তাঁহার বোধ হইল, চারিদিকে পিশাচেরা নাচিতেছে, শোণিতপ্রবাহে গৃহপ্রাঙ্গণ ভাসিয়া যাইতেছে।

দালানে প্রদীপ জ্বলিতেছিল। অন্তিম শয্যায় শয়ান মুগ্ধ

সর্ব্বাঙ্গে অগ্নিদাহ! তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া অবগুণ্ঠনময়ী হৈমবতী নীরবে বীজন করিতেছেন, নীরবে পবিত্র গণ্ডস্থল বহিয়া উষ্ণ অশ্রু-ধারা রোগিণীর চরণ সিক্ত করিতেছে। সেই দারুণ যাতনা ভুলিয়া মৃণ্ময়ী বধূকে আদরের তিরস্কার করিতেছেন—"ছি বউ কাঁদতে নেই, আমার লোকু জগন্নাথের অকল্যাণ হবে! একবার উঠে যাও, তিন দিন তিন রাত সমানে বসে—এ কি মানুষে পারে! যাও লক্ষ্মীটি আমার!—লোকু কোথা ?"

ধীরে ধীরে জগন্নাথ আসিয়া দিদির শিয়রে বসিলেন। লোক বাষ্পগদগদস্বরে বলিল "পিসি মা, বাবাকে দেখ্‌তে চেয়েছিলে, তিনি এসেছেন!"

মৃণ্ময়ী চক্ষু মেলিলেন—অমনি সে যন্ত্রণাময় মুখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিল, জগন্নাথ উভয় হস্তে মুখ লুকাইয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতেছিলেন!

মৃণ্ময়ী বলিলেন—"কেঁদো না ভাই—তোমায় দেখবার জন্যেই প্রাণ রেখেচি। আমি দেবতার কাজে মর্‌তে চল্‌লাম; এ তোমার সুখের কথা না দুঃখের কথা ভাই? শিশুকালে বিধবা হয়েছিলাম, সহমরণের কামনা এতদিন পূর্ণ হল। আর কোন সাধ নাই—কেবল এক সাধ ছিল, তা পূর্‌ল না! প্রভাকে যদি কখন পাও তবে লোকুর সঙ্গে তার বিয়ে দিও!"—প্রভার নাম করিতে চোখের জল উথলিয়া উঠিল।

সেই দিন শেষ রাত্রে মৃণ্ময়ী স্বর্গারোহণ করিলেন।

* * * *

তার পর সপ্তাহ মধ্যে জগন্নাথ আচার্য্য কল্যাণপুরের বাস ত্যাগ করিয়া সপরিবারে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য, হরি আর তাহার স্ত্রী সঙ্গে গেল।

চতুর্থ খণ্ড।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কোন্ বনে কোন্ ফুল ফোটে তার সব খবর কি তোমরা রাখ—তা চাই বনের ফুল কি মনুষ্য-ফুল? কবি বড় দুঃখ করিয়াছেন যে অনেক কাননকুসুম আপনার মনে আপনি ফুটিয়া অদৃষ্ট, অনাঘ্রাত, অস্পৃষ্ট, নীরবে শুকাইয়া যায়—কেহ জানে না, কেহ ভাবে না তাহাদের কি পরিণাম! হয় ত বসন্তের মৃদু সমীর সে রূপরাশির ঘ্রাণ এবং স্পর্শ-সুখে তেমনি নীরবে মাতে, আর ঐ চির প্রহেলিকাময় নীল আকাশ তলে সুকুমারী তারার দল সে মোহন রূপরাশি দেখিয়া থাকিয়া থাকিয়া বিহ্বল হয়! মনুষ্য-ফুলের সম্বন্ধেও কি এ কথা খাটে না? আমরা বাহিরের রূপটুকুই দেখি, আর কিছু বড় দেখি না। কিন্তু যে হৃদয়-সৌন্দর্য্য সকলের উপর, তা দেখিবার জন্য আকাশের ঐ চাঁদ, ঐ তারকারাজ্যের প্রত্যেক প্রাণী, আর ঐ কোমল মলয়সমীরটুকু পর্য্যন্ত নিত্য চাহিয়া আছে। নহিলে তাহারা এত সুন্দর হইত না!

রাজমহলের সুন্দর শৈলশ্রেণীর অপর পারে একবার যাই। চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড় বেড়া ক্ষুদ্র উপত্যকা ভূমি। সেখানে শাল গাছের এমন বাহুল্য নাই—তবে বৃক্ষরাজির অভাবও নাই। অধিকাংশই মহুয়া এবং অন্যান্য বন্য বৃক্ষ। আর একটা বৃহত্তর নির্ঝর। কাজেই একটা ছোট খাট প্রখর নদী শৈল-সানুতল প্রক্ষালন করিয়া একটু বেশী হাঁকে ডাকে নীচে গিয়া পড়িতেছিল। বাঙময়ী প্রতিধ্বনির বিরাম বিশ্রাম নাই!

দুঃখ এই যে এমন মনোহর সব স্থানের যে কমনীয় সৌন্দর্য্য, প্রাণ ভরিয়া মানুষ তা ভোগ করিতে পারে না। এ সংসারে যে যার আকাঙ্ক্ষা

করে, সে তা পায় না! ভাবুক প্রায় চির দিন নগরের হর্ম্ম্যপিঞ্জরে রুদ্ধ থাকেন, প্রকৃতির এ সুখ-স্বপ্ন শোভা তাঁহার কল্পনা মাত্র থাকিয়া যায়। আর যাহারা শরীর মনের দুঃখ-দারিদ্র্যে অনুদিন অবসাদগ্রস্ত, আপনা ভুলিয়া মাতা প্রকৃতির এ প্রসন্নগম্ভীর মূর্ত্তির পানে চাহিতে পারে না, এ শোভা ভোগের না হোক্, দখলের দেখি তাহারাই পুরুষ-পরম্পরায় স্বাভাবিক অধিকারী। চিরাভিশপ্ত মনুষ্যজাতির পক্ষে এমন কঠোর অভিশাপ আর নাই।

মহুয়া কুঞ্জে সাঁওতালদের বাস, সংখ্যায় তাহারা পনর ঘর মাত্র। নির্ঝর সে স্থান হইতে কিছু দূরে, তথায় একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের ছায়া-তলে সামান্য দুই খানি কুটীর। সামান্য হইক, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, স্বাভাবিক অধিবাসীদের দেবতাস্থানের যোগ্য। সাঁওতালরাও তাই ভাবে। সেখানে অন্য বন্য গাছ কিছু নাই—এক বৃহৎ "পাইকড়" গাছের শীতল ছায়ায় সে অভাব পূর্ণ হইত। একটী মাধবীলতা বেড়িয়া বেড়িয়া সে দীর্ঘ প্রকাণ্ড দারুবক্ষ সুশীতল করিয়া রাখিয়াছে। বৃক্ষমূলে সিন্দূর তিলকময়ী প্রস্তরখোদিত ক্ষুদ্র কালীমূর্ত্তি।

দুইটী স্ত্রীলোক তথায় বাস করে, একজন মধ্যবয়স উত্তীর্ণ হইয়াছে, দ্বিতীয়া কিশোরী বালিকা। নির্জ্জন শৈলকাননে অনাঘ্রাত কমনীয় কুসুমবৎ এই বালিকা আপন মনে ফুটিয়া থাকিত।

প্রবীণা আর কেহ নহে, আমাদের সেই নাপিত-বৌ। আর বলিয়া দিতে হইবে না যে এই বালিকা সেই হৃতা প্রভাবতী। নাপিত-বৌ কর্ত্তৃক তাহার হরণের পর সাত বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বালিকা যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে।

সাত বৎসরের কথা আমরা চাপিয়া রাখিয়াছি। বৎসর কিছু কালের মাপ নহে। সাত বৎসরে ক্ষুদ্র বালিকা আকারে যুবতী

হয়, যুবতী প্রবীণা হয়, কিন্তু যে ঘটনাস্রোত বয়ঃসন্ধির নিয়ামক, জীবন-রাজ্যের বিভাজক, তার যদি তেমন বেগ না থাকে, তবে বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেলেই কি আর না গেলেই কি? কিন্তু সেটা কি সত্য কথা? আমার ত বোধ হয় যে যায়, সে কিছু চিহ্ন না রাখিয়া যায় না। সাত বৎসর গিয়াছে, দেখিতে কালের বেলায় তাহার স্পষ্ট পদচিহ্ন কিছু পড়ে নাই। কিন্তু মনে রাখা উচিত, ইতিহাসের সার্ব্বজনীন পদচিহ্নে আমরা কালের কৌস্তুভ বক্ষ পরীক্ষা করি।—প্রত্যেক হৃদয়েরও যে তেমনি প্রতিফলক গ্রাহিকা-শক্তি আছে, ইহা আমরা ভুলিয়া যাই। আপনার হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখ, এ কথা উদ্ভট বলিয়া মনে হইবে না। ধীরে ধীরে তোমার জীবনপ্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে, কিন্তু ধীরতার কি উত্থান-পতন নাই? দুই বৎসর আগে তুমি যা ছিলে, আজও কি তাই আছ? তবে যে তুমি কাল বলিতে এ সংসারে সবই সুন্দর, আজ কেন তার অকৃতজ্ঞতা অত্যাচার দেখিয়া নাসা কুঞ্চিত কর?

সাত বৎসরে বালিকা প্রভা যৌবনোন্মুখী হইয়াছে। এই সাত বৎসরের মধ্যে প্রথম দুই বৎসর উদ্ধব তান্ত্রিকের ইচ্ছামত নাপিত-বৌকে যেখানে সেখানে ঘুরিতে হইত, বাসের স্থিরতা ছিল না। কিন্তু পাঁচ বৎসর হইতে এ স্থানে সে প্রভাকে লইয়া স্থায়ী হইয়াছে। উদ্ধব তাহাতে আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু প্রভা 'দেড়ে সন্ন্যাসী'কে দেখিয়া ভয়ে মৃতপ্রায় হয়, কাজেই শেষে বিধুমণির পরামর্শে সে অমত করে নাই। নাপিত-বৌ এখন গৃহস্থ সন্ন্যাসিনী—গৃহ আছে, দুটী গোরু আছে, কতকগুলি ছাগ আছে। বালিকা পাহাড়িয়াদের বালক-বালিকার সঙ্গে মিশিয়া সেগুলি চরাইত, নাপিত-বৌ রাত্রে আপনার জপতপ করিত, দিনের বেলায় কাটনা কাটিত। অব

পাহাড়িয়ারা "মা-জীকে" আপনাদের ফসলের যে ভাগ উপহার দিত, প্রভা ও নাপিতবৌর পক্ষে তাহা যথেষ্ট। এ ছাড়া উদ্ধব ভগ্নীকে আপনার পাপলব্ধ দ্রব্যাদি দিয়া সাহায্য করিত। ইদানীন্তন নাপিত-বৌ সে সব আর লইত না।

অতএব এই পাঁচ বৎসরে প্রভার নিত্য সঙ্গী পাহাড়ের গাছ-পালা, নির্ঝরের জল, গোরু দুটী মায় গোবৎস, এবং ছাগলের পাল; আর তাহার সমবয়স্কা পাহাড়িয়াদের দুটী মেয়ে এতোয়ারি আর সোমরি। প্রভা সঙ্গিনীদের সঙ্গে ছুটিতে পারিত না, একটুতে হাঁপাইয়া উঠিত, তাহাদের মত শৈলতল কম্পিত করিয়া গোরুগুলাকে ডাকিয়া ফিরাইতে পারিত না। খাস বাঙ্গলার মাটী হইলে এ অবস্থায় হয় ত প্রভার ভ্রমর, মলয় মারুত এবং পিককুলের অবিচারের কথা মনে আসিত, এবং এ ক্ষুদ্রশক্তি লেখককে মহাজনের পদ ধার করিয়া হয় ত তাহার মুখ দিয়া বলাইতে হইত—"কোকিল রে কত ডাক সুললিত রা!" কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বালিকা বালিকাই ছিল। কল্যাণপুর এবং মা, দাদা, পিসি মা, বাবাকে মাঝে মাঝে মনে পড়িত, কিন্তু সে স্বপ্নের মত, হরণজনিত ক্ষুদ্র জীবনের অকস্মাৎ পরিবর্ত্তনে তাহার স্মৃতিশক্তি হ্রাস হইয়া গিয়াছিল। প্রভা এখন সুতরাং অসুখী নহে। তাহার রূপরাশি দিন দিন ফুটিয়া উঠিতেছিল— কানন-কুসুমবৎ তাহা পবিত্র, তেমনি অযত্নসম্ভূত। মা-জীর প্রভাব আর সর্ব্বোপরি সেই অপরূপ রূপলাবণ্যের মোহে পাহাড়িয়ারা তাহাকে কতকটা উচ্চতর জীব বলিয়া ভাবিত।

যৌবনোন্মুখী প্রভাকে নাপিত-বৌ আর পূর্ব্বের মত এতোয়ারি সোমরির সঙ্গে পাহাড় জঙ্গল ঝরণায় যাইতে দিত না। ইহাতে বালিকা আজকাল একটু আধটু বিপন্ন, এতোয়ারি সোমরি ত ভাবিয়াই পায় না মা-জীর কি মতলব। যাহা হউক, পাঁচ বৎসর পরে

কয়টী কারণে প্রভা জীবনে এই প্রথম প্রথম বিষাদ অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রথম, সে আর মুক্ত বাতাসের মত অবাধে তাহার সঙ্গীদ্বয়ের সঙ্গে মিশিতে পারে না; দ্বিতীয়, এতদিন পরে 'দেড়েগিন্‌সে' আবার মাঝে মাঝে আসিয়া দেখা দেয়, এবং তাহার ছাগ-শিশুগুলি চুরী করিয়া লইয়া যায়। আর কি ভাবিয়া জানি না, নাপিত দিদি এত দিন পরে মাঝে মাঝে ছেলেবেলার কাহিনী বলিয়া সরলা বালিকার বড় বড় চোক দুটীকে অশ্রুভারাক্রান্ত করিত!

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা হইয়াছে। নাপিতবৌ এখন ভৈরবী—পরিধেয় গৈরিক বসন। প্রভারও পরিধেয় তাই। অল্পবিস্তর জটাভারে উভয়েরই রুক্ষ কেশদাম সংযমিত। কুটীরের দাওয়ায় আগুন জ্বলিতেছিল, নাপিতবৌ বসিয়া বসিয়া নীরবে রুদ্রাক্ষমালা ফিরাইতেছিল। তাহার কোলে মাথা রাখিয়া প্রভা একবার আঁধার নিশির ঘন নীল আকাশের তারা গণিতেছিল, একবার আগুনের শিখা লক্ষ্য করিতেছিল। আর তাহার কোলের কাছে দুটী ছাগশিশু নিদ্রিত, বালিকা তাহাদের গায় হাত বুলাইতেছিল।

একটী ছাগ-শিশু হঠাৎ ঘুমের ঘোরে অস্ফুট চীৎকার করিল— যেন বড় ভয় পাইয়াছে। প্রভা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল এবং পুনশ্চ অতি যত্নে তাহার গায় হাত বুলাইতে লাগিল। একটু পরে আবার তাহাকে যথাস্থানে রাখিয়া

নাপিত দিদির কোলে শয়ন করিল। সরলা বালিকার অমন সর্ব্ব-সন্তাপহর, সর্ব্বভরসাময় আশ্রয়স্থল আর কোথাও ছিল না। নাপিতবৌ তাহা অনুভব করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

প্রভা নাপিত দিদির বুকে ক্ষুদ্র সুন্দর অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া সুধাইল—"তুই বলিস্ দিদি, ঘুমের ঘোরে আমি এমনি ভয় পাই—কিন্তু আমার বাছার কি ভয়? তার ত 'দেড়ে সন্ন্যাসী' নেই?"

ভৈরবী বিজ্ঞতার হাসি হাসিল। কোন উত্তর দিল না। এখন আর সে নাপিতবৌ নয়। তার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। প্রভার উপর স্নেহের ভাণ প্রকৃত গাঢ় স্নেহে পরিণত হইয়াছে—এখন প্রভাময় প্রভাসর্ব্বস্ব জীবন। মানুষ বড়ই পরাধীন—প্রকৃতির প্রতিশোধ বড় ভয়ানক প্রতিশোধ। সাত বৎসর আগে নিশীথে যখন ভ্রাতার সঙ্গে কচি মেয়েটাকে চুরী করিয়া ভয়ে ভয়ে পলাইতেছিল, তখন, অনেকবার তাহার মনে হইয়াছিল, মেয়েটাকে গলা টিপিয়া অন্ধকারে কেন ফেলিয়া পলাই না! তার পর দুই বৎসর দাদার কথা মত মেয়েটাকে লালন পালন করিতে হইল—অযত্নে অনাদরে অভাগিনী বালিকার ক্ষুদ্র জীবনস্রোত দুই বৎসর বহিয়া গেল। কিন্তু কেমন বিধির বিধান, আজ প্রভার গায় আঁচড় গেলেও নাপিতবৌর অসহনীয়। সে প্রভাকে কোলে করিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে সরলা বালিকার পরিণাম ভাবিয়া অধীরও হইতেছিল।—"আমি দাদার প্রলোভনে ভুলিয়া মেয়েটীকে চুরী না করিয়া আনিলে সে কত সুখে থাকিত! যাকে সুখ-সোয়াস্তি বলে, সংসারে তার কিসের অভাব ছিল? সোণা-রূপো, রূপবান্ চিরদিনের সঙ্গী স্নেহশীল স্বামী, বাপ-মার মত শ্বশুর-শাশুড়ী—কিসের অভাব? হায় আজ ভাব্‌লে মনে নরকের আগুন জ্বলে! এ সোণার মেয়ের অদৃষ্টে এত দুঃখ-বিড়ম্বনা আমারই জন্যে!" নির্জ্জনে ইহাই ভাবিয়া

বিধুমণি কপালে করাঘাত করিত। এখনও তাহাই ভাবিতেছিল। প্রকৃতির প্রতিশোধ এমনই ভয়ানক!

নাপিতবৌ দীর্ঘ নিশ্বাসের উপর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছিল। সে যে মনোকষ্ট, তাহা রোদনের অতীত! প্রভা বলিল,

"দিদি—অত আনমনা কেন? তোর কিসের দুঃখু দিদি?—ছেলেবেলার একটা গল্প বল্ না?"

ভৈরবী অতি কোমল কাতর কণ্ঠে বলিল—"ছেলেবেলার কথাই ভাব্‌চি প্রভা! দুঃখের কি আর অবধি আছে দিদি! কিসের তোর অভাব? আজ বাড়ীতে থাকলে তোর মতন সুখী কে? অমন শ্বশুর-শাশুড়ী কার হয়? সোয়ামী—আহা ভাব্‌লে আমি আর আমাতে থাকিনে! আজ যে তুই বনে বনে কাঙ্গালিনী, এ কেবল আমারি জন্যে! আমার ত নরক কপালে আছেই—ভাবি কি, তবু যদি তোকে তাদের কাছে কোন রকমে দিয়ে আস্‌তে পারি!"

প্রভা ছোট্ট একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল—এত ছোট যে নাপিতবৌ তা জানিল না। চক্ষে এক ফোঁটা জল আসিয়াছিল। সেই চোকের জল বিন্দুতে হাসিটুকু আসিয়া মিশিল! আর ছেলে-বেলাকার সেই হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া কথা কহার অভ্যাসটুকু বাঁচিয়াছিল। বলিল,

"সে কথা ভেবে আর দুঃখু করিস্ কেন দিদি! সে ত আর ফির্‌বে না! আমার মনে ও কথা উটলে আমি তাই ভাবি। কেন এখানে আমাদের কি কষ্ট? তুই আছিস্, এতোয়ারি সোমরি আমায় কত ভালবাসে, এত গাছপালা ফল-ফুল আছে, ঝরণার কেমন জল—আর দেখ্ দেখি কেমন আমার বাছারা!—" এই বলিয়া বালিকা ঘুমন্ত ছাগ-শিশু দুটীকে আদর করিল। কিন্তু তখনি শিহরিয়া বলিল—"ভয় কেবল 'দেড়ে সন্ন্যাসী'র জন্যে! কেন তাকে এত

ভয় হয় দিদি? তার দিকে আমি চাইতেই পারিনে! আর মিন্‌সে আমার কত বাছাকেই চুরী করে নিয়ে যায়—রাক্ষস মিন্‌সে!—তুই বলিস্‌ ও তোর মার পেটের ভাই, আমার তা বিশ্বেস হয় না!"

নাপিতবৌ মালা রাখিয়া প্রভার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। আর বেশী কথা হইল না। প্রভা ঘুমাইয়া পড়িল। যথাসময়ে ভৈরবী তাহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া কুটীরে শয়ন করাইল—নিজে অনেক রাত্রি জাগিয়া জপ-তপ করিত। তোমরা বল, কয়লার ময়লা কাটে না, মিছা কথা সে। অঙ্গারে অগ্নি-সংযোগ হইয়াছিল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

তন্ত্র-শাস্ত্র সম্বন্ধে একজন সুবিজ্ঞ পণ্ডিতের সঙ্গে আমার কয়টী কথা হইয়াছিল। তিনি বলেন, এদেশে বল-বীর্য্যের যখন নিতান্ত অভাব, কাপুরুষতার প্রভাব পূর্ণমাত্রায়, তখনি জাতীয় সাহস পুনর্জ্জীবিত করার জন্য তান্ত্রিক ধর্ম্মের উৎপত্তি। শক্তি-ধর্ম্ম গূঢ় রাজনীতির ধর্ম্ম। ঐ যে মন্ত্রগুপ্তি, ঐ ঘোর অমানিশিতে মহাশ্মশানে শব-সাধনা, অমানুষী শক্তিলাভের কঠোর তৃষ্ণা এবং উদ্যম—তুমি কি সত্য সত্যই ভাব বৃথায় এ সবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল? ঘাতের ধর্ম্ম প্রতিঘাত। বাস্তবিক সাহস-স্ফূর্ত্তির এমন ধর্ম্ম সংসারে আর কখন বিহিত হয় নাই।

প্রমাণ আমাদের বিধুমণি ভৈরবী—আপনারা 'নাপিতবৌ' নামটা একটু একটু ভুলিতে চেষ্টা করুন না কেন? যে সন্ধ্যাবেলায় মনিব বাড়ী হইতে ঘরে ফিরিতে তিনবার চমকিয়া উঠিত, সে আজ

গভীর নিশীথে পাহাড়তলস্থ বৃক্ষমূলে বসিয়া অসমসাহসে অগ্নি-মাত্র সম্বল করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছে। কি ঘোর পরিবর্ত্তন !

দাদার সঙ্গে দুই বৎসর ঘুরিয়া বিধুমণি দেখিল, তাহার সকল মতে চলা অসম্ভব। বলীদানের দৌরাত্ম্য আর উদ্ধবের সঙ্গীদের পশুত্ব তাহার অসহনীয় হইয়া উঠিল। পশুবলীতে তাহার আপত্তি ছিল না, কিন্তু কখন কখন অমাবস্যার ঘোর নিশীথে নরবলীও হইত—ইহা কি স্ত্রীলোকের প্রাণে সয় গা ? প্রভা ত যূপবদ্ধ পশুর অন্তিম আর্ত্তস্বর শুনিলেই মূর্চ্ছা যায়। আর উদ্ধবকে দেখিলেই মেয়েটা নীলবর্ণ হইয়া উঠে! এ সকল দেখিয়া শুনিয়া বিধুমণি এক ভৈরবীর কাছে মন্ত্রগ্রহণ করিল—তাহারও সাধনা আছে, কিন্তু সে পশ্বাচার-বিরহিত, জীবহত্যার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ ছিল না। তাহা ত হইল, কিন্তু উদ্ধবের সংসর্গ-ত্যাগের কি হইবে ? শেষে প্রভার দুর্দ্দশা দেখিয়া আর বহিনের কাতর অনুরোধ বারম্বার উপেক্ষা করিতে না পারিয়া উদ্ধব সম্মতি দিয়াছিল যে, তাহারা পৃথক বাস করুক। সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

পাইকড গাছের মূলে সিন্দূরচর্চ্চিত ক্ষুদ্র প্রস্তরময়ী কালী-মূর্ত্তি—পার্শ্বস্থ অগ্নিস্তূপের আলোকে সে মূর্ত্তি উজ্জ্বলতর দেখাইতে-ছিল। সম্মুখে বসিয়া বসিয়া ভৈরবী নির্দ্দিষ্ট জপাদি সাঙ্গ করিল। তখন গললগ্নবাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া দেবীর কাছে প্রভার মঙ্গল কামনা করিল।—"মাগো—তুমি সতীর সতী, সতীর সহায়! আমার সোণার বাছাকে তুমি রক্ষা করো মা! বাছা আমার ভাল-মন্দ কিছু জানে না! আমার পাপে তার ধর্ম্ম যেন নষ্ট না হয় মা!—" ভৈরবী উঠিয়া বসিল, তাহার গণ্ডে দরদরিত ধারা পড়িতেছিল, নিষ্পাপ আগুনের শিখা তাহা দেখিতেছিল।

এমন সময়ে কঠোর কণ্ঠে কে ডাকিল,—"বিধুমণি—বিধু—বিদি

জেগে আছিস্ না ঘুমুলি ?" পাহাড়ের সুপ্ত প্রতিধ্বনি সে রবে জাগিয়া উঠিল—কন্দর হইতে কন্দরান্তরে সে ধ্বনি প্রহত হইল।

"কে দাদা—আজ ত তোমার আসার কথা নয়!" এই বলিয়া ভৈরবী ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কৌশলে অগ্নি পশ্চাৎ করিয়া চক্ষের জল মুছিতে চেষ্টা করিল। ভয়ে কাঁপিতেছিল,—দাদা পাছে বুঝিতে পারে চোকের জল ফেলিতেছিলাম!

উদ্ধব বলিল, "কাল অনেক দূরে যাব ডাকাতি কর্‌তে—তাই তোকে একবার দেখ্‌তে এলাম। দিনের বেলায় এলে তুই বলিস্ মেয়েটা ভয় পায়, আর সময়ও ছিল না। তা দাঁড়ালি কেন, বস্. বস্! আমার কটা কথা শোন্!"

ভৈ। "বল না কি কথা শুনি! তুমি বস, আমি সন্ধ্যে থেকে বসেই ছিলাম।"

উ। মেয়েটা কোথা? ঘুমিয়েচে বুঝি! তোকে বার বার বলি, আমাকে ভয় করে আমি না হয় আসব না। কিন্তু তুই ওকে অত আদর দিস্‌নে! কেন, যতক্ষণ তুই জেগে থাকিস্, ততক্ষণ জাগিয়ে রাখ্‌তে পারিস্ নে?

ভৈ। চুপ কর দাদা—তার ঘুম ভাঙ্‌বে! তাতে দোষ কি দাদা? ঘুমুলই বা আহা! ছেলে মানুষ—তায় ভদ্দর ঘরের মেয়ে! ও কথা বলো না দাদা!

উ। ও কথা—বলো না—দাদা! পোড়ার মুখি, রাঁড়ি! তোর আবার সিদ্দি হবে! মরতে পরের মেয়ের উপর তোর এত মায়া কেন?

ভৈরবী উত্তর দিল না—চক্ষের জল শুকায় নাই—ভ্রাতার দুর্ব্বাক্যে আবার চক্ষে জল আসিল। সে নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল।

উদ্ধব আপন মনে বলিতে লাগিল—"ছাই হবে তোর সিদ্দি!—

নরকে মর্বি পচে! আজও মনটা সাদা করতে পারলিনে,- কথায় কথায় কান্না আর দুঃখু! তোর মতন আমিও ছিলাম একদিন,-- সব এখন্ ছেড়ে দিয়েছি! কথায় কথায় মার-কাট, রক্তপাত! নইলে দেবতার তৃপ্তি হয় না—ওঃ আমি কি ছিলাম, কি হয়েছি!"

উদ্ধব যে অনুশোচনা বশত শেষের কথা কয়টী বলিল এমত নহে—হঠাৎ গত জীবনের সঙ্গে এখনকার জীবনের তুলনার চিত্র তার মনে ভাসিয়া উঠিল, মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইল—"ওঃ আমি কি ছিলাম, কি হয়েছি!"

কিন্তু বিধুমণি এ বিদ্যুতে পথ দেখিতে পাইল। চক্ষের জল মুছিয়া বলিল "সত্যিই দাদা—তুমি কি ছিলে, কি হয়েছ! আমার ছুদিনের সে মেয়েটা আঁতুড়ে যখন গেল, তখন তুমি সাত দিন বিছানা থেকে ওঠনি! বউর ব্যামো হলে তুমি বাড়ীর বার হতে না—সেই তুমি! আজ নরবলী দিতেও তোমার প্রাণ কাঁদে না! ভেবে দেখ দাদা, কি ছিলে তুমি, আর কি হয়েছ!"

উদ্ধব বিকট হাসি হাসিল—পিশাচের হাসি, হাসির মূর্ত্তিতে পাপের আগুন! বিধু শিহরিল না—কেননা ভ্রাতার এ হাসি তার কাছে নূতন নহে। উদ্ধব বলিল,

"থাম্ থাম্! সেই বউকে এলাম কেটে!—জানিস্ ত? কিন্তু শত্তুর শালাকে যে তখন কাটতে পারিনি, এ ঝাল মলেও যাবে না। আজ সাত বছর মা ভৈরবীর পায়ে তাই পড়ে আছি—যেমন করেই হোক্, দাদ তুলবই তুলব। শালা আবার সন্ন্যিসী হয়েছেন, জানতে পার্‌লে হয় একবার কোথায় আছে, দেখি তবে শালা বামুন পণ্ডিত কে! মেয়েটাকে এনেছি চুরী করে। শালার যে যেখানে আছে, সবাইকে জ্বালাতন করব। আগেকার গুরু ব্যাটাকে কেমন নাকাল করেছি, সেই ত দিলে না কাটতে! তার ভয় না থাক্‌লে সে

শালাকে কাটতে কতক্ষণ! আর সেই ঠাকুর গোপীনাথ—হা হা সে আবার ঠাকুর, তাকে গুঁড়ো করে পাঁটার রক্ত ঢেলেও রাগ গেল না!”—

দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে করিতে উদ্ধব কথাগুলি বলিল—প্রতি বাক্যে প্রতিহিংসার বিষ উদ্গীর্ণ হইতেছিল, রক্তিম চক্ষু রক্তিমতর হইয়া ঘুরিতেছিল, তাহা হইতে কালাগ্নির স্ফূলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। হস্ত মুষ্টিবদ্ধ—প্রতিহিংসার পাত্র যেন সম্মুখে। দাড়ি জটায় সে রুদ্রমূর্ত্তি বড় ভয়ানক হইয়া উঠিল। সহোদরা ভগ্নী পর্য্যন্ত সে মূর্ত্তি দেখিয়া কাঁপিতেছিল।

অনেক ক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না। উদ্ধব আবার বলিল,

“দেখ্ বিদি—তোকে একটা কথা বলি। তুই মার পেটের বোন্—তোকে একটু যা মায়া হয়! অনেক সময় ভেবে দেখি কাউকেই আর মমতা হয় না—দেবতার যদি একবার আজ্ঞে হয়, সব মানুষকেই বলী দিতে পারি। কেবল পারিনে তোকে। আমার কথা মন দিয়ে শোন্।—তুই মেয়েটাকে অত মায়া করিস্‌নে, পরের মেয়ে, আমার শত্তুরের মেয়ে! আমি কিছু মিছিমিছি ওকে চুরী করে আনিনি—বুজ্‌লি? এখন থেকে মায়া টয়া সব ছেড়ে দে। নইলে ভাল হবে না! কতদিন আর এমন করে চল্‌বে?”

ভৈরবীর চক্ষে পাহাড় আকাশ সব ঘুরিতেছিল—সে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। কোন উত্তর দিতে পারিল না। চক্ষের জল শুকাইয়া গিয়াছিল, সে চক্ষে আগুনের জ্বালা অনুভূত হইতেছিল।

উদ্ধব ভগ্নীর প্রতি তীব্র কটাক্ষ বর্ষণ করিতে লাগিল। কঠোরতর কণ্ঠে বলিল,—

“বুজ্‌লি কথা—মায়া টয়া ছেড়ে দে! মিছেমিছি আমি ওকে

আনিনি। শেষে যদি তুই আমার সিদ্ধির ব্যাঘাৎ করিস্, তবে প্রাণে মর্‌বি!—তখন বোন বলে দয়া কর্‌ব না!"

এবার বোন কথা কহিল। ভয়ে রাগে কণ্ঠস্বর কম্পিত হইল।—বলিল,

"আগে আমায় প্রাণে মেরে যা হয় করো! কি শত্রুতা তোমার সঙ্গে ছিল দাদা! আমায় এ কষ্ট কেন দিতে বসেছ? যাকে মানুষ করেছি, আজ সাত বছর লুকান মাণিকের মত বুকে করে রেখেছি, তার তুমি দুর্দ্দশা কর্‌বে স্বচক্ষে আমি তাই দেখ্‌ব! মেয়ে মানুষের প্রাণ তাই কি পারে? তোমার কি মার ভাল-বাসা যত্ন মনে পড়ে না দাদা? তাই ভাল,—আগে আমায় খুন কর!"

উদ্ধবের রাগ অসহনীয় হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সে ক্রোধ দমন করিয়া স্থির কণ্ঠে বলিল,

"দেখ্, ও সব কাঁদুনি রাখ্! আমার সিদ্ধির ব্যাঘাৎ করিস্‌নে! কুমারীর সতীত্ব নাশ না কর্‌লে যে তান্ত্রিক সিদ্ধি হয় না, তা কি তুই জানিস্‌নে?"

নাপিতবৌ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। তখন উদ্ধব দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তিন লাফে সে স্থান ত্যাগ করিল। বোনের দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। ভাবিল—"আজ আর বাড়াবাড়িতে কাজ নেই।"

পঞ্চম খণ্ড।

ষড়্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গয়াধামে কঙ্কালং * তীর্থ বড় সুন্দর স্থান। বৃহৎ জলপ্রপাতের যে সৌন্দর্য্য এবং গাম্ভীর্য্য, তাহার উপর স্থানমহিমায় ইহাতে একটা অনৈসর্গিক ভাব, একটা পবিত্রতা জড়িত আছে। মরুবৎ দিগন্তপ্রসারী প্রান্তর, নদ নদী সব প্রায় বারমাস শুষ্ক বালুকা-রাশি হৃদয়ে ধারণ করে, কি জানি কাহার ভয়ে যেন সলিলকণা মাত্র অন্তর্ধান হইয়া গিয়াছে, কূপের নিভৃতে সন্ধান না করিলে আর তাহার দর্শন পাওয়া যায় না। এমন স্থলে পাহাড়ের প্রস্তর-হৃদয় ভেদ করিয়া কোথা হইতে শত শত হস্ত দূর ব্যবধানে এই স্বাদু নীরধারা উছলিয়া পড়িতেছে? তুমি সুজলা সুফলার সন্তান, এই বারিশূন্য ফলশূন্য স্থানের এ তীর্থমহিমা দূর হইতে তোমার মর্ম্মস্পর্শ করিতে না পারে, কিন্তু একবার ঐ শৈলপাদমূলে আসিয়া দাঁড়াও, স্থানমহিমা তোমায় বিস্মিত বিমুগ্ধ করিবে।

বাস্তবিক বড় সুন্দর স্থান। লহরে লহরে স্ফাটিকবৎ সলিলরাশি অবিরাম শত শত হস্ত নীচে গহ্বরথায় সঞ্চিত সলিলে আসিয়া মিশিতেছে, স্তূপে স্তূপে ফেনপুঞ্জ স্তূপাকার হইতেছে—সেই বারিধারা আর সেই প্রত্যেক ফেন বুদ্বুদে মাত্র ইন্দ্রধনুর মেলা। একটা অবিরল চাঞ্চল্য সকলের উপর, অথচ মর্ম্মগত একটা অতলস্পর্শী ধীরতা সমসূত্রে সকলই বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এ শোভা দেখিতে দেখিতে একবার চক্ষু ফেরাও—চারিদিকে কঠোর প্রস্তরদুর্গ—অসম অযত্ন-রক্ষিত, অথচ কালের অনন্ত কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধা—তোমার হৃদয়

---

* চলিত নাম—কো[illegible]

কাঁপাইয়া তুলিবে। সুন্দরে কি ভীষণ! না এই ভীষণ পাষাণ ক্রোড়ে আদরের সামগ্রী বলিয়াই এত সুন্দর।

ক্ষুদ্রমতি দর্শক আমি, এ মহাদৃশ্য দেখিয়া আজ যুগপৎ বিস্মিত বিমুগ্ধ অবসন্ন হইলাম। সহস্র সহস্র দর্শকমণ্ডলী প্রতিবৎসর এ তীর্থ দর্শনে আসিয়া চক্ষু সার্থক করিয়া যায়, ইহার সলিলে স্নাত হইয়া পাপ ক্ষয় করে, কিন্তু এখানে কেহ রাত্রি যাপন করে না। জনশ্রুতি এই যে আজিও কোন কোন যোগী ঋষি মধ্যে মধ্যে আসিয়া এখানে তপস্যা করিয়া থাকেন। পরিখার ঠিক উপরে দুরারোহ শৈলশিখরে একটী অতি প্রাচীন জীর্ণমন্দির আছে। সে স্থান সচরাচর অধিগম্য নহে।

দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে এক বৃদ্ধ যোগী সময়ে সময়ে এই তীর্থে আসিয়া বাস করিতেন। পাঠক মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় আছে। প্রথমঃ সাক্ষাৎ কল্যাণপুরে। তিনিই জগদীশ পণ্ডিতের গুরুদেব। জগদীশ গুরুর অনুসরণ করিয়া প্রাতে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন।

হেমন্তের জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি, তত পরিষ্কার নহে। বিশেষ এই পাহাড়তলের কুজ্ঝটিকায় প্রভাতালোকবৎ আধ ছায়া আধ আলো বলিয়া মনে হইয়াছিল। মন্দিরপ্রাঙ্গণে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছিল তথায় বৃদ্ধ যোগী জগদীশের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত ছিলেন।

যোগী বলিলেন "জগদীশ, অনেক যত্নে তোমায় শাক্তধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলাম। ভরসা ছিল, লুপ্তপ্রায় প্রকৃত শক্তিধর্ম্মের তুমি উদ্ধার করিবে। কিন্তু আজিও তুমি চিত্ত স্থির করিতে পারিলে না?"

জগদীশ। আমি আপনার অযোগ্য শিষ্য। সে মহাব্রত পালনের আমি অধিকারী নহি। পাপস্মৃতি আজিও যাহাকে পীড়িত করে, অন্যে [illegible] আজ্ঞা করুন, লুপ্তপ্রায় প্রকৃত শক্তিধর্ম্মের উদ্ধার

সাধন কি তাহার সাধ্যায়ত্ত? আমা হইতে সে মহাব্রত উদ্যাপন হইবে না গুরুদেব—হৃদয়ে আমার শান্তি দান করুন।

কয় মুহূর্ত্তের জন্ত গুরুদেব কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার নিমীলিত নেত্রের দিকে চাহিয়া চাহিয়া জগদীশ উদ্বিগ্ন হইতে-ছিলেন। যোগী বলিলেন

"অনেক আশা করিয়াছিলাম। এ মহাব্রতের যোগ্য পাত্র তুমি, তাহাতে সন্দেহ নাই। জ্ঞানে ভক্তিযোগ না হইলে শক্তিধর্ম্মের পরিত্রাণ নাই—কোন ধর্ম্মেরই নাই। বিশেষ এখনকার শক্তিধর্ম। আমি বৎস তোমার ভরসা ত্যাগ করিব না।"

জগদীশ বিহ্বল হইলেন। বলিলেন "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য! এ ব্রত পালনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলাম। ভাল চিরদিন তাহাই হইবে। কিন্তু শান্তি কোথায় গুরুদেব—এ চঞ্চল হৃদয় লইয়া কি করিতে পারি? কি করিব?"

যোগী। পাপস্মৃতি লোপ হয় না জগদীশ—কিন্তু পাপ সমর্পিত হইতে পারে। আমি তোমার হৃদয় বুঝিয়াছি। তুমি মা জগদীশ্বরীর প্রতি অনন্ত ভক্তিমান, কিন্তু তাঁর কাছে আপনার হীনতা লইয়া তুমি আত্মানুশোচনায় অবসন্ন হও। মার কাছে পাপ ব্যক্ত করিয়া প্রাণের শান্তি পাও না। শক্তিধর্ম্ম তোমার নিজের পক্ষে উপযোগী নহে।

জগদীশ উত্তর করিলেন না। উত্তর করিবার কিছু ছিল না। যোগী আবার বলিলেন—

"কিন্তু পাপ ত জীবের স্বভাবসিদ্ধ—আমরা প্রকৃতিকে পরাজয় করিতে পারি বলিয়াই মানুষ। পাপ ঘৃণার যোগ্য, তাই বলিয়া পাপীর প্রতি ঘৃণা কর্ত্তব্য নহে। তাহা ঘোর নিষ্ঠুরতা। সুতরাং অধর্ম্ম।

কি ভ্রম! মা কি পীড়িত সন্তানের প্রতি স্নেহশূন্য না আর্ত্ত সন্তানই তাঁহার বেশী যত্নের ধন? তুমি বৎস আপনার প্রাণের প্রাণ উন্মুক্ত করিয়া মাতা মহাশক্তির চরণে ধরিতে পারিলে না, ইহাতে তোমার অপরাধ নাই। মনুষ্যচরিত্র চিরদিন মনুষ্যচরিত্রই থাকিবে। আমি তোমায় বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিতে উপদেশ করিতেছি। তোমার নিজধর্ম্ম বৈষ্ণবধর্ম্ম হউক, কিন্তু চিরজীবন তোমার প্রচার ধর্ম্ম হইবে—শক্তিধর্ম্ম।"

জগদীশ পণ্ডিত এবার কথা কহিলেন। গুরুদেবকে অনন্ত জ্ঞানী বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল, মন্ত্র গ্রহণ পর্য্যন্ত তাঁহার সকল কথা অবহিত মনে নত মস্তকে শুনিতেন—তাঁহার উক্তি মাত্র প্রতিবাদের অতীত বলিয়া তাঁহার মনে হইত। আজি কিন্তু তাঁহার উপদেশে তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না—অনেক স্থলই অর্থশূন্য প্রহেলিকা বলিয়া মনে হইল। তিনি বিনীতভাবে গুরুচরণে আপনার সন্দেহ নিবেদন করিলেন—

"গুরুদেব, কি আজ্ঞা করিতেছেন বুঝিতে পারিলাম না। শক্তি-ধর্ম্মের প্রচারকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি—চিরজীবন তাহাই করিব। কিন্তু এ আবার কি উপদেশ? আমায় বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবে কেন? হৃদয়ে এক ধর্ম্ম, মুখে আর এক ধর্ম্ম, এ কপটাচরণের আজ্ঞা কেন গুরুদেব?"

তুষার স্তূপের বক্ষে যেন বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল। সেই শুক্ল-শ্মশ্রুকেশময় প্রসন্ন বদনমণ্ডলে গাম্ভীর্য্যের ঈষৎ মধুর হাসি দেখা দিল। যোগী শিষ্যের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আদর করিলেন, বলিলেন,

"ধর্ম্ম এক বৎস, দুই নহে। সত্যের বিভিন্ন পথ, কিন্তু সত্য এক।

শক্তিধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম ধর্ম্মের সোপান মাত্র—স্তরের উপর স্তর, প্রকারের ভেদ মাত্র, আসলে জিনিস এক। সকলই সেই জগৎ কারণের উপাসনা। কেহ তাঁহাকে ডাকে মা বলিয়া, কেহ ডাকে বৎস, সখে, স্বামিন্! ইহার কোন্ সম্বন্ধটা অপবিত্র, ধর্ম্মবিগর্হিত জগদীশ? তবে কেহ প্রেমভক্তির সম্বন্ধ—কেহ শুধু প্রেমের; এই ভক্তি বাঁধে প্রতিহত হয়, অন্যে বাঁধ নাই, সবই মুক্ত, সবই মাখামাখি ভালবাসা। তাই মধুর ভাব বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ভাব। কবি যখন মৃতা পত্নীর শোকে বিহ্বল রাজার মুখ দিয়া উক্ত করাইয়াছিলেন—তুমি স্নেহে মাতা, তখন তিনি এই প্রভেদ অনুভব করিয়াছিলেন। এখন বুঝিতে পারিবে, অসামঞ্জস্যের ভিতর কতখানি সামঞ্জস্য? এখনও কি বলিতে চাও, আমি কপটাচরণের প্রশ্রয় দিতেছি?"

জগদীশের মুখ প্রফুল্ল হইল। গুরুদেব আবার বলিতে লাগিলেন,

"এই শক্তিধর্ম্ম এবং এই বৈষ্ণবধর্ম্ম দুইই বঙ্গভূমির গৌরব, কিন্তু মূর্খের হাতে পড়িয়া দুই মহৎ ধর্ম্ম কলঙ্কিত হইয়া উঠিল। বৈষ্ণবধর্ম্মের ততটা অধঃপাত হয় নাই—কেননা চৈতন্যদেবের মধুর জীবন আজও বাঙ্গলা ভুলিতে পারে নাই। কিন্তু শক্তিধর্ম্মের যতটা অধোগতি হইবার তা হয়েছে, অথচ দেশের এই দুঃখ-দুর্দ্দিনের দিনে শক্তি-ধর্ম্ম ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। আজিকার দিনে যদি আমরা অজ্ঞেয় বিশ্বকারণকে প্রাণের ভিতর হইতে ভক্তিপ্রীতিতে মাখামাখি মধুর মা সম্বোধন করিতে পারি, তবেই আমাদের মঙ্গল। এখন আব্দার করিতে হবে, বলিতে হবে—মা ধনং দেহি মানং দেহি! কিন্তু ও সব কথা এক দিন তোমায়

বলেছিলাম। এ অধঃপাত নিবারণের যোগ্য পাত্র তুমিই জগদীশ—এ ব্রত তুমি ভঙ্গ করিও না। এখন বুঝিলে, কেন আমি বলিতেছি হৃদয়ে তুমি বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন কর, কিন্তু তোমার প্রচারধর্ম্ম হউক শক্তিধর্ম্ম! উপাস্য দেবতাকে এখন আপনার করিয়া লও, যাকে ভালবাসা বলে তাতে ভেদাভেদ নাই। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, হৃদয়ে তুমি শান্তি লাভ করিবে।"

তখন জগদীশ অশ্রুপূর্ণ লোচনে গুরুদেবের চরণ আলিঙ্গন করিলেন। তার পর উন্নত কণ্ঠে বাষ্পগদগদ বচনে যুক্ত করে ভিক্ষা করিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করা হউক।

যোগী বলিলেন—"সে দীক্ষা দান আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। যে গৃহস্থ নহে, সংসারীর পূর্ণ স্নেহ যাতে বিকশিত হয় নাই, প্রকৃত প্রস্তাবে সে বৈষ্ণব নহে। চৈতন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মত সংসারী কে? প্রীতির যত প্রকার আছে, সকলেরই তিনি পূর্ণ অবতার। মার প্রতি তেমন ভক্তিপ্রীতি, সখাদের উপর সেরূপ প্রণয়, অনুগত আশ্রিতের প্রতি সে বাৎসল্য, পত্নীর প্রতি সে অনুরাগ—এমন আদর্শ স্নেহবান্ সংসারী আর কখন দেখা গিয়াছে কি না সন্দেহ। মর্ম্মে মর্ম্মে সংসারী বলিয়াই তিনি বৈষ্ণবের অবতার। তাঁহার তুলনা হয় না। তোমার দীক্ষাগুরু হইবার অধিকারী একজন আছেন, তিনি তোমার স্বসম্পর্কীয় জগন্নাথ আচার্য্য। তাঁহার কাছে মন্ত্র গ্রহণ কর, দ্বিধা করিও না।"

প্রভাত হইতে না হইতে জগদীশ পণ্ডিত গুরুচরণে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সে চরণযুগল অশ্রুসিক্ত করিলেন। কেননা যোগী বলিয়াছিলেন, ইহজীবনে আর সাক্ষাৎ হইবে না; তাঁহার সুখ-দুঃখ, মিলনবিরহ সব এক। প্রিয় শিষ্যকে চিরবিদায় দিবার সময়েও সেই প্রীতির চিরপ্রফুল্লতা শ্বেতশ্মশ্রু ব্যাপিয়া বিকীর্ণ হইতেছিল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজমহলের সুন্দর শক্তিকাননে নূতনতর শোভা হইয়াছে। গৃহিণী বিনা গৃহই যে শুধু আঁধার এমত নহে, রমণীমুখপদ্ম যদি না ফুটিল, তবে বনের নির্ব্বিকারপূর্ণ সৌন্দর্য্যও কেমন অসম্পূর্ণ বোধ হয়। কথায় বলে, অলঙ্কারসিঞ্জিতের মধুর ধ্বনি না শুনিলে অশোক সুন্দরী ফুল ফুটান না! কণ্বের আশ্রমে তত যে সৌন্দর্য্য, তার সকলই শকুন্তলার জন্য। তুষ্মন্তের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও তার কিসলয়ে ভরা নবীন তরু সহ মন্দান্দোলিত সপুষ্প ব্রততীর বিবাহ দিয়া সুখী হই—তার হরিণশিশুতে মানবশিশুর স্নেহ আরোপ করি।

একদিন অপরাহ্নে ভবানীমন্দির সম্মুখস্থ বটবৃক্ষতলে বসিয়া বসিয়া ভৈরবও তাহাই ভাবিতেছিল। ভৈরব যুবাপুরুষ, চিরদিন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। স্ত্রীজাতির প্রভাব কখন অনুভব করে নাই। কিন্তু সপ্তাহ গত হইতে চলিল, তাহার জীবনে সে সুখ ঘটিয়াছে। সুখ না দুঃখ? ভৈরব ভাল বুঝিতে পারিতেছিল না। অপূর্ব্ব নবীন ভাবের তরঙ্গ-রাজি বিদ্যুৎপ্রবাহবৎ শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইতেছিল—সর্ব্বাঙ্গে আনন্দের দীপ্তি ফুটিতেছিল। পৃথিবীর সকলই নূতনতর ভাবে তাহার নিকট সুন্দর বোধ হইতেছিল। এমন সময়ে সন্ন্যাসিনী আসিয়া ভৈরবের পার্শ্বে বসিল।

ব্রহ্মচারিণী আর কেহ নহে—আমাদের নাপিতবৌ। বোধ হয় না বলিয়া দিলেও চলে যে সেই রাত্রে উদ্ধবের সে ব্যবহার এবং কথায় মরিয়া হইয়া নাপিতবৌ প্রভাকে লইয়া এখানে পলাইয়া আসিয়াছে। কেমন ঘটনার প্রবাহ! প্রভা না জানিয়া শেষে পিতৃকুটীরে আশ্রয় পাইল। ভৈরব তাহাদিগকে আশ্রয় না দিলে কি হইত বলা যায় না। অথচ ভৈরব নাপিতবৌ এবং প্রভাকে আজিও চিনিতে পারে নাই—তাহারাও জানিত না ভৈরব কে।

তখন জগদীশ সন্ন্যাসী আপনার মহাপুরুষ গুরুদেবের চরণ দর্শনে বাহির হইয়াছেন। সেই রাত্রির ঘটনার পর ভৈরবও তাঁহার যাত্রায় বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য বোধ করে নাই। তবে ভৈরব তাঁহার সঙ্গে যাওয়ার জন্য বিস্তর আকিঞ্চন করিয়াছিল, কিন্তু তিনি কোন মতেই সম্মত হন নাই। ভৈরব এখন শক্তিকাননের রক্ষক।

প্রথমে নাপিতবৌ পাহাড় বস্তিতে আসিয়া পৌছিয়াছিল। পাহাড়িয়ারা যথাসাধ্য অতিথি সৎকার করিল বটে, কিন্তু এই অতিথিদ্বয়কে বেশী দিনের জন্য আশ্রয় দিতে তাহারা সাহস করিল না। তাহারা বুঝিয়াছিল যে, ইহারা উদ্ধব ডাকাইতের কবল হইতে পলাইয়াছে, কি জানি এখানেও আবার তাহার উপদ্রব উপস্থিত হইতে পারে। অতএব তাহারা ভৈরবকে সম্বাদ দিল। স্বয়ং আসিয়া ভৈরব প্রভা এবং নাপিতবৌকে শক্তিকাননে লইয়া গেল।

ভৈরব বড় অন্যমনস্ক—সন্ন্যাসিনী নিঃশব্দে তাহার পার্শ্বে আসিয়া বসিল, আগন্তুক প্রথমে কিছু বলিল না। কেননা সেই নিস্পন্দ বীরমূর্ত্তির ধীর সৌন্দর্য্য তাহার চক্ষে বড় সুন্দর বোধ হইতেছিল। কৃষ্ণ বর্ণে কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য! আকর্ণায়ত চক্ষুর কি শান্তভাব! পৌরুষ সৌন্দর্য্যের প্রকৃত সমালোচক স্ত্রীজাতি। তাহার উপর প্রথম দর্শনাবধি সে ভৈরবকে পুত্র সম্বোধন করিয়াছিল, দিনে দিনে স্নেহ বাড়িয়া উঠিতেছিল। প্রভার উপর স্নেহের প্রবাহ তাহার উছলিয়া জীব মাত্রে সঞ্চারিত হইতেছিল। পাষাণী সেই নাপিতবৌ এখন স্নেহময়ী ব্রহ্মচারিণী!

তথাপি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়া তাহার ক্ষণ যায় না। দারুণ পশ্চাত্তাপে হৃদয় সদাই ব্যথিত। প্রভার কি হইবে মনে হইলেই তাহার চোকে জল আসিত,—দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িত, সদাই সেই চিন্তা। ভৈরবকে দেখিতে দেখিতে সে দুইবার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

ভৈরব চমকিয়া উঠিল,—পার্শ্বে ভৈরবীকে দেখিয়া বড় অপ্রতিভ হইল—লজ্জায় কথা কহিতে পারিল না। সন্ন্যাসিনী বিষাদের হাসি হাসিল—কোমল স্বরে আদর করিয়া সুধাইল—"আপন মনে একলাটী বসে কি ভাবনা বাবা ?"

ভৈরবের চক্ষু কর্ণ দিয়া বিদ্যুৎ ছুটিতে লাগিল, আর কখন সে এমন বিপদে পড়ে নাই। মিথ্যা বলিবার প্রলোভন আর কখন উপস্থিত হয় নাই, একটা কিছু বলিয়া কথা ঢাকিবার লোভ অসম্বরণীয় হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহা পারিল না, অনেকক্ষণ কথা কহিল না। বিধুমণি আসল কথা বুঝিল না। সে দেখিত ভৈরব বেশী কথা কয় না, তাদের কাছে বেশীক্ষণ বসে না—বড় লাজুক ছেলে! সেটাও কতক সত্য বটে।

ততক্ষণে ভৈরব আত্মসম্বরণ করিয়া লইল। ধীরে ধীরে বলিল, "মা-জি—কতক্ষণ? আমি ভেবেছিলাম আপনারা ঝরণায় গেছেন!" প্রভার নাম মুখে আসিতে কণ্ঠে বাধিয়া গেল। ভৈরব আবার মুখ নত করিল।

নাপিতবৌ সেটা লক্ষ্য করিল না, বলিল "ঝরণা দেখতেই গিয়েছিলাম—পাগলীটা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। আজও তার মন স্থির হয়নি। সেখানকার সেই ঝরণা, সেই ছাগলের পাল, আর এতোয়ারি সোমরির কথা রাতদিনই ভাবে, তবু তুমি হরিণের ছানা এনে দিয়ে একটু ঠাণ্ডা করেছ। ঐ সবই ভালবাসে। ছানাদের ঘাস খাওয়াতে গেছে। তাদের খেলা দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছাগলের ছানার কথা তার মনে পড়ে গেছে—বলে আহা বাছাদের কি হবে!"

ভৈরব পূর্ব্ববৎ। নাপিতবৌ আবার বলিল, "বাবা আমাদের উপর তোমার যত্নের সীমা নেই তোমায় পর বলে মনে হয় না।

আমি ত তোমায় পেটের সন্তান বই আর কিছু ভাবতে পারিনে—তোমায় দেখে অবধি বড় মায়া হয়েছে। তোমায় ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না বাবা! কিন্তু আমরা অভাগিনী, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অমঙ্গল। তুমি দয়া করে আশ্রয় দিয়েছ, কি জানি তোমার কোন বিপদ ঘটে!”

এবার ভৈরবের গম্ভীর মুখে হাসি দেখা দিল।—“কি, আপনারা শক্তি-কাননে আছেন বলে আমার বিপদ হবে! এ চিন্তা করে অনর্থক ক্লেশ পান কেন মা-জি? আপনি বোধ হয় উদ্ধব তান্ত্রিকের কথা বলচেন, কিন্তু আমার ভয়ে উদ্ধব বস্তি-অঞ্চলে ডাকাতি করা ছেড়েচে! গুরুর আজ্ঞায় আমি তার প্রাণ রক্ষা করেছিলাম।”

ভাই যত কেন দুঃশীল দুরাচার হোক না, মার পেটের বো: সদাই তাহাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত। সন্ন্যাসিনীর ভ্রাতৃ-স্নেহ জাগিয় উঠিল। সকল ভুলিয়া, আত্ম-বিস্মৃত হইয়া সে ভ্রাতার প্রাণদাতার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিল না।—চোকের জল মুছিতে মুছিতে বলিল—

“আর জন্মে ছেলেই তুমি ছিলে বাবা—আমাদের আশ্রয় দি বাঁচিয়েচ, আমার প্রাণের যে বড়, তাকেও তুমি প্রাণ দিয়েছ। বা তোমার ধার কি দিয়ে শুধব বল। উদ্ধব আমার মার পেটের ভাই!”

ভৈরব অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া সন্ন্যাসিনীর দিকে চাহিল। তাহা কৌতূহল অসহনীয় হইল।—কেননা চিরশান্ত সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিয়াছে সম্মোহন শরবিদ্ধ হইয়াও দেবতা মহাদেব তন্মুহূর্তে আত্মসম্বরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, মানুষ ভৈরব তাহা পারিল না! এই জন্য মিতভাষীর সংযম এ ক্ষেত্রে টুটিয়া গেল—ভৈরব আগ্রহে সুধাইল—

"মা-জি কিছুই আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমায় সকল কথা খুলিয়া বলুন! সব শুনিতে আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে!"

কিন্তু সন্ন্যাসিনী সকল বলিয়াও অনেক কথা গোপন করিল। স্ত্রীজাতিসুলভ পরিণামদর্শিতার ফলে তাহার মনে হইল, প্রভার প্রকৃত পরিচয় গোপন করা কর্ত্তব্য। অতএব প্রভাকে সে আপনার গুরুপত্নীর পালিতা কন্যা বলিয়া পরিচিত করিল। মিছা বলিতে এখন তাহার কষ্টবোধ হইল। কথা বলিতে তাহার সাবধান লুকোচুরির ভাবে অন্য কাহারও সন্দেহ হইত, কিন্তু ভৈরব বড় সরল, তাহার উপর চিত্ত-বৃত্তির বিপ্লবাবস্থায় সে কিছু বুঝিতে পারিল না।

রঙ্গভূমে দর্শক যেমন নাটকের অভিনয় দেখিতে দেখিতে যুগপৎ দুঃখে হর্ষে বিহ্বল অভিভূত হয়, এ কাহিনী শুনিতে শুনিতে ভৈরবেরও সেই দশা ঘটিল। এ নাটকের প্রত্যেক অঙ্কে সে দারুণ নিয়তির ভ্রূকুটি দেখিতে পাইল। কিন্তু আজিও সে নাটক অসম্পূর্ণ। ভৈরব তখন জানিত না, গুরুদেবের মত তাহার অদৃষ্টও সেই নিয়তির সূক্ষ্ম সূত্রে ঝুলিতেছিল।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পাহাড়ের অন্তরালে অস্তগামী সূর্য্য অন্তর্হিত হইতেছিল; তাহার রক্তিমাভা নিম্ন শ্যামল শৈলশিরে পড়িয়া পড়িয়া স্বপ্নের হাসির মত মিলাইয়া যাইতেছিল। ঊর্দ্ধে নীলাকাশে সঞ্চিত তরল মেঘ-রাজিতে সে আভা পড়িয়া বিবিধ বর্ণ প্রকটিত করিতেছিল—মানুষের ভাষায় তাহার চিত্র দেওয়া যায় না। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যভাণ্ডার

পূর্ণ-মাত্রায় যদি দেখিতে চাও, সান্ধ্য গগনের রক্তিম শোভায় দেখিও—শৈলশিরে সজ্জিত কৃত্রিম মেঘ শৈলের স্তরে স্তরে নিমজ্জনোন্মুখ রবিকরসম্পাতে প্রত্যক্ষ করিও।

সন্ন্যাসিনীর আরও কিছু বলিবার ছিল, কিন্তু এমন সময়ে রুক্ষ মুক্তকেশা গৈরিকবসনা বালিকা আসিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইল। ভৈরব নতমুখে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

বিধুমণির চোকের পাতা তখনও ভাল করিয়া শুকায় নাই। প্রভা তাহা দেখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল, তাহারও চোক ছল ছল করিতেছিল।

প্রভা বলিল "দিদি—তোর কান্না কি ফুরবে না? এখানে তোর কারে ভয় দিদি! ভৈরবকে ত আমার ভয় হয় না! এখানেও বুঝি সে আস্‌বে শুনেচিস্‌? তা হলে কি হবে!"

নাপিতবৌ বিষাদের হাসি হাসিল। বলিল, "সে ভয় নেই প্রভা, এখানে সে আস্‌বে না। কিন্তু তোকে কেমন করে কল্যাণপুরে দিয়ে আস্‌ব, সেই ভাবনা ভাব্‌চি!"

প্রভা দিদির কোলে মাথা রাখিল। আদর করিয়া তাহার হাতে হাত রাখিয়া সুধাইল, ভৈরবের সঙ্গে কি কথা হইতেছিল। নাপিতবৌ সংক্ষেপে উত্তর দিল। প্রভা হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা দিদি, তুই অমন লাজুক মানুষ কখন দেখেছিস্‌? তুইই বলিস, মেয়ে মানুষ পুরুষকে লজ্জা কর্‌তে হয়, কিন্তু আমায় দেখলেই ভৈরব উঠে যায়। আমার ভারি হাসি আসে। এত লজ্জা কেন দিদি?"

বিধু হাসিয়া উঠিল। বলিল, "আচ্ছা ভৈরবকে তা জিজ্ঞেস্‌ করব!" প্রভা দিদির মুখ টিপিয়া ধরিল,—"ছি জিজ্ঞেস্‌ করিস্‌নে! আমার চেয়ে তুই বড়, তোকে লজ্জা করে না, আমায় করে তাই আমার মনে হল! তোর সঙ্গে বরং কথা কয়, আমার সঙ্গে একটীও না।

দিদি বলিল—"বল্ ত প্রভা, কেমন সুন্দর চেহারা! কালোয় এত সুন্দর আমি কখন দেখিনি!"

প্রভা!—কেন তুই বলিস্, আমার লোকু দাদা খুঁব সুন্দর! আমার তাকে ভাল মনে পড়ে না। সে সুন্দর না এ সুন্দর দিদি?

নাপিতবৌ সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া গেল—অনেক দিনের পর সে মন খুলিয়া প্রাণের হাসি হাসিল। বলিল,

"লোকু দাদা যে বর প্রভা—সেই সুন্দর, এ কাল!"

প্রভা অপ্রতিভ হইয়া নাপিত দিদির কোলে মুখ লুকাইল।

* * * *

ওদিকে সেই প্রদোষকালে ভবানীপদতলে ভৈরব অধীর হইয়া লুটাইতেছিল।—"রক্ষা কর মা! বল দাও মা! দুর্ব্বল আমি সন্তান! পরের রূপে মন ভরিয়া যায়, মনের শান্তি লোপ পায়, ইহা ত কখন জানি নাই ভবানি! চিরদিন তোমারই চরণ সার করিলাম, তোমার কাজেই প্রাণমন সমর্পণ করিলাম,—শেষে কি এই ফল হইল? বল দাও মা, হৃদয় দমন করি! দুর্ব্বল আমি—আমার কত বল পরীক্ষা করিবে?"

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

জগন্নাথ আচার্য্য সপরিবারে ক্রমাগত সাত বৎসর শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিলেন। তথায় তাঁহার অনেক শিষ্যসেবক জুটিয়া গেল। জীবন-স্রোত মৃদু মধুর প্রবাহে বহিয়া চলিল—কেননা জীবনে তাঁহার যাহা প্রধান আকাঙ্ক্ষা তাহা পূর্ণ হইয়াছিল। ইদানীন্তন তিনি

বলিতেন, "গোপীনাথ কল্যাণপুর ত্যাগ করিয়া আমায় এই পথে আনিয়াছেন। সুখে হউক দুঃখে হউক, ভক্তবৎসল ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। পাপী আমি, আমার অদৃষ্টেও তিনি বৃন্দাবন ধাম বিধান করিয়াছেন।"

ইহার মধ্যে হরির দুটী ছেলে হইয়াছে, সে তাহাদের নাম রাখিয়াছে কৃষ্ণদাস, বলরামদাস। বৃন্দাবন ধামে আসিয়া তাহার আগেকার গোঁড়ামি সারিয়া গিয়াছে। প্রভুর প্রেমোচ্ছ্বাস সেও পূর্ণ মাত্রায় লাভ করিয়াছিল। হরি গুরুদেবের কাজকর্ম্ম করিত, তাহার স্ত্রী ছেলে দুটী গুরুর অন্নে পালিত হইত, কিন্তু সে নিজে অধিকাংশ দিন ভিক্ষা করিয়া উদর পূর্ণ করিত। জগন্নাথ হাসিয়া অশ্রুমোচন করিতেন—বৃন্দাবন ধামে আসিয়া এর চেয়ে বাঞ্ছনীয় আর কি আছে? তিনি নিজে হরির মত করিতে পারেন না বলিয়া আপনার ভক্তিবলের হীনতা অনুভব করিতেন। বলিতেন "হরি সার্থক ভক্তি তোমার! তুমি গুরুর গুরু হরি—আমায় ও ভক্তি গোপীনাথ দেন নাই।" হৈম কিন্তু হরির ভিক্ষাবৃত্তিতে কষ্টবোধ করিতেন—কিছু বলিতেন না, নীরব থাকিতেন। লোকু বাপের মুখের সামনে হরি দাদাকে মধুর তিরস্কার করিত। "ছি, হরি দাদা, ও আবার কি সঙ্! সাধ করে ভিক্ষা করলে আবার ধর্ম্ম হয়! তোমার সব আজগুবি হরি দাদা!"

সাত বৎসরে লোকনাথ পরম সুন্দর যুবা পুরুষ হইয়াছে। হঠাৎ দেখিলে সে লোকু বলিয়া চেনা যায় না। এখন সে দিব্য গৌরকান্ত, উন্নতপ্রশস্তললাট লোকনাথ আচার্য্য। শ্রীবৃন্দাবন ধামে বিখ্যাত নৈয়ায়িক বলিয়া তাহার খ্যাতি, কেহ তর্কে আঁটিতে পারে না। ছেলেবেলাকার সেই ভাসা ভাসা বড় বড় চোক, আর কুঞ্চিত কেশ-

রাশি মাত্র চেনা যায়। লোকু হরি দাদাকে যখন তিরস্কার করিত, জগন্নাথ পুত্রের সে দিব্য মূর্ত্তির জ্যোতি দেখিয়া ভগবান স্মরণ করিতেন। হাসিয়া বলিতেন "বাবা এখন তোমার ন্যায়ের বুদ্ধি বড় হইলে ভক্তি বাড়িলে এই ভিক্ষার মাধুর্য্য বুঝিবে!" হরি হাসিয়া শিখা নাড়িয়া বলিত—"তুই থাম লোকা দাদা, সেই ত তুই রাঙ্গা ভূত!"

লোকুকে দেখিলেই হৈমর প্রভাকে মনে পড়িত। আর সবাই বরং তাহাকে ভুলিয়াছিল, হৈম ভুলে নাই। সে এক বোঁটায় দুটি ফুল তাহার মনে রাত্রি দিন জাগিত। হরির বৌ বলিত, "মা ছোট ঠাকুরের ত বিয়ের বয়স হোল, এখন বিয়ের সম্বন্ধ কর!" হৈম অমনি বিষাদের হাসি হাসিত,—প্রভার ছায়া অমনি তাহার চোকের সামনে আসিয়া দাঁড়াইত। জগন্নাথ যদি কোন দিন ছেলের বিবাহের প্রসঙ্গ তুলিয়া দেশে পাত্রীর সন্ধানের পরামর্শ করিতেন, হৈমর চক্ষু ছল ছল করিত। বুঝিয়া আচার্য্য দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেন, বলিতেন "হৈম তুমি পাগল, সে কি বেঁচে আছে তোমার ভরসা হয়?" অমনি দিদির অন্তিম অনুরোধ মনে পড়িত, তিনি চমকিয়া উঠিতেন। আবার বলিতেন, "তাও সত্য, আমরা আর খোঁজও ত করলাম্ না! হয় ত এখন সন্ধান কর্‌লে পাওয়াও যেতে পারে। আমি না হয় নিজে একবার তন্ন তন্ন করে দেখে আসি।" হৈম নত নয়নে অশ্রু বিসর্জ্জন করিত। জগন্নাথ বুঝাইতেন সবই অদৃষ্ট, গোপীনাথের যদি তাই ইচ্ছা, তবে সে দুধের মেয়েটা চুরি যাবে কেন?

হরিও পরভা দিদিকে ভোলেনি—তাই বিয়ের কথা লইয়া

লোকা দাদার সঙ্গে বিদ্রুপ করার দারুণ প্রলোভন সম্বরণ করিত। তাহারও বিশ্বাস, প্রভাকে পাওয়া যেতে পারে। আর একবার তাহার অনুসন্ধানের জন্ত প্রভুর সঙ্গে পরামর্শ করিবে, এইরূপ চিন্তা করিত। কিন্তু দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল।

হরির বৌ লোকনাথকে বলিত "ছোট্ ঠাকুর, চিরকাল আইবুড় থাক্‌বে? মা ঠাকরুণকে বলি, তিনি ত হেসেই উড়িয়ে দেন। তোমার বিয়ের কথা ভেবে আমার ঘুম হয় না!" লোক হাসিয়া বলিত—"দাঁড়াও বউ, হরে দাদার আর একটা বিয়ে আগে হোক্! সেই সম্বন্ধ আমি করচি!"

লোক প্রভাকে ভুলিয়া যায় নাই—পিসিমাকে আর বোনটীকে এক সঙ্গে মনে পড়িত—কিন্তু সে কদাচিৎ! তখন বড় বিষণ্ণ হইত!

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রভার মোহিনী মূর্ত্তি চিত্তপটে দৃঢ়তর অঙ্কিত হইলে পর ভৈরবের চেতনা হইল। প্রভা তাহার পক্ষে দুষ্প্রাপনীয়া বলিয়া যে চিত্তদমনে তাহার প্রবৃত্তি জন্মিল এমত নহে। সে কথা তাহার আদৌ মনে হয় নাই। কিন্তু চির কৌমার্য্য তাহার ব্রত—সংসারী না হইয়া আজীবন গুরুর সাহচর্য্য করিবে এই ত তাহার জীবনের লক্ষ্য। সে ব্রত, সে লক্ষ্য রমণীরূপপ্রবাহে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। চেতনা হইলে ভৈরব দেখিল, দুর্জ্জয় রিপুর সঙ্গে তাহাকে সংগ্রাম করিতে হইবে।

সাতদিনের মধ্যে ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে ভৈরবের অটল মনোদুর্গ রিপুর অধিকৃত হইয়াছে। কেননা প্রভু হইয়াও আত্ম-

দমনের যে কঠোর চেষ্টা এবং শিক্ষা, জীবনে আর কখন তাহার তাহা হয় নাই। পঞ্চবিংশতি বর্ষের ধর্ম্ম রূপলালসা এবং প্রণয়-তৃষ্ণা। ঘটনাধীনে অসামাজিক ভৈরবের জীবনের সে বৃত্তি বিকাশ আজিও হয় নাই, কিন্তু একবার যদি চালিত হইল, তবে তাহার বেগ দুর্দ্দমনীয়। তখন সকল প্রবৃত্তির স্রোত সেই খাতে প্রবাহিত হয়।

সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে কথোপকথনের পূর্ব্বে ভৈরব আত্মদৌর্ব্বল্য অনুভব করিতে পারে নাই। কিন্তু সেই প্রদোষে তাহার জ্ঞান হইল। তাই সে মাতা জগদীশ্বরীর চরণে বালকের ন্যায় রোদন করিল। বালকের রোদনের ন্যায় সে রোদন প্রাণের মর্ম্মতল হইতে উঠিতেছিল, তাই বুঝি মাতা ভবানীর করুণা হইল।

ভৈরব ভবানীমন্দিরে প্রবেশ করিয়াই দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল। সেই ভাবে অধীর হইয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত রোদন করিল। তখন তাহার হৃদয়ে অমিত বলের সঞ্চার হইল। সে যেন জানিল, স্মিতমুখে ভবানী অভয় দিতেছেন। তখন ভৈরব উঠিয়া বসিয়া স্থির করিল, প্রলোভনের পথ হইতে দূরে দাঁড়াইতে হইবে। মন্দির হইতে বাহির হইবামাত্র অদূরের কুটীরের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। তাহার প্রাঙ্গণে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল।

সে কুটীর এখন সন্ন্যাসিনীর দখলে। প্রভা গৃহের ভিতর নিদ্রা যাইতেছিল, সন্ন্যাসিনী প্রাঙ্গণে অগ্নিকুণ্ড মধ্যে আপনার নিয়মিত জপতপে নিযুক্ত ছিল। ভৈরব ক্রমে সে দিকে অগ্রসর হইল।

অতি ধীরে ধীরে ভৈরব কুটীরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল; চরণে চরণ বাঁধিতেছিল, সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছিল, তাহার ভীমের বল টুটিয়া গিয়াছিল। কুটীরের দ্বার মুক্ত, প্রাঙ্গণের অগ্নিস্তূপের আলোক-রাশি তন্মধ্যে [illegible] সেদিকে নেত্রপাত করিবে না এই

তাহার প্রতিজ্ঞা, কি জানি প্রভার মূর্ত্তি দেখিলে যদি আবার চিত্ত অসংযত হয়! কিন্তু চক্ষু তা ত মানিতে চায় না, সন্ন্যাসিনীকে লক্ষ্য করিতে গিয়া সে বারবার সেই কুটীরের পানে ধাবিত হয়। ভৈরব চক্ষু মুদিল, অমনি হৃদয়ে তাহার প্রভার অতুল রূপরাশি ভাসিয়া উঠিল।

ধীরে ধীরে ভৈরব সেইখানে বসিয়া পড়িল। সে আত্মহৃদয়ের দৌর্ব্বল্যে অবসন্ন হইতেছিল। দীর্ঘ নিশ্বাসের উপর তাহার দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতেছিল। এমন সময়ে সন্ন্যাসিনীর দৃষ্টি তাহার দিকে আকৃষ্ট হইল। প্রথমত বিধুমণির আশঙ্কা হইয়াছিল কোন হিংস্র পশু—কিন্তু অগ্নিস্তূপের কাছে হিংস্র জন্তু আসিবে না ইহা তাহার জানা ছিল। সে তখন মনুষ্য নিশ্চয় করিয়া শঙ্কিত হইল। আর্ত্ত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কে ওখানে?"

ভৈরব কাতর অথচ কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিল। এবং লজ্জিত অপ্রতিভ হইয়া সন্ন্যাসিনীর দিকে অগ্রসর হইল। তাহাকে দেখিয়া কিন্তু বিধুমণি আনন্দ প্রকাশ করিল না—সন্দেহপূর্ণ ক্রূর দৃষ্টিতে একবার আগন্তুকের প্রতি, একবার সেই উন্মুক্ত-দ্বার কুটীরের দিকে চাহিতে লাগিল। ক্ষণকালের জন্য পূর্ব্বের সেই নাপিতবধূত্ব আসিয়া তাহাকে অধিকৃত করিল। ভৈরবের উপর সকল বিশ্বাস তন্মুহূর্ত্তে লোপ পাইয়াছিল। ব্যাঘ্রী যেমন শাবকরক্ষায় ভীষণ ঈর্ষার বশ-বর্ত্তিনী হয়, প্রভার ধর্ম্মহানি আশঙ্কায় নাপিতবৌ সেইরূপ হইল। তীব্র কণ্ঠে বলিল—"ভৈরব, এ গভীর রাত্রে এ ভাবে তুমি এখানে কেন?"

সে কণ্ঠে অসহায়ের অন্তিম সাহস এবং সন্দেহের রূঢ়তা যুগপৎ ধ্বনিত হইল। ভৈরব বুঝিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়া গেল। এমন আঘাত তাহার হৃদয়ে আর কখন লাগে নাই। না জানিয়া না শুনিয়া কথ

সময়ে আমরা এইরূপে পরের সরল চিত্ত ব্যথিত করি, পাপ যে জানে না তাহাকে পাপের পথে প্রবৃত্ত করি! মনুষ্যজাতির অধোগতির পথ মনুষ্য নিজে প্রশস্ত করিতে যতটা সক্ষম এবং অনুরত, সংকুচিত করিতে তাহার শতাংশ নহে।

অনেক ক্ষণ ভৈরব নীরবে হৃদয়ের যাতনা সহ্য করিল,—উত্তর দিতে পারিল না। তাহার চির পুণ্য পবিত্রতার জগৎ আজ তাহার কাছে মনুষ্যের ইতর ইন্দ্রিয়গণের বিচরণভূমি মাত্রাত্মক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আপনাকে বড় নীচ মনে হইতে লাগিল। অতি মৃদু স্বরে বলিল—"মা, তোমার কাছেই আমি এসেছি!"

সে কথায় সন্ন্যাসিনীর প্রত্যয় হইল না। সন্দেহের উপর রোষে ক্ষোভে মন তাহার আন্দোলিত হইতেছিল। ভৈরবের উত্তর শেষ হইতে না হইতে সে ব্যঙ্গ করিয়া বলিল।

"চোরের মত এ গভীর রাত্রে আমার কাছে কি প্রয়োজন? আমরা সহায়হীন স্ত্রীলোক, তোমার আশ্রিত! এমনই কি কাজ ছিল যে, এ ভাবে এ রাত্রে না আসিলে নয়?"

বিধুমণি আবার বলিল—এবার চক্ষু মুছিল, বলিল—"আমি একলা হলে এই রাত্রেই এখান থেকে চলে যেতাম, কিন্তু আমি বড় পরাধীন। কাল আর আমাদিগকে এখানে দেখতে পাবে না!"

ভৈরব স্থির কণ্ঠে উত্তর দিল—তাহার সত্যপ্রিয়তা, তাহার নিরপরাধের গর্ব্ব সকলের উপর জয়লাভ করিল। বলিল,

"মা, কিছুই তোমায় লুকাইব না। আমি প্রভার রূপে মুগ্ধ, সে কথা স্বীকার করিতেছি, কিন্তু চোরের মত তাহার ধর্ম্মহানি করিতে আসি নাই। আমার চিরকুমারের ব্রত, প্রভাকে দেখিয়া আমার হৃদয় চঞ্চল হয়েছে। তাহাকে ভুলিব করিয়া ভুলিতে পারিতেছি না। এখানে থাকিতে তাহা পারিব না। তাই আমি শক্তি-কানন ছাড়িয়া

চলিলাম। ভবানীর আদেশ পাইয়াছি, এখন তোমার অনুমতি লইতে আসিয়াছি। তোমায় আমার অনুরোধ, শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ করিও না। কিছুরই তোমার অভাব হইবে না। আমি পাহাড়িয়াদিগকে তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়া যাব।"

এই বলিয়া ভৈরব সন্ন্যাসিনীকে প্রণাম করিল। সেই অগ্নিস্তূপ সম্মুখে, সে ক্ষুব্ধ দর্পিত মূর্ত্তির অবিকম্পিত কণ্ঠে সন্ন্যাসিনীর সন্দেহ দূর হইল। মুহূর্ত্তে সকল বুঝিয়া বড় লজ্জিত হইল। ভৈরবের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিল না। নত নয়নে বলিল—"বাবা, আমার অপরাধ হয়েচে, তুমি দেবতা তা আমি ভুলেছিলাম। তোমার কথায় সবই আমি বুঝতে পারচি। কিন্তু তোমার ঘর ছেড়ে তুমি যাবে কেন? কাল প্রত্যূষে আর আমাদের দেখতে পাবে না! তোমার স্নেহ যত্ন চিরদিন মনে রাখব বাবা—কিন্তু আমরা বড় অভাগিনী, অপরাধ নিও না।"

ভৈরব যোড় হাত করিল। "মা সন্তানের এ অনুরোধ রক্ষা কর। তোমরা এ স্থান ত্যাগ করলেও আমার চিত্ত সংযত হবে না! সে সব আমি ভেবে দেখেছি। এ হৃদয়ের দাহ তোমায় জানাবার কথা নয় মা—কিন্তু তোমার সন্দেহ দূর করার উপায়ান্তর ছিল না! নহিলে ইহকালে এ কথা কেহ জানিতে পারিত না। আমি প্রভার পিতা-মাতার অনুসন্ধানে চলিলাম। যত দিন না ফিরি, তত দিন অপেক্ষা কর।"

এই বলিয়া দ্রুত পদে ভৈরব সন্ন্যাসিনীর কাছে বিদায় হইল। উত্তরের অবকাশ দিল না। চকিতে দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। আর একবার কুটীরের আলোর দিকে চাহিবার লোভ অসম্বরণীয় হইল বটে, কিন্তু তাহা দমন করিল।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ডাকাইতি করিয়া ফিরিতে উদ্ধবের প্রায় দুই মাস অতীত হইয়া গেল। পৌঁছিতে না পৌঁছিতে বিধুমণি ও প্রভার পলায়ন বৃত্তান্ত তাহার গোচর হইল। সে তখন আসিয়া আপনার স্থাপিত কালী-মূর্ত্তির সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইল। অন্ধ ভক্তির তাহার অভাব ছিল না। রোষে ক্ষোভে অধীর হইয়া ইষ্টদেবীর চরণে মর্ম্ম যাতনা নিবেদন করিল। শপথ করিল, প্রতিবিধিৎসা এবং সিদ্ধির যে ব্যাঘাত করিয়াছে, সহোদরা হইলেও তার বাড়া শত্রু নাই। যেমন করিয়াই হউক, তাহাকে শাস্তি দিতে হইবে। বিশ্বসংসার খুঁজিয়াও যদি সে শত্রু মিলে, তাহাও করিতে হইবে। ইহলোকে একমাত্র স্নেহপাত্রী ছিল—ভগিনী, তাহারও অস্তিত্ব উদ্ধব এই ভয়ানক শপথে লোপ করিল। হৃদয়ের কোমল বৃত্তি সকলই প্রায় রুদ্ধ হইয়াছিল, ইহাতে তাহার বিশেষ কষ্ট হইল না। ভীষণ উদ্ধব তান্ত্রিক এই ঘটনায় ভীষণতর হইয়া উঠিল।

শপথ গ্রহণ করিয়া প্রথমেই উদ্ধব ভগিনীর ত্যক্ত কুটীরে পদার্পণ করিল। দেখিল ত্যক্ত হইলেও পাহাড়িয়াদের যত্নে তাহা পূর্ব্ববৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাহারা বাস্তবিক মা-জী ও প্রভার বিরহে কাতর হইয়াছে, আশা করিতেছে আবার তাহারা ফিরিয়া আসিবে। হয় ত কোন দেবকার্য্যে স্থানান্তরে গিয়াছে। প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া উদ্ধব এ কথাগুলি বুঝিল। প্রভার সঙ্গিনী এতোয়ারি আর সোমরির উপর তাহার রাগ। তাহারা যদি কিছু জানে এই ভরসায় তাহাদের উপর অনেক ধমক চমক করিল, কিন্তু কার্য্য সিদ্ধি হইল না। তখন উদ্ধব স্বহস্তে ভগিনীর কুটীর দুইখানি ভূমিসাৎ করিল এবং প্রভার পালিত ছাগলের পাল তাড়াইয়া

আপনার কালীমন্দিরে আনিল। সেই রাত্রে একটী একটী করিয়া তাহাদিগকে ইষ্টদেবীর কাছে বলী দিল—তাহাতে তাহার মনে এক রকম আনন্দ হইল। তার পর সেই রাত্রেই প্রতিজ্ঞা সফলার্থ বাহির হইল। দলের আর কাহাকেও সঙ্গে লইল না—আপনার প্রিয় তরবারি খানি মাত্র লইল।

উদ্ধবের নিশ্চিত ধারণা হইয়াছিল, বিধুমণি কল্যাণপুরে ফিরিয়া গিয়াছে। মেয়েটার জন্য সে বিব্রত, তাহাকে ফিরাইয়া দিতে যাওয়ারই সম্ভাবনা। অতএব উদ্ধব আশার ভর করিয়া সেই পথে চলিল। তাহার মনে হইল না, জগন্নাথ আচার্য্য প্রভার হরণ ও সেই গৃহদাহ ব্যাপারের পর আর কল্যাণপুরে না থাকারই কথা। এ কয় বৎসর তাঁহাদের কোন সন্ধানও করে নাই—যত রাগ ঠাকুর গোপীনাথের উপর, তাঁহার দুর্দ্দশা যথাসাধ্য স্বহস্তে করিয়াছে, অতএব কালাপাহাড় সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়াছিল। কল্যাণপুরের পথে প্রথম দুই দিন আগ্রহে দ্রুত চলিল, তার পর পরিচিত লোকের সঙ্গে সাক্ষাতের আশঙ্কায় সে দিবাভাগে পথ চলা বন্ধ করিয়া দিল। তাহাতেও বিশেষ অসুবিধা। ক্রমে পাহাড় জঙ্গল অন্তর্হিত হইয়া আসিতেছিল, দিনের বেলায় লুকাইবার আশ্রয় কোথায়? মাঘ মাস, মাঠের ধান পাকিয়া গিয়াছে, চাষারা সব তাহা কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে, মাঠে এখন সর্ব্বদা লোক জন, ধান্যক্ষেত্রে লুকাইবার উপায়ও ছিল না। বিশেষ তাহার শ্মশ্রুগুম্ফের অতিরিক্ত প্রাবল্যে সে নিজেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। পথের লোকে হাঁ করিয়া তাহাকে দেখে, ছেলেরা ভয় পায়, মেয়েরা প্রায়ই হাসে,—কোন রসিক রসিকা দুইটা রহস্যের এমন সুপাত্রকে সহজে ছাড়িয়া দেয় না। যে ছাগ জাতিকে যূপকাষ্ঠের শোভা বর্দ্ধন করিতেই সৃষ্ট বলিয়া তাহার সংস্কার ছিল, লোকালয়ের দারুণ বিবেচনায় আপনাকে

তাহারই সঙ্গে সময়ে সময়ে তুলনায় সমালোচিত হইতে দেখিয়া উদ্ধব রোষে ক্ষোভে ফুলিত। কিন্তু কি করে? তরবারি খানি পর্য্যন্ত বস্ত্রের নিভৃতে তাহাকে লুকাইয়া রাখিতে হইয়াছে। শেষে সে ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল, দাড়ি গোঁফ কামাইয়া প্রচ্ছন্ন বেশ ধরিবে। একবার বৈষ্ণব সাজিবার লোভ হইল, কিন্তু গোঁড়া শাক্ত প্রাণ ধরিয়া তাহা পারিল না। দাড়ি গোঁফ কামাইয়া লোক-যন্ত্রণা দূর হইল বটে, কিন্তু অন্তর্যাতনা কিছুতেই দূর হয় না। কে চিনিবে—পত্নীহন্তা, দেবদাহী বলিয়া কোন্ পরিচিত লোক ধরিয়া রাজদ্বারে লইয়া যাইবে, এ ভাবনায় সে সর্ব্বদা সশঙ্ক। অতএব উদ্ধব দিনের বেলায় কোন সরাই বা দোকানে কোন রকমে লুকাইয়া থাকিত, সন্ধ্যা হইলে পথ চলিত। এইরূপে পাঁচ দিনের দিন গভীর রাত্রে সে জন্মভূমিতে উপস্থিত হইল।

প্রথমে ভগিনীর গৃহে গেল। সাত সাত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, সংস্কারাভাবে সে গৃহের চাল পর্য্যন্ত নাই। কেবল ভগ্নপ্রাচীর অন্ধকারে নীরবে পূর্ব্বস্মৃতি বহন করিতেছিল। নিকটেই সোহাগীর মার ঘর তাহা পূর্ব্ববৎ আছে। এ কয় বছরে সোহাগীর ২।৩টী ছেলে হইয়াছে, সে সম্প্রতি মাকে দেখিতে এসেছে। ঘরে স্তিমিত প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহার ছোট মেয়েটী কাঁদিতেছিল। চোরের মত উদ্ধব গৃহপশ্চাতে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, যদি মায়ে ঝিয়ে বিধুমণি সম্বন্ধে কোন কথা বলে। আশা সফল হইল না। তখন সে আচার্য্য গৃহে উপস্থিত হইল। সে সুখের গৃহ এখন নীরব! শিষ্যদের যত্নে ধ্বংস হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার সুখের প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছিল। আঁধারের উপর বিষাদের ছায়া তাহা আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। বুঝিয়া উদ্ধব নিতান্ত অসুখী হইল না—তাহার প্রতিহিংসাবৃত্তি অন্ততঃ কিয়দংশেও

যে চরিতার্থ হইয়াছে, এ গৃহে তাহার প্রমাণ পাইয়া ঈষৎ আনন্দানুভব করিল। কিন্তু সে পলক মাত্রের জন্য। চৌকীদারের হাঁক, ডাক শুনিয়া তাহার মনে ভয় হইল—চোরের মত লুকাইয়া লুকাইয়া গ্রাম পরিত্যাগ করিল।

গ্রামের বাহিরে এক প্রাচীন ভগ্ন মসজীদ, এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ তাহাকে আশ্রয় করিয়া উঠিয়াছে। ভূতের ভয়ে সচরাচর লোকে সেখানে যাইত না—উদ্ধব দিনের বেলায় সেইখানে লুকাইয়া রহিল। রাত্রে আবার পূর্ব্ববৎ চোরের মত গ্রামে প্রবেশ করিয়া সোহাগীর মার গৃহপশ্চাতে কান পাতিয়া রহিল—সে দিন শুনিল, তাহারা আপনাদের সুখের দুঃখের কথা কহিতেছে।

কষ্টে অত্যন্ত হইলেও উদ্ধব দুই দিনেই অধীর হইয়া উঠিল, প্রায় অনাহারে আর দিন যায় না। সঙ্গে যে সামান্য তণ্ডুল ছিল, দুই দিন অপকাবস্থায় তাহাই চর্ব্বণ করিয়া কাটাইল। আর ছিল গঞ্জিকা এবং তাহার উপকরণ—কিন্তু নেশা ছুটিয়া গেলে ক্ষুধার জ্বালা তীব্রতর হয়। তখন সে সঙ্গে আর কাহাকেও আনে নাই কেন বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিল।

সঙ্গে কিছু অর্থ ছিল, অতএব তৃতীয় দিন সন্ধ্যার সময় উদ্ধব গ্রাম ছাড়িয়া ভাগীরথীর তীরে তীরে কাটোয়াভিমুখে চলিল। চারি দণ্ডের মধ্যে বাজারে উপস্থিত হইয়া প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র কিনিল, গঙ্গাতীরে গিয়া অন্ন প্রস্তুত করিয়া তিন দিনের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিল। তার পর সপ্তাহের আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া আবার চোরের মত পূর্ব্ব পথে কল্যাণপুরে ফিরিয়া আসিল। এবার নিশ্চিন্ত হইয়া কিছু দিন প্রতীক্ষা করিতে পারিবে এ ভরসা হইল। গভীর রাত্রে ভগ্ন মসজীদের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আবার গ্রামাভিমুখে গেল। আজি আর শুধু সোহাগীর মার ভরসা করিল না। গৃহস্থ সকলেই

সুষুপ্ত, ক্বচিৎ কুক্কুরের রব শুনা যায়, অন্ধকার রাত্রে চৌকীদারদের হাঁকডাঁক তত রাত্রে বড় শুনা যায় না। উদ্ধব সাহসে ভর করিয়া স্থির করিল, কালি হইতে প্রথম রাত্রে গৃহে গৃহে এইরূপে ফিরিতে হইবে, গল্পে গল্পে কেহ না কেহ জগন্নাথ আচার্য্য সংক্রান্ত কথা তুলিবে।

সোহাগীদের ঘর কতকটা গ্রামের প্রান্তে—সন্ধ্যার পর যথেষ্ট নির্জ্জন। চতুর্থ রাত্রে উদ্ধব পূর্ব্ব রাত্রির সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিল। ৪।৫ দণ্ড রাত্রি হইতে না হইতে সে বিধুমণির ভগ্ন-প্রাচীর গৃহে প্রবেশ করিল। সেখান হইতে লক্ষ্য রাখিল, কতক্ষণে সোহাগীরা দ্বার রুদ্ধ করে। তাহার বড় দেরি হইল না। উদ্ধব সাহসে ভর করিয়া আজ দাওয়ায় উঠিয়া রুদ্ধ-দ্বারে কান পাতিয়া বসিল।

সোহাগী শিশু কন্যাকে স্তন্য পান করাইতে করাইতে সুধাইল—"কে বল্লে মা, আচায্যি ঠাকুররা ফিরে আস্‌বে?"

দ্বারের ছিদ্র দিয়া উদ্ধব দেখিতে পাইল, সোহাগীর মা প্রদীপের কাছে বসিয়া আপনার পায় তেল মাখিতেছিল, এবং ইহার মধ্যেই এক একবার ঢুলিতেছিল। আচায্যি ঠাকুরের নাম শুনিয়াই তাহার চমক হইল—সে চক্ষু বিস্তার করিয়া বলিল, "কেন, কিছুই তুই শুনিস্‌ নি? গাঁ টি টি হয়ে গেল যে! পেভাকে পাওয়া গিয়েচে, ছোট্ ঠাকুরের তার সঙ্গে বৈশাখ মাসে বিয়ে! আচায্যি ঠাকুরেরা তাই সব আস্‌চে।"

সোহাগী অবিশ্বাসের মাথা নাড়িল, মার কথায় তাচ্ছিল্য করিয়া বলিল—"তোর সব কথাইতে গাঁয়ে টি টি। আর ত কেউ বলচে না যত ছিষ্টির খবর তোর কাছে মা! সে মেয়ে আবার পাওয়া যাবে! যমের বাড়ী থেকে মানুষ আবার ফিরে আসে!"

সোহাগীর মা বলিল—"মিছে কথা নয় সোয়াগি—সত্যি কথা।

কাঁটোমার ভট্‌চাষ্যিদের বড় বউ ছিবেন্দাবন থেকে ফিরে এসে গল্প করেচে—বৈষ্ণবদের সাদি শুনে এসে গাঁময় বলেচে। বুড় সর্দ্দার শুনে আহ্লাদে কেঁদে ফেলেছিল—সে কাল কাঁটোমায় যাবে ভট্‌চাষ্যি বাড়ী।"

সোহাগী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। বলিল, "ভদ্দর নোকের ঘর, সে মেয়ে পাওয়া গেলেই কি বিয়ে দেবে মা? তার মা বাপ মরা মেয়ে। খুড়ী চুরী করে নিয়ে গিয়ে তার কি দশা করেছে কে জানে? তাতে আবার নোকে বলে উদোমামার এ সব কাজ। সে কি আর পণ্ডিতের মেয়েকে আস্ত রেখেচে?"

এবার সোহাগীর মার মনোযোগ যাত্রা নাপিত বউর প্রতি আকৃষ্ট হইল। মেয়ের কাছাকাছি সরিয়া আসিয়া, এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া বিস্তৃত নয়নে বলিল—"সত্যি কথা সোয়াগি, তোর খুড়ীর কথা শুন্‌লে গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌তে ইচ্ছে করে। ছোট্ ঠাকুর কি কালসাপ বিয়ে করেই এনেছিল, তার জ্বালায় আমরা মুখ পাইনে। তুই তখন পেত্তয় করতিস্ নে—মায়ের পেটের ভাই শুন্‌লে কানে হাত দিতে হয়!"

উদ্ধব উভয় কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া ইষ্টদেবীকে স্মরণ করিল, এবং উঠিয়া দাঁড়াইল। সোহাগী বলিল,—"ছি ও আবার কথা, আমার পেত্তয় হয় না—তুই শো, আর পাপ কথায় কাজ নেই।"

ধীরে ধীরে উদ্ধব মসজীদে ফিরিয়া গেল—সে রাত্রে আর বাহির হইল না। শেষ রাত্রে সোজা পথে কাটোয়ায় গেল, সেখানে লুকাইয়া লুকাইয়া ভট্টাচার্য্য বাড়ীর অনুসন্ধান করিল। দুই দিনেই তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। গঙ্গাস্নানে আসিয়া শ্রীবৃন্দাবন ফেরত বড়বউ "বেন্দাবনের" গল্প করিতেছিলেন।—জগন্নাথ আচার্য্য, তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রের অনেক সুখ্যাতি করিলেন। বিবাহের ইঙ্গিত মাত্র

দিলেন,—প্রভা রাজমহল অঞ্চলে কোথায় আছে, খবর পাইয়া আচার্য্য তাহাকে আনিতে গিয়াছেন, এ কথাটা বলিলেন।

স্বকর্ণে উদ্ধব এ কথা শুনিল। তাহার উদ্দেশ্য সফল হইল।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই রাত্রেই ভৈরব পাহাড় বস্তিতে উপস্থিত হইল এবং অনুগত পাহাড়িয়াদিগকে অনুরোধ করিল, যত দিন না নিজে ফিরিয়া আসে, তাহারা সর্ব্বদা যেন শক্তিকাননের রক্ষণাবেক্ষণ করে। স্ত্রীলোক দুটি তাহার অবর্ত্তমানে কোন বিষয়ের অভাব বুঝিতে না পারে, এজন্য ভৈরব বিশেষ রকম বন্দোবস্ত করিল। রাত্রে দুই জন প্রধান পাহাড়িয়া পর্য্যায়ক্রমে শক্তিকানন রক্ষা করিবে এইরূপ স্থির হইল। ভৈরবের আজ্ঞা তাহাদের কাছে গুরুবাক্য তুল্য, অন্যথা হইবার নহে।

প্রভাতে ভৈরব দৃঢ় সংকল্পে কল্যাণপুরাভিমুখে চলিল,—ক্রমে পাহাড় জঙ্গল অতিক্রম করিয়া সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িল। সে স্বভাব শিশু, চিরকাল প্রকৃতির শোভার ক্রোড়ে পালিত; যেখানে যায়, সর্ব্বত্র মাতা প্রকৃতির সহাস্য মূর্ত্তি তাহার হৃদয় প্রফুল্লিত করে। এবার সে ভাব যে ছিল না এমত নহে, কিন্তু যেখানে কেবল মাতার ভক্তি ও স্নেহ, সে স্থান বাঞ্ছিতের প্রীতি ও সৌন্দর্য্য আসিয়া অধিকৃত করিয়াছিল। প্রতি পদে ইহা সে অনুভব করিতে লাগিল। ভরসা ছিল, শক্তিকানন ছাড়িলেই প্রভার মূর্ত্তি দিনে দিনে হৃদয় হইতে মুছিয়া যাইবে, কিন্তু কৈ তাহা ত হইল না! যা কিছু সুন্দর মনে হয়, তার সঙ্গেই প্রভা জড়িত। ঝরণার ধারে বসিয়া রুক্ষকেশা গৈরিকবসনা মোহিনীকে যে একদিন বিমুগ্ধ নেত্রে জল

বুদ্বুদের ক্রীড়া দেখিতে দেখিয়াছিল, একদিন যে তাহকে সাশ্রু-নয়নে—ভাসা ভাসা পদ্মের দলে যেমন জলবিম্ব, সেই চক্ষুতে স্নেহময়ী বালিকা যে মাতৃ-ক্রোড়-বিচ্যুত হরিণ শিশু দুটির পানে চাহিয়াছিল, আর একদিন সে যে বৃক্ষতলে সন্ন্যাসিনীর কাছে বসিয়া অস্তগামী সূর্য্যের হেমাভ কিরণ শৈল-শির-সঞ্চিত মেঘের উপর প্রতিভাত হইতে দেখিয়া আনন্দে ঈষৎ হাসিয়াছিল,—যত অগ্রসর হয় ততই দিনের পর দিনের এই সব স্মৃতি ভৈরবকে আকুলিত করিতে লাগিল। কাতর হৃদয়ে সে মা ভবানীকে স্মরণ করিত, অমনি তাঁহার বরাভয় প্রদায়িনী মূর্ত্তি আসিয়া তাহাকে বল দিতেন।

ভৈরব নিঃসম্বলে বিনা অস্ত্রে বাহির হইয়াছিল। সমস্ত দিন পথ চলিয়া প্রথম দিন সন্ধ্যার সময় এক গ্রামে গিয়া পৌছিল। তাহার বীর মূর্ত্তিতে একটা শক্তি ছিল, যাহা দর্শক মাত্রকে আকৃষ্ট করিতে পারিত। গ্রামের লোক তাহাকে দেখিয়া বেড়িল। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গ্রামের প্রধান লোক, শিষ্ট শান্ত ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি, তাঁহার যত্নে ভৈরব তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিল। আবার রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই পথ চলিতে লাগিল। দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যার সময় দৌলতপুর নামে এক গ্রামে পৌছিল, সেখানেও আতিথ্য জুটিয়া গেল। গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া তাহাকে দেখিতে আসিল। ভৈরব দর্শকদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, কল্যাণপুর সেস্থান হইতে কত দূর? সোহাগীর শ্বশুরালয় এই গ্রামে, তাহার স্বামী চরণ প্রামাণিক উপস্থিত ছিল। অমনি ৫।৭ জনে এক সঙ্গে বলিল, "বল না চরণ, তোমার শ্বশুরবাড়ী কতদূর?" কিন্তু চরণ বলিতে না বলিতে তিন জনে তিন রকম উত্তর এক সঙ্গে দিল। এক-জন বলিল "আজ্ঞে দশ ক্রোশ, দেবতা!" কেহ বলিল একদিনের পথ, কেহ বলিল প্রহরের।

চরণ সম্মুখে আসিয়া করযোড়ে বলিল "কল্যাণপুর দেবতা আমার ঘরের নোকের বাপের বাড়ী,—আমার শ্বশুর বাড়ী। দেবতার সেখানে কি পিয়োজন? অবদান হয় ত আমি সঙ্গে যেতে পারি—এক দুপুরের পথ।"

ভৈরব ধীরে ধীরে সুধাইল "সেখানে জগন্নাথ আচার্য্যের বাড়ী। তুমি বোধ হয় তাঁকে চেন। তাঁর সম্বাদ কি?"

চরণকে জবাব দিতে হইল না। দর্শকবৃন্দের মধ্যে ৪।৫ জন জগন্নাথের শিষ্য, তারা আত্মপরিচয় দিবার এ সুযোগ ছাড়িতে পরিল না। সকলেই বলিল, তিনি সাত বৎসর হইতে চলিল শ্রীবৃন্দাবন বাস করিতেছেন। কেহ তাহার আনুপূর্ব্বিক কারণ বলিতে চাহিল, কেহ সুধাইল তাতে তাঁর কি দরকার? কেহ জিজ্ঞাসা করিল "আচার্য্য ঠাকুর সম্বন্ধে তাঁর কে হন?"

ভৈরব কোন উত্তর দিল না। সে পথে আর গেল না। মধ্যাহ্ন রাত্রে গ্রাম ত্যাগ করিল। তখন শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিল।

দেড় মাসে ভৈরব সে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিল। অনেক কষ্ট, যাহা গৃহীর অসহনীয়, তাহা সে অনায়াসে সহিল। অনাহার অনিদ্রা গ্রাহ্য করিল না। ইহার ফলে তাহার সে দিব্যশ্রী মলিন হইয়া গেল। না হইবার কথা নহে। শারীরিক কষ্টের সীমা ছিল না, হৃদয় প্রভার চিন্তায় কীটদষ্ট পুষ্পের মত দিনের পর দিন অবসন্ন হইতেছিল। তথাপি সে প্রভার হিতকামনায় মনের একাগ্রতা স্থির রাখিল।

শ্রীবৃন্দাবনে জগন্নাথ আচার্য্যের সন্ধানে তাহার বিলম্ব হইল না। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ নানা কারণে ভৈরব প্রার্থনীয় মনে করিল না। দেখিল, সেই হরিদাস অহোরাত্র কুঞ্জে কুঞ্জে পরিভ্রমণ করে, তাহার দ্বারা কার্য্যসিদ্ধির উপায় স্থির করিবে ভাবিল।

সন্ধ্যার পর হরি হরিনামের মালা জপিতে জপিতে ধীরে ধীরে অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন পথে গৃহে ফিরিতেছিল। ভৈরব আসিয়া তাহার অনতিদূরে দাঁড়াইল। হরির দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্নতা কমিয়া আসিয়াছিল, দেখিল দীর্ঘ পুরুষমূর্ত্তি, কিন্তু চিনিতে পারিল না। আপন মনে চলিয়া যাইতে লাগিল। ভৈরব গম্ভীর স্বরে ডাকিল "হরিদাস!"

হরি তখন বিশ হাত দূরে চলিয়া গিয়াছে। সে বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে শুনিল, সেই দীর্ঘ মূর্ত্তি বলিতেছে, "ঐখানে দাঁড়াও, আর অগ্রসর হইও না। আমার পরিচয়ে কাজ নাই। তোমার গুরুকন্যার সম্বাদ দিতে তোমায় ডাকিয়াছি। প্রভা রাজমহল অঞ্চলে শক্তিকানন নামক স্থানে বাস করিতেছেন। শীঘ্র তাঁহার সন্ধানের জন্য তোমার গুরুদেবকে অনুরোধ করিও, নহিলে বিপদ ঘটিতে পারে।"

হরির বিস্ময়ের সীমা ছিল না। তাহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইতে না হইতে ভৈরব অন্তর্দ্ধান হইল। হরি দেখিল, দীর্ঘ মূর্ত্তির ছায়া মিশাইয়া গেল—কিন্তু তখনও তাহার গম্ভীর কণ্ঠ তাহার কানে বাজিতেছিল।

ত্রয়শ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

গভীর রাত্রে ভৈরব যমুনাতীরে বসিয়া তাহার কাল জলে নক্ষত্র ছায়ার মধুর নৃত্য দেখিতেছিল। যে সংকল্প গ্রহণ করিয়া প্রায় দুই মাস সে শক্তিকানন ত্যাগ করিয়াছিল, আজ তাহা সফল হইয়াছে। কিন্তু এতদিন তবু একটা কাজ ছিল, তাহার উৎসাহে প্রাণে বল ছিল, আজ সে বল হ্রাস হইয়াছে, হৃদয় বড় দুর্ব্বল। প্রভাময় জগৎ—ভুলিবে কি, তাহার স্মৃতি ছাড়া সংসারে আর তিষ্ঠান

যায় না। ভৈরব বালকের ন্যায় রোদন করিতেছিল, ধারার উপর ধারা নীরবে গণ্ড বাহিয়া পড়িতেছিল। অনেক কালের অনেক প্রেমাশ্রু যমুনার এই কালো জলে মিশিয়া আছে—ভৈরবের অশ্রুও মিশিতেছিল কি না কে বলিবে?

অনেক ক্ষণ ভৈরব বিবশ হইয়া রোদন করিল: তখন ভাবিল এ দুর্দ্দম হৃদয় লইয়া কি করিব? জীবনের ব্রত ত ভাঙ্গিয়া গেল। এখন আজি কেন এই নক্ষত্রখচিত, প্রশান্ত যমুনাবক্ষে জীবনের ভার বিসর্জ্জন করি না! এ যাতনা ভাল না সে মৃত্যু ভাল?

সহসা নক্ষত্রময় নীলাকাশে তাহার দৃষ্টি পড়িল। সহসা যেন সেই নক্ষত্র শোভা ম্লান করিয়া গগনব্যাপিনী স্ত্রীমূর্ত্তির ছায়া তাহাতে অঙ্কিত হইল। মূর্ত্তি মুহূর্ত্তে স্পষ্টীকৃত হইল। এ কি এ—শক্তিকাননের মাতা ভবানী এ বিস্তৃত রুদ্র মূর্ত্তিতে—ভৈরব জানু পাতিয়া করযোড়ে ঊর্দ্ধগ্রীব হইয়া ডাকিতে লাগিল। "রক্ষা কর মা, বল দাও মা! মা তোমার ঐ রুদ্র মূর্ত্তিতে আমার জ্ঞান হইল। এ হৃদয় দমন করিব।" রুদ্রমূর্ত্তি সহসা আবার প্রসন্নময়ী হইলেন। চকিতে ছায়া মিলাইয়া গেল।

তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া ভৈরব রাজমহল অঞ্চলের নিকটবর্ত্তী হইল মনে একটা বলের সঞ্চার হইয়াছিল—ব্যথিত হৃদয় শান্ত হইয়াছিল—জীবনের চিরব্রত অবশ্য পালনীয় বলিয়া আবার বুক বাঁধিয়াছিল। প্রভার কথা ভোলে নাই—ভুলিবে কি তাহাই এখন সর্ব্বস্ব, কিন্তু প্রণয় ভোগস্পৃহার সে স্বার্থভাব এবং চাঞ্চল্য আর ছিল না। বাঞ্ছিতের মঙ্গল মন্দিরে সে প্রাণের প্রাণ বলী দিতে এখন সমর্থ। প্রভা সুখী হউক এই এখন তাহার কামনা। তাহাকে তাহার পিতা-মাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া নিজের স্বধর্ম্ম পালন করিবে এই তাহার সংকল্প। প্রভাকে ভুলিতে ত পারিবে না, কিন্তু দেবী বলিয়া মনো-

মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিবে। ইহাতে কি ক্ষতি? তাহাতে স্বধর্ম্ম পালনে ত কোন ব্যাঘাত হইবে না!

মনের এই অবস্থায় প্রায় তিনমাসের পর সন্ধ্যাকালে ভৈরব শক্তিকাননে ফিরিয়া আসিল। সে দিন অমাবস্যা—সন্ধ্যা হইতে না হইতে ঘোর তিমিরে সংসার ভরিয়া গেল। ভৈরবের হৃদয়ের সে চাঞ্চল্য আর ছিল না বটে, কিন্তু শক্তিকাননে প্রবেশ করিতে তাহার পা কাঁপিতে লাগিল। সহসা ভবানীমন্দিরে উপস্থিত হইতে তাহার সাহস হইল না। তখন স্থির করিল, আপাততঃ বাহিরে অপেক্ষা করিবে, তার পর পাহাড়িয়া কাহারও সাক্ষাৎ পাইলে প্রভাদের সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিবে। অথবা অধিক রাত্রে তাহারা সব নিদ্রা গেলে যাইবে। কোন মতে ভৈরব সহসা প্রবেশ করিবার মানসিক দৃঢ়তা সংগ্রহ করিতে পারিল না।

রাক্ষসাকৃতি শাল গাছেরা শনৈঃশনৈঃ মাথা নাড়িতেছিল, কচিৎ কাহারও শাখাপ্রশাখার অবকাশ পথে একটী নক্ষত্র দেখা যাইতেছিল। ভৈরব তাহাদের নীচে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। সেই ভাবে আপনার মানসিক অবস্থার আলোচনা করিল। তিন মাসে কি পরিবর্ত্তন! নিজের এই চির বাস ভূমে আজ চোরের মত লুকাইয়া থাকিতে হইয়াছে ভাবিয়া এক একবার আত্ম-গ্লানি হইতেছিল।

সহসা ভৈরব এক শাল গাছের পশ্চাতে গিয়া লুকাইল, কেননা তাহার বোধ হইল এক ব্যক্তি অনতিদূরে চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে। আঁধারে তাহাকে চেনা গেল না, কিন্তু তাহার সচকিত ভাব এবং দুরভিসন্ধি তাহার প্রতি-পদক্ষেপে, প্রতি মস্তকসঞ্চালনে প্রকাশ পাইতেছিল। তাহাকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিবার জন্য ভৈরব বৃক্ষপশ্চাতে লুকাইল।

দেখিল তাহার হস্তে তরবারি বা তদ্রূপ কোন অস্ত্র। স্থূলাবয়ব উদ্ধব ডাকাইতকে তাহার মনে পড়িয়া গেল—কিন্তু শ্মশ্রু নাই দেখিয়া তাহাকে মনে স্থান দিল না। যাহা হউক, প্রভা ও মাজীর বিপদাশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হইল। সে দৃষ্টির বাহির হইলে ভৈরব অন্য পথে সাবধানে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইল। সকল পথই তাহার চিরপরিচিত। আঁধারে সোজা পথ বাছিয়া লইতে কষ্ট হইল না।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

জগন্নাথ আচার্য্য প্রভার অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছেন—সঙ্গে ভৃত্য হরিদাস। সাত বৎসর পরে শ্রীবৃন্দাবন ধাম ত্যাগ করিতে তাঁহার কষ্ট হইল—কেননা তাহা ছাড়িয়া এক পদও যাইতে আর ইচ্ছা ছিল না। প্রভার সংবাদ হরি যাহা অপরিচিত দীর্ঘ পুরুষের মুখে সেই স্থান এবং কালে শুনিয়াছিল, গোপনে প্রভুকে তাহা নিবেদন করিয়াছিল। আর কাহাকেও বলা কর্ত্তব্য বোধ করে নাই। জগন্নাথও সংবাদের স্থান, কাল এবং পাত্র বিচার করিয়া কাহারও কাছে তাহা ব্যক্ত করিলেন না। সাত বৎসর পূর্ব্বে জগদীশের ভবিষ্যদ্বাণী আবার বিদ্যুৎবৎ তাঁহার মনে উদয় হইল। কাহারও কাছে কোন কথা ভাঙ্গিলেন না। হৈমকে বলিলেন "মেয়েটার একবার খোঁজ করে আসি। যদিই গোপীনাথ দয়া করে এত দিন পরে ফিরে দেন।" হৈমর মুখশ্রীতে আশা ভাসিতেছিল, তাহার সজল চক্ষে জল আসিল।

লোকু বলিল "বাবা, এ বয়সে তোমার আর বৃন্দাবন ছেড়ে কাজ নেই! বড় কষ্ট হবে। বোনটার খোঁজে আমি যাই, হরে দাদা না হয় আমার সঙ্গে চলুক!"

জগন্নাথ বিষাদভরা স্নেহের হাসি হাসিলেন। বলিলেন "লোকু, কোথায় তুমি যাবে বাবা? বন জঙ্গলে কখন ত তুমি বেড়াওনি! চিরকাল আমি পদব্রজে বেড়িয়েচি—আমার কোন কষ্ট হবে না বাবা! মহাপ্রভু যখন তখন বেরুতেন, সঙ্গে কাউকে নিতেন না। আমার কি এতটুকু ভক্তিও নেই যে সামান্য ভ্রমণে কষ্ট হবে? শীঘ্র ফিরে আসব। তোমরা সব নিশ্চিন্ত থেকো!"

কিন্তু তাঁহারা পথে বাহির হইতে না হইতে বৃন্দাবনময় রাষ্ট্র হইল, জগন্নাথ আচার্য্যের পালিতা কন্যাকে রাজমহলের কাছে পাওয়া গিয়াছে, তিনি তাহাকে আনিতে গিয়াছেন—লোকনাথের সঙ্গে বৈশাখ মাসে তাহার বিবাহ! অপরাধের মধ্যে যাত্রার পূর্ব্ব দিন হরিদাস এক আখড়াধারী প্রাচীন বৈষ্ণবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, রাজমহলের সোজা পথ কোন্‌টা? এবং বাবাজীর সেবাদাসী ললিতাসুন্দরীর কানে কথাটা উঠিয়াছিল! অতএব জগন্নাথের বৃন্দাবন-ত্যাগের পর দিন প্রাতঃকালেই বৃন্দাবনবাসিনী বাঙ্গালিনী মহাশয়াদের পদরজ তাঁহার গৃহ পবিত্র করিতে লাগিল। সবাই আসিয়া বলে—"বলি লোকুর মা, বলি এমন খোস্‌খবর, তা আমাদিকে বল্‌তে নেই! তোমার সে মেয়ে না কি পাওয়া গেছে, লোকুর না কি বিয়ে?" হৈম আকাশ হইতে পড়িলেন। মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, "তা ত জানিনে। তবে যদি পাওয়া যায়, তাই তাঁরা, খুঁজিতে গেছেন বটে।"

তাঁহার কথা কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ করিল না। হৈম কাহাকেও অসন্তুষ্ট করিলেন না। কাহাকেও প্রণাম করিয়া বলিলেন, "তাই হোক্, তোমরা আশীর্ব্বাদ কর!" কাহাকেও মধুর হাসিয়া বলিলেন—"খোসখবরের ঝুটও ভাল বোন্—তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক!"

মধ্যাহ্নে যে দল এইরূপে জগন্নাথের গৃহ পবিত্র করিতে আসিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কাটোয়ার সেই ভট্টাচার্য্য বাড়ীর বড়বধূ একজন। পথে আসিয়া তিনি বলিলেন, "কি সুন্দর মানুষ—যেমন রূপে তেমনি গুণে! কাল বাদে পরশু নাতির মুখ দেখ্‌বে, এখনও কেউ ভাল করে মুখ দেখ্‌তে পায় না। ছেলে কাছে দাঁড়ালে কার সাধ্যি বলে এই ছেলের মা!" চুপির সরকারদের মেয়ে বিনোদ বলিল, "মানুষ ভাল একটু ন্যাকা। সোয়ামী গেছে খোঁজে, ও'কে বলে যায়নি! কও কেন ও কথা!" শ্রীখণ্ডের আমোদিনী বলিলেন —"মানুষটোর সবই গুণ, একটু কেবল কাচ! এ বয়সে কি ভাই মাথায় কাপড় মানায়?" বলা বাহুল্য, রাঢ়ের ঈষৎ টানে এই সমালোচনার ভাষা অলঙ্কৃত হইতেছিল। কিন্তু তাহার পরিচয় আর দিয়া কাজ নাই। আমাদের বোধ হয়, অজাতশত্রু কথাটা কেবল কথার কথা। এ সংসারে সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া চলা অসম্ভব ব্যাপার।

কথা যদি উঠিল, তবে লোকনাথের কানে না উঠিবে কেন? হরির বৌ বলিল—"বলি ছোট ঠাকুর, আইবুড় নাম এইবার ঘুচল! পেত্তা ঠাকুরঝিকে না কি পাওয়া গেছে?" লোকু দেবরের মত ভাবিল, 'তামাসা—তামাসায় উত্তর দিল, "তাই যদি হয়, তবে বউ তুমি আর হয়ে দাদার ঘর আলো কবৃতে আস্‌তে না। কেষ্টার মামা ত'হলে আপনার শ্যালা আপনি হোত!" কিন্তু রঙ্গপ্রিয় ঠাকুরাণীরা সহজে ছাড়েন না—বিয়ের দুটো রঙ্গের কথা বলিবার জন্ত তাঁরা যেথায় লোকনাথ পুঁথির সাগরে ডুবিয়া আছে, সেখানে পর্য্যন্ত চড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। লোকু বিরক্ত হইয়া উঠিল মুখ ভা। করিয়া মা'র কাছে গেল, বলিল "এ সব কি কথা মা

বোন্‌টীর সঙ্গে বিয়ের কথা! শুন্‌লে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হয়। তোমরা এ সব কথায় বুঝি প্রশ্রয় দিয়েছ?" মা প্রথমে চুপ করিয়া রহিলেন পরে বলিলেন—"এ সব ত অনেক দিনের কথা বাবা! তোমার পিসিমার শেষ অনুরোধও এই!" লোকনাথ নত মুখে মাটী খুঁড়িতে লাগিল।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

জগন্নাথ শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করার দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যাকালে জগদীশ তথায় উপস্থিত হইলেন। শুনিলেন তিনি রাজমহল অঞ্চলে যাত্রা করিয়াছেন। কেন গিয়াছেন, তাহাও শুনিলেন—জনরব অতিরঞ্জিত, শাখাপল্লবিত হইয়া ছোট খাট দিব্য একটী গল্পে পরিণত হইয়াছিল। জগদীশের অবিশ্বাসের কারণ ছিল না। সাত বৎসর পূর্ব্বে নিজে গণনায় যাহা বুঝিয়াছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। জগন্নাথের স্ত্রী-পুত্র সেখানে আছেন জানিয়াও তাহাদিগকে দেখা দিলেন না। যে পথে আসিয়াছিলেন, আবার সেই পথে চলিলেন।

জগদীশ অপেক্ষাকৃত সোজা পথে জগন্নাথকে যখন ধরিলেন, শক্তি-কানন তখন এক দিনের মাত্র ব্যবধান। তাঁহাকে দেখিয়া আচার্য্য আনন্দিত হইলেন। আগ্রহে জিজ্ঞসা করিলেন, "বৃন্দাবন ধামে আমার মনে হয় নাই, কিন্তু পথে আসিয়া স্মরণ হইল, রাজমহলের শক্তি-কাননে তোমার আশ্রম। প্রভাকে না কি পাওয়া গিয়াছে?"

জগদীশ আপনার ভ্রমণের কথা সংক্ষেপে বলিলেন। তাহার কারণ পরে বলিবেন বলিয়া জগন্নাথের উদ্দীপ্ত কৌতূহল নিবারণ করিলেন। প্রভার সংবাদ সম্বন্ধে উভয়েরই সমান জ্ঞান। কন্যার

হরণ-বৃত্তান্ত শ্রীবৃন্দাবনে শুনিয়াই তিনি চিত্ত স্থির করিয়াছিলেন, জগন্নাথের কথায় নূতন করিয়া উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ ছিল না।

যখন সাক্ষাৎ হইল, তখন অপরাহ্ণ হইয়াছিল। সে দিন বিশ্রাম করাই স্থির হইল—-তিনজনেই ক্লান্ত হইয়াছিলেন।

সে স্থান পাহাড়ের ঠিক্ নীচে, ক্ষুদ্র গ্রামে পাহাড়িয়ারা বাস করে। তাহারা তিন জন গোঁসাইকে একত্র দেখিয়া কৃতার্থ হইল। সামান্য সংস্থানে যাহা জুটিল, আনিয়া তাঁহাদের পরিচর্য্যায় ব্রত হইল। হরি এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষতলে রাত্রির আশ্রয় স্থির করিয়া, ইহার মধ্যেই তাহা দখল করিয়া বসিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে পাহাড়িয়ারা স্ত্রী-পুরুষে ইন্ধনের রাশিতে তাহার একধার ঢাকিয়া ফেলিল।

অতএব সন্ধ্যা হইতে না হইতে শীতার্ত্ত হরিদাস কাছে কাছে তিন অগ্নিকুণ্ডের আয়োজন করিল। আর সে গোঁড়ামি ছিল না, তান্ত্রিকের কাছে বসিতে আর আপত্তি ছিল না। বুঝিয়া জগন্নাথ হাসিলেন, বলিলেন "সাত বছর আগে সে রাত্রের কথা মনে পড়ে হরি? সাত বছরে আমরা কতখানি বদলে যাই! আমারও মনে অনেক পরিবর্ত্তন হয়েচে—অন্য কথা ছেড়ে দাও, ভক্তি-বিশ্বাসের কথা দিয়েই বল্‌চি।"

তখনও জগদীশ আপনার মন্ত্রগ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন নাই। মনস্থির হইলেও জগন্নাথের সঙ্গে সাক্ষাতের পর লজ্জা-বোধ হইতেছিল। বয়সে ছোট, সম্পর্কে ছোট, তাহাকে কি গুরু করা যায়? কিন্তু কথা তুলিবার সুযোগ আপনা আপনি উপস্থিত হইল। তিনি ধীরে ধীরে সুধাইলেন—"কি পরিবর্ত্তন?"

জগন্নাথ। গোঁড়ামি আমার কখন ছিল না বটে, কিন্তু শাক্ত-বৈষ্ণবের একটা ভেদাভেদ-জ্ঞানের অভাব ছিল না। সাত বছর

আগে সেই রাত্রে তোমার সঙ্গে যে কথাবার্ত্তা হয়, তা আমার মনে আছে—তোমারও বোধ হয় তা মনে আছে। এখন আমার মনে হয়, সে সব আমাদের বোঝার ভুল, নহিলে শক্তিধর্ম্ম বৈষ্ণবধর্ম্ম একই ধর্ম্ম তাতে সন্দেহ নাই।

জগদীশ প্রফুল্ল হইলেন। গুরুদেবের উপদেশ মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু তিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসু। জগন্নাথ কি ভাবে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, জানিতে তাঁহার কৌতূহল হইল। কোন কথা ভাঙ্গিলেন না, পুনশ্চ বলিলেন, "কিসে বুঝিব এক ধর্ম্ম ?"

জগন্নাথ। শাক্ত যাঁকে ডাকেন মা জগদম্বে বলে, আমি তাঁকেই ডাকি, প্রাণধন শ্রীকৃষ্ণ বলে। তিনি বৎস, তিনি সখে, তিনি স্বামিন্! সকলই ভক্তি-প্রেমের সিঁড়ি। সাধারণত তন্ত্রশাস্ত্রে মা ভিন্ন অন্য সম্বন্ধ ঈশ্বরে প্রযুক্ত নয় বটে, কিন্তু কোথাও কোথাও অন্য সম্বোধনের ছায়া আছে। তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তার পর শ্রীবৃন্দাবন ধামে এসে আমি তন্ত্রশাস্ত্রালোচনা করেছি। কালীবিলাস-তন্ত্রে কৃষ্ণমাতার রূপ আমার বড় ভাল লাগে—সেইখানে শক্তি-ধর্ম্মে বৈষ্ণবধর্ম্ম মিলিত হয়েছে। অসুরনাশার্থ ভগবতী কালী-রূপ ধারণ করলেন, অসুর বিনাশ হোল, কিন্তু তাঁর ক্রোধ নিবৃত্তি হলো না। সৃষ্টি লোপ হয়। দেবতারা কেহ তাঁকে প্রসন্ন করতে পারলেন না, তখন নারায়ণের শরণাপন্ন হলেন। নারায়ণ বালক শ্রীকৃষ্ণ রূপে সেই ভয়ঙ্করী উগ্রচণ্ডা দেবীর কাছে উপস্থিত হলেন—অমনি সে ভয়ঙ্কর ক্রোধের ভাব লয় হল, মাতা সে শিশুকে কোলে তুলে স্তন্য পান করাতে লাগ্‌লেন। দেখিতে দেখিতে একই শিশু-মূর্ত্তি একে একে অসংখ্য হইল—তখন ভগবতীর উগ্রচণ্ডা পিশাচী সখীরাও প্রত্যেকে এক এক বালক কৃষ্ণকে ক্রোড়ে তুলে স্তন্য দান করিল। এ রূপকের অর্থ কি জগদীশ ? আমার ত মনে হয়, শাক্ত বৈষ্ণবের সন্ধিস্থল এইখানে।"

জগদীশ বলিলেন,—"আমিও এখন তোমারই মত বুঝিতেছি। কিন্তু তুমি বুঝেচ আপনায় ভক্তি বলে, আমার জ্ঞান গুরুপদেশের ফল মাত্র।"

জগন্নাথ আবার বলিতে লাগিলেন, "এখন আমার ধ্রুব জ্ঞান হয়েছে, সংসারে আমাদের যে সব স্নেহ-প্রেমের বন্ধন, সকলই সেই প্রাণধন গোপীনাথের পূজা। লোকুর চাঁদ মুখ যখন দেখি, তখন বাৎসল্য উছলিয়া উঠে, সেই প্রাণধনকে মনে পড়ে, তখন বাৎসল্য-ভাবে তাঁহারই অর্চ্চনা করি। হরির স্নেহ-ভক্তিতে যখন মুগ্ধ হই, তখন দাস্যভাবে তাঁহাকেই মনে পড়ে। হরির উপর আমার যে স্নেহ সেও দাস্যভাব, আমার উপর হরির যে প্রীতি ভক্তি সেও সেই দাস্যভাব। এইরূপ সকল সম্বন্ধেই। এ সংসারে সংসারীর সকল সম্বন্ধই পবিত্র, সকলই মধুর ভাবে পূর্ণ। সংসার শ্রীকৃষ্ণের—শ্রীকৃষ্ণ আমাদের। সংসার ত্যাগ করে ধর্ম্ম সাধন হয় না।"

জগদীশ স্থির কণ্ঠে বলিলেন "আচার্য্য, সার্থক ভক্তি তোমার! আমি আজ প্রায় তিন মাস তোমার অনুসরণে গয়াধাম হতে বঙ্গ-দেশ, বঙ্গদেশ হতে শ্রীবৃন্দাবন, আবার শ্রীবৃন্দাবন হতে রাজমহল কেন ঘুরিতেছি, এইবার তোমায় বলিব। আমি তোমার কাছে মন্ত্র গ্রহণ করিব।"

প্রথমে জগন্নাথ বিস্মিত হইলেন, [illegible] ভাবিলেন তামাসা। হাসিয়া বলিলেন—"জগদীশ, এ রহস্য মন্দ নহে। জানতে পাই বণিক ফিরিঙ্গীদের মধ্যে পাদরী আছে, তারা বক্তৃতা করে লোককে খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করে। আমার ধর্ম্মব্যাখ্যায় তেমন বক্তৃতার ভাব কিছু ছিল বুঝি?"

জগদীশ বিষাদের হাসি হাসিলেন। বলিলেন—"রহস্য নহে জগন্নাথ—আর তোমায় নাম ধরিয়া ডাকিতে বড় বাধ বাধ করে!

অজ্ঞেয় বিশ্ব-কারণকে মা বলে আর শান্তি পাই না, আমি বড় পাপী, মাতার চরণে পাপ প্রাণ উন্মুক্ত কর্‌তে পারি না। তাই আজ গুরুদেবের আদেশে তোমার কাছে দীক্ষা গ্রহণ কর্‌তে এসেছি। আমায় বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত কর, এমন মন্ত্র দাও যাতে আমি সারা জীবনের উৎকট পাপরাশি বিশ্ব-কারণে সমর্পণ কর্‌তে পারি। সুহৃদ্ বলে, পত্নী বলে, স্বামী বলে প্রাণের এই নরক-দাহ তাঁকে দেখাই,—আর সহিতে পারি না!"

কথাগুলি বলিতে জগদীশের কণ্ঠরোধ হইল। জগন্নাথ উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।—বলিলেন "তোমার গুরুদেব অলৌকিক ব্যক্তি—তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। তোমার ভবানীমন্দিরে কালি নিশীথে আমি তোমায় দীক্ষিত করিব।"

হরি নির্ব্বাক হইয়া, পণ্ডিতে পণ্ডিতে এই সমস্যা শুনিতেছিল, কতক বুঝিল, কতক বুঝিল না। শেষের ব্যাপারটা বুঝিল। ভারি খুসী হইল। ভাবিল, "এখন ভালোয় ভালোয় পর্‌ভা দিদিকে পাওয়া গেলেই সকল মঙ্গল।"

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সোজা পথে সাবধানে ভৈরব ভবানীমন্দির সমীপে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘোর তিমিরে দিগন্ত ভরিয়া গিয়াছে, কিছুই স্পষ্ট লক্ষ্য হয় না। কেবল অদূরে সন্ন্যাসিনীর কুটীর-প্রাঙ্গণে আলোকরাশি জ্বলিতেছিল।

তখন যদি ভৈরব একেবারে গিয়া সন্ন্যাসিনীকে দেখা দিত, তাহা হইলে আর কোন বিপদ ঘটিত না। কিন্তু তাহা সে পারিল না। ভবিতব্য বাস্তবিক খণ্ডিবার নহে।

অতএব ভৈরব প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সন্ন্যাসিনী ও প্রভাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবে, ইহাই স্থির করিল। সেই চোর—যে হোক্ সে—তাহার অভিসন্ধি ভাল নহে, ইহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না।

ভবানী-মন্দির সম্মুখস্থ বটবৃক্ষতল হইতে সন্ন্যাসিনীর কুটীর দূর নহে। তাহার উচ্চ বেদিকা হইতে সেখানকার সকলই দেখা যায়। ভৈরব মনস্থ করিল, সে স্থান হইতে সকল লক্ষ্য করিবে—ভবানী না করুন, কোন বিপদ যদি ঘটে, তখন রক্ষা করা দুষ্কর হইবে না। অতএব সে সমস্ত ইন্দ্রিয় চক্ষু-কর্ণে নিয়োজিত করিয়া অবহিত মনে সেই আলোকরাশির পানে চাহিয়া রহিল। কুটীরের মুক্ত পথে আলো প্রবেশ করিতেছিল। হঠাৎ ভৈরবের মনে হইল, প্রভা অগ্নিকুণ্ড মধ্য হইতে উঠিয়া কুটীরে প্রবেশ করিল—জ্যোৎস্না-সাগরে যেন বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল।

তার পর চারি দণ্ড কাল নীরবে অতিবাহিত হইল—একবার কেবল একজন পাহাড়িয়া সন্ন্যাসিনীর অগ্নি সম্মুখে গিয়া তাঁহাকে কি বলিয়া আসিল, আর একজন ভবানী-মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করিল। স্তিমিত প্রদীপালোকে অস্পষ্ট ভবানীমূর্ত্তি দেখা গেল—ভৈরব ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল—কিন্তু তাহাতে হৃদয় বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বার আবার রুদ্ধ হইল। তখন সহসা আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় ভৈরব বড় উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

বটবৃক্ষের উপর হইতে সহসা শ্যেন পক্ষী বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল—তাহাতে ভৈরবের মর্ম্মতল পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। আর কখন ত শক্তিকাননে এমন রব শুনা যাইত না! তখন ভৈরব রুদ্ধ নিশ্বাসে লক্ষ্য করিল, সন্ধ্যা রাত্রির সেই চোর অতি সাবধানে অগ্নিকুণ্ড সমীপে আসিয়া দাঁড়াইল!

ওদিকে জগদীশ এবং জগন্নাথ দ্রুতবেগে পথ চলিতেছিলেন। একে ঘোর অমাবস্যার আঁধার, তায় পার্ব্বত্য পথ, হরি পশ্চাতে পড়িতেছিল, জগন্নাথেরও বড় কষ্ট হইতেছিল, কেবল জগদীশের চেনা পথ। উভয়ে বিষণ্ণ শঙ্কিত হইয়া নীরবে চলিতেছেন। জগন্নাথ থাকিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কতদূর আর শক্তি-কানন জগদীশ—হঠাৎ হৃদয় আমার এত চঞ্চল হইল কেন ?"

জগদীশ মৃদুস্বরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন—ঠিক দেখা যায় না, আন্দাজ আধক্রোশ এখনও বাকী। একটা আলো দেখা যাইতেছে, কিসের আলো বুঝিতে পারিতেছি না। কি জানি আমারও হৃদয়ে কেন এই ঘোর তিমির রাশির ছায়া পড়িতেছে !"

জগন্নাথ। সাত বছর আগে, তোমার সেই রাত্রির ভবিষ্যদ্বাণী আমার মনে পড়িতেছে। মেয়েটার জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে।

জগদীশ। সে কথা আমারও মনে আছে। গুরুদেব প্রথমে জ্যোতিষ শিখাইলে কৌতূহল ক্রমে শিশুকন্যার পরিণাম জানিতে বাসনা হইয়াছিল। গণিতে গিয়া দেখিলাম আঁধার ভবিষ্যৎ—অতি ভীষণ তামস রাশিতে সাত বৎসর তাহার অদৃষ্ট পূর্ণ—তাই তোমায় বলিয়াছিলাম। সেই অবধি প্রতিজ্ঞা করিয়া ভবিষ্যৎ গণনা ত্যাগ করিয়াছি—আর কখন উদ্যম করি নাই।

* * * *

উদ্ধব আসিয়া বিধুমণির অগ্নিকুণ্ড সমীপে দাঁড়াইল। ভগ্নীকে দেখিয়া তাহার পূর্ব্ব সঙ্কোচভাব দূর হইল, রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। কিন্তু এ শক্তি-কাননে বল প্রয়োগ করা তাহার অভিপ্রেত নহে। ছলে কৌশলে যদি কার্য্যোদ্ধার হয়, তাহাই তাহার প্রথম চেষ্টা। কারণ সে জানিয়াছিল যে সেই ভৈরব এ স্থানের রক্ষক। বিভ্রান্ত মরিয়া হইয়াই সে আসিয়াছিল।

উদ্ধব ধীরে যথাসম্ভব কোমল কণ্ঠে ডাকিল "বিধু !"

সন্ন্যাসিনী চমকিয়া উঠিল—ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল! তাহার, বিস্ময় শেষ হইতে না হইতে উদ্ধব ভগ্নীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। আলোক রাশিতে বিধুমণি দেখিল, উদ্ধব—সে শ্মশ্রুগুম্ফ নাই। ভাই যখন শিষ্ট শান্ত স্নেহবান গৃহস্থ ছিল, তখনকার মূর্ত্তি। তথাপি তাহার হৃৎকম্প হইল।

উদ্ধব সেই ভাবে বলিল "বিধু! লজ্জা পেয়েছিস্, তা তোর দোষ কি? দোষ আমার! তুই মার পেটের বোন্, তুই রাগ করলে এ সংসারে কোথায় আমি আর দাঁড়াই বল? এই দেখ্, তোর জন্যে ভেবে ভেবে কি হয়ে গিয়েছি। মেয়েটার উপর তোর বড় মায়া, সেই মায়ায় আমিও দেখ্ তার ভয় দূর করবের জন্যে দাড়ি-গোঁফ সব কামিয়ে ফেলেচি। এখন চল আবার আমার কাছে চল, আর তোদিকে কোন কষ্ট দেব না।"

এই বলিয়া উদ্ধব নিজে সেইখানে বসিল, সন্ন্যাসিনীও বসিল। ভৈরব দূর হইতে এ সব দেখিতেছিল। উভয়কে বসিতে দেখিয়া তাহার মনে দারুণ সন্দেহ জন্মিল। ঈর্ষা আসিয়া অতর্কিত ভাবে তাহার চিরসরল চিত্ত এই মুহূর্ত্তে অধিকৃত করিল। তখন ভৈরব এককালে সন্ন্যাসিনীর উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিল—তাহাকে তাহার অবিশ্বাসিনী কলঙ্কিনী বলিয়া ধারণা হইল। প্রভার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল। তখন সে দৃঢ় সঙ্কল্পে কুটিল পথে সেই অগ্নি-কুণ্ডের দিকে অগ্রসর হইল।

বিধু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "দাদা সুমতি যদি হয়েচে, তবে আর সেখানে গিয়া কাজ নেই। এইখানে গঙ্গাতীরে বাস কর, দেশে যাবার আর পথ নেই, এই খানে আমি আবার তোমার য়ে দেব। প্রভার বিয়ে আগে হোয়ে যাক্!"

উদ্ধব কাপট্যের হাসি হাসিল। "ঐ কথাই তোর চির দিন দিদি! প্রভার বিয়ে দিবি কার্ সঙ্গে? তারা কি আর ছাই কেউ আছে? চল্ আমার সঙ্গে, এখুনি চল্! মেয়েটা কোথা?"

বিধুমণি দেখিল, ভাই বস্ত্রাঞ্চলে তীক্ষ্ণধার তরবারি লুকাইয়া রাখিয়াছে, তার উপর শেষ কথায় তাহার কাপট্য বুঝিতে বাকি রহিল না। ক্ষোভে হতাশে অবসন্ন হইল। কে আজ এই বিপদে রক্ষা করিবে?

বিধু অন্তিম সাহস সংগ্রহ করিয়া বলিল—"দাদা—পাগলামি রাখ! মেয়েটায় তোমার কি কাজ? এখানে তোমার জোর জবর-দস্তি খাট্‌বে না—ভালোয় ভালোয় ফিরে যাও। আমি তোমার মতলব বুঝেছি।"

তখন উদ্ধব অগত্যা আত্মপ্রকাশ করিল। তরবারি বাহির করিয়া বিধুমণিকে কাটিতে গেল—কিন্তু আত্ম সম্বরণ করিয়া বলিল—"না আগে তোকে কাট্‌ব না। তোর সমুখে তোর আদরের মেয়ের ধর্ম্ম নষ্ট করে তোকে কাটবো—তবে আমার রাগ যাবে!"

সহসা বিকট উন্মাদ আসিয়া সন্ন্যাসিনীর জ্ঞান লোপ করিল। সে উচ্চ হাসিয়া উঠিয়া অমিত বলে ভ্রাতার হস্ত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া যেথায় কুটীরে নিরপরাধিনী স্নেহের বালিকা নিদ্রা যাইতেছিল, সেই দিকে ছুটিল। মুহূর্ত্তে তরবারি—হায়!—মুহূর্ত্তে সে দেহলতা দ্বিখণ্ডিত করিল! সাধের স্বপন মিলাইয়া গেল! তখন উন্মাদিনী সেই শোণিতসিক্ত তরবারি আপন হৃদয়ে বসাইয়া দিতে যাইতেছিল, কিন্তু পারিল না। ভীষণ চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল! সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না।

উপসংহার।

সাধে সাধে দুঃখের আলোচনা করিতে আমরা বড় নারাজ, কিন্তু যথার্থই কি দুঃখের স্বপক্ষে বলিবার কিছু নাই। সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রে, মৃদু সমীরণের আদর স্পর্শে ফুলরাশি দেখিতে দেখিতে যেমন ফুটিয়া উঠে, সুখসম্পদের আবহাওয়ায় মনুষ্যচরিত্র যদি তেমনি ফুটিত, তবে আর ভাবনা ছিল না। জগতের ইতিহাস মন্থন করিয়া দেখি, দুঃখের অতিরেকে মহত্ত্ব নাই। দুঃখী বলিয়াই রামচন্দ্র হিন্দুজাতির আদর্শ রাজা,—আর জনমদুঃখিনী বলিয়াই সীতা-চরিত্রের এত গৌরব। এই দুঃখের অন্তঃসলিলপ্রবাহ য়ুনানী নাটক সকলের মর্ম্মগ্রন্থি। সে কথা বুঝাইতে গিয়া জ্ঞানী সক্রেতিস্ বলিয়াছিলেন, সুখের যিনি চিত্রকর, দুঃখের চিত্রও তাঁহারই আয়ত্তাধীন—উভয় ক্ষেত্রে কুশলতা তাঁহার সমান। কথাটি বড় কঠিন, কিন্তু এমন সত্য কথাও আর কিছু নাই। মন খুলিয়া যে হাসিতে পারে, রোদনে তন্ময়ত্ব তাহারই কাজ—অন্যের নহে। আর্য্য-নীতিবেত্তারা সুখ-দুঃখের চক্রকে নিয়ত আবর্ত্তনশীল বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন—দুঃখ ছাড়া মহত্ত্ব কেবল কথার কথা মাত্র।

এ সংসারে হাসিবার জিনিস অনেক। মনুষ্যত্বের নামে পশুত্ব, মহত্ত্বের নামে নীচত্ব, পরার্থের নামে স্বার্থ, নিষ্ঠার নামে কাপট্য—কত বলিব? যত রকমের পাপ এবং ভাণ মনুষ্যসমাজকে কলঙ্কিত করিয়া আসিতেছে, সে সব লইয়া যদি হাসিতে চাও, তবে হাসিবার জিনিস অনেক। কিন্তু ইহাই লইয়া রোদনও ত করা যায়! তখন সেই অপাঙ্গের হাসি মর্ম্মভেদী শ্লেষে পরিণত হইবে, সে ভাসা-

ভাসা রং-তামাসা কঠোর একাগ্রতার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে,—সকলই কর্ম্মঠ এবং জীবন্ত বলিয়াই হৃদয়ঙ্গম হইবে। সুখ-দুঃখের মধ্যে সখ্যবন্ধন এতই দৃঢ়, মোহাচ্ছন্ন হইয়া আমরা তাহা অনুভব করিতে পারি না।

সেই চীৎকার শুনিয়া পাহাড়িয়া দুই জন ভবানী-মন্দির হইতে ছুটিয়া আসিয়া সেই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড দেখিল, তাহারা ভয়ে বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া চীৎকারের উপর চীৎকার করিতে লাগিল সঙ্গে সঙ্গে ভৈরব, সে স্থানে পৌঁছিল। অশান্তির কোলাহলে শক্তিকানন পূর্ণ হইল।

মনে মনে কত কি তোলাপাড়া করিতে করিতে হরিদাস সঙ্গে জগদীশ ও জগন্নাথ আসিয়া ঘটনাস্থলে পৌঁছিলেন। পলায়নপর উদ্ধব তাঁহাদের সম্মুখে পড়িল, কেমন একটা অমঙ্গলের ছায়া তাঁহাদের হৃদয় অন্ধকার করিয়া দিল। অগ্নিকুণ্ডের কাছে বিভীষিকার চীৎকার শুনিয়া তাঁহারা সেইখানে ছুটিয়া আসিলেন। পাহাড়িয়ারা কথায় কিছু না বলিয়া তাঁহাদিগকে কুটীরের অভ্যন্তর দেখাইয়া দিল।

হরিদাস ও জগন্নাথ রোদন করিয়া উঠিলেন। জগদীশের মর্ম্ম-যাতনা রোদনের অতীত। তিনি পাষাণে বুক বাঁধিয়া অগ্নি গর্ভ ভূধরের মত স্থির ছিলেন। জগন্নাথকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন —"এ আমারই পাপের প্রত্যক্ষ ফল। যে আগুন কল্যাণপুরে জ্বলিয়াছিল, শক্তি-কাননে আসিয়া তাহা নিবিল।"

জগদীশ কঠোর কণ্ঠে ডাকিলেন—"আচার্য্য, আমায় দীক্ষা দাও—আর সহিতে পারি না। এ নরক-জ্বালা কি কিছুতে ঘুচিবে না?"

জগন্নাথ সেই মহাশ্মশানে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধগ্রীব হইয়া প্রাণধন শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন। "কোথায় তুমি ভক্তবাঞ্ছা—আজি আসিয়া পাপীর পাপ তাপ ঘুচাইয়া দাও! কোথায় তুমি প্রাণ-বল্লভ, আর্ত্তের এই মর্ম্মের কথা শুনিয়া হৃদয়ে তার শান্তি দাও প্রভু!"

তখন জগদীশ বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন!

শ্রীবৃন্দাবনে ফিরিয়া এ লোমহর্ষণ কাহিনী হরি বা জগন্নাথ কাহারও কাছে ব্যক্ত করিলেন না। প্রভাকে পাওয়া যায় নাই, এই কথাই প্রচার রহিল। হৈমর চির জীবনের আশা আশাই থাকিয়া গেল!

সম্পূর্ণ।